স্যর

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(দ্বিতীয় খণ্ড)

—ঃ০ঃ০—

প্রজাপতি-সম্পাদক

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার-সঙ্কলিত

আষাঢ়—১৩৪৩

মূল্য এক টাকা

প্রকাশক

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার

২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

তৃতীয় খণ্ড

যন্ত্রস্থ

প্রিণ্টার—শ্রীরসিক লাল পান

গোবর্দ্ধন প্রেস

২০৯ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(দ্বিতীয় খণ্ড)

ব্যবস্থাপক সভা ও সুরেন্দ্রনাথ—১৯০১ ; সরকার কর্ত্তৃক আইন-ভঙ্গ

১৯০১ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদপ্রার্থী হন। তখন তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। দ্বারবঙ্গের মহারাজ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তিনিও ৫টী ভোট পান, সুরেন্দ্রনাথও ৫টী ভোট পান। ব্যাপারটী তখন ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রেরিত হয়। ব্যবস্থাপক সভার নিয়মে গবর্ণমেণ্ট ভোট-গণনার দুই মাসের মধ্যেই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে বাধ্য। কিন্তু লর্ড কার্জ্জনের পরিচালিত ভারত গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ম ভঙ্গ করিলেন। তাঁহারা তিন মাস চুপ করিয়া রহিলেন। তিন মাস পরে তাঁহারা পুনঃ-নির্ব্বাচনের আদেশ দিলেন। কিন্তু এদিকে তিন মাস পরে সুরেন্দ্রনাথের বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগিরির আয়ু ফুরাইয়া যাইল ; কাজেই তিনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না। এইরূপ চাতুরীর সাহায্যে সুরেন্দ্রনাথকে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভা হইতে বাহিরে রাখা হইল। সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং লিখিয়াছেন—"আমি কয়েকবার ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য-পদপ্রার্থী হইয়াছিলাম, কিন্তু প্রত্যেকবারই পরাজিত হইয়াছি। আমার সন্দেহ হয় যে, সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রভাব আমার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হইত। আমার এক বিহারের বন্ধুকে আমি বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইতে সাহায্য করিয়াছিলাম। তিনি বলেন—"আমি আপনাকেই ভোট দিতাম ; কিন্তু উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের কথা না রাখিয়া পারিলাম না।"

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ ও সুরেন্দ্রনাথ

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশ শাসক-সম্প্রদায়ের খেয়ালে দ্বিধা-বিভক্ত হয়। পূর্ব্ববঙ্গকে আসামের সহিত সম্মিলিত করিয়া পশ্চিমবঙ্গ হইতে পৃথক করিয়া দেওয়া হয়। বাঙ্গালী জাতি এই ব্যবচ্ছেদ ভাল বলিয়া মনে করেন না। পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ একযোগে এই ব্যবস্থার বিরোধী হইয়া প্রচণ্ড আন্দোলন আরম্ভ করেন। সে আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি অপূর্ব্ব, বাঙ্গালী তেমন আন্দোলন আর কখনও করে নাই। সেই আন্দোলন বাঙ্গালায় নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ব্যবচ্ছেদ

শাসক-সম্প্রদায়ের মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিল যে, বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সি অর্থাৎ বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম একজন, ছোটলাটের পক্ষে ঠিকমত শাসন করা অসম্ভব। কারণ, তাঁহার অধীন প্রদেশ অত্যন্ত বৃহৎ। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা আসামকে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেন অর্থাৎ আসাম স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হয় এবং একজন চীফ কমিশনারের উপর উহার শাসনভার ন্যস্ত করা হয়। সে সময়ে দেশে লোকমত গঠিত হয় নাই। সেইজন্য শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া এই তিনটি বঙ্গভাষা-ভাষী জেলাকে কর্ত্তারা আসামের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিলেও বাঙ্গালী জাতি তখন প্রতিবাদ করে নাই। করে নাই এইজন্য যে, তখন বুক ফাটিলেও বাঙ্গালার মুখ ফুটিত না। সম্ভবতঃ আসামের অধিবাসীরা সে সময়ে এই ব্যবস্থায় প্রীত হইয়াছিল ; কারণ, তাহারা ভাবিয়াছিল, এইবার তাহাদের প্রদেশের উন্নতির দিকে শাসক-সম্প্রদায়ের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে।

সিবিলিয়ানগণের প্রয়াস

আসাম স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হইলেও সিবিলিয়ানদিগের বিশেষ সুবিধা হইল না। উহার আয় এমন বেশী হইল না যে, তাহাতে কতকগুলি

উচ্চপদ সিবিলিয়ানদিগকে দেওয়া যায়। কাজেই আসামের জন্য স্বতন্ত্র সিবিলিয়ান-দল পোষণ করা অসম্ভব হইল। বাঙ্গালা ও যুক্তপ্রদেশের সিবিলিয়ানদের ভিতর হইতে কতকগুলিকে আসামের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত করা হইত, আবার কার্য্যের মিয়াদ ফুরাইলে তাঁহারা স্ব স্ব প্রদেশে ফিরিয়া আসিতেন। এইজন্য সিবিলিয়ানেরা এক নূতন প্রস্তাব করিলেন তাহাতে তাঁহারা চাহিলেন যে, চট্টগ্রাম বিভাগ অর্থাৎ চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলা বাঙ্গালা হইতে কাটিয়া লইয়া আসামের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হউক। কিন্তু চট্টগ্রাম বিভাগের অধিবাসীরা এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। তখন দেশে লোকমতের শক্তি বিকশিত হইতেছিল। বাঙ্গালা দেশের অধিবাসীরাও চট্টগ্রামবাসীর প্রতিবাদে যোগ দিলেন। ফলে প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত হইল না। তখনকার মত লোকে নিশ্চিন্ত হইল বটে, কিন্তু শাসক-সম্প্রদায়ের মনের ভিতর বাঙ্গালাদেশকে ছিন্ন-ভিন্ন করিবার চেষ্টা ফল্গুস্রোতের মত ভিতরে ভিতরে বহিতে লাগিল।

লর্ড কার্জ্জন তখন ভারতের বড়লাট। তাঁহার উৎসাহ ও উদ্যম ছিল অদম্য। তিনি সকল দিকেই ওলট-পালট আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রদেশ, বিভাগ, এমন কি জেলা প্রভৃতিরও সীমার সংস্কার করিতে তাঁহার ঝোঁক চাপিল। তিনি ভারতের মানচিত্র নূতন করিয়া তৈয়ারী করিতে—ঢালিয়া সাজিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার ধারণা ছিল—তাঁহার মত বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন প্রতিভাশালী ব্যক্তি আর কেহ নাই। তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন,—ভারতে যত প্রকার সংস্কার তিনি করিবেন তাহাতে তাঁহার প্রতিভা ও মনীষার ছাপ থাকিবে। এই সময়ে আসামের আয়তন-বৃদ্ধির প্রস্তাবের দিকে তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল। তখন এই বিষয়টীর আলোচনায় তিনি প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রস্তাব করিলেন যে, সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা-সমেত আসামের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইবে।

প্রস্তাবটী এই আকারেই সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। জনসাধারণ এই প্রস্তাব পাঠ করিয়াই উহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ

করিল। হিন্দু এবং মুসলমান—উভয়েই উহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। এই প্রতিবাদে গবমেণ্ট বিচলিত হইয়াও পড়িলেন। তাঁহারা তখন পূর্ব্ববঙ্গের নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা করিয়া তাঁহাদিগকে স্বমতে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোট লাট স্যর এনড্রু ফ্রেজারের সভাপতিত্বে বেলভেডিয়ার প্রাসাদে আলোচনা-সভার অধিবেশন হইতে লাগিল। এই সকল পরামর্শ-সভার অনুষ্ঠান নব-গঠিত ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েসনের উদ্যোগেই হইয়াছিল। এই এসোসিয়েসনের সর্ব্বস্ব ছিলেন—মিষ্টার আশুতোষ চৌধুরী (পরে স্যর আশুতোষ চৌধুরী)। চৌধুরী মহাশয় সুরেন্দ্রনাথকে এই সকল পরামর্শ বা আলোচনা-সভায় উপস্থিত হইতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে সুরেন্দ্রনাথ দ্রষ্টা-হিসাবে এইসকল সভায় হাজির হইতেন। কিন্তু দ্রষ্টা-হিসাবে উপস্থিত হইলেও তিনি এসোসিয়েসনকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন।

লর্ড কর্জ্জনের পূর্ব্ববঙ্গ-ভ্রমণ

পূর্ব্ববঙ্গের জন-নায়কগণের সহিত এইরূপ আলোচনাদির ফলে গবমেণ্ট জনমতের প্রতিকূলতা না করিয়া আসামের আয়তন-বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রত্যাহার করিবেন,—এইরূপ ধারণা অনেকেরই তখন হইয়াছিল। এমন কি, সুরেন্দ্রনাথও তাহাই মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ধারণা মিথ্যা হইল। লর্ড কার্জ্জন স্বয়ং পূর্ব্ববঙ্গ পরিদর্শন করিলেন। ইহাতে লোককে যেন দেখানো হইল যে, জনমত অবগত হওয়াই তাঁহার এই পরিদর্শনের উদ্দেশ্য; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জনমতকে কতকটা আতঙ্কিত করাই যেন তাঁহার ইচ্ছা ছিল। অথবা তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি পূর্ব্ববঙ্গে উপস্থিত হইলে তথাকার জননায়কগণকে তিনি নিজের মতে আনিতে পারিবেন; কিন্তু তাঁহার এই ধারণা ভুল হইয়াছিল। বিশেষতঃ জনমত যে ক্রমশঃ শক্তিসঞ্চয় করিতেছিল তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিয়াছিলেন, শাসন-নীতির কঠোরতা দ্বারা তিনি তাঁহার জেদ বজায় রাখিবেন।

ময়মনসিংহে গিয়া লর্ড কার্জ্জন তথাকার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরীর আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার জমিদারদিগের মধ্যে তাঁহার মত দৃঢ়চেতা ব্যক্তি অত্যন্ত বিরল ছিলেন। তিনি লর্ড কার্জ্জনকে যথোচিত সম্মানব্যঞ্জক দৃঢ়তার সহিত বলিলেন,—"আমি বঙ্গের এই অঙ্গচ্ছেদকে সাংঘাতিক দুর্ঘটনা বলিয়া মনে করি। আমি ইহার বিরোধী।" বলা বাহুল্য, মহারাজ সূর্য্যকান্ত বঙ্গ-ভঙ্গ-আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নায়ক ও পরিপোষক ছিলেন।

বঙ্গব্যবচ্ছেদের নূতন প্রস্তাব ও গবর্মেণ্টের গোপনে কার্য্য

লর্ড কার্জ্জনের পূর্ব্ববঙ্গে সফরের সময়ে উক্ত প্রস্তাব আরও বিপুল আকার ধারণ করে। সেই রূপান্তরিত প্রস্তাব-অনুসারে গবর্মেণ্ট ইচ্ছা করেন যে, আসামের সহিত চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার সংযোগ-সাধনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র উত্তরবঙ্গ, ফরিদপুর ও বরিশাল জেলাও সংযুক্ত করা হইবে। কিন্তু এই প্রস্তাব গোপনে কল্পিত, গোপনে আলোচিত এবং গোপনে স্থিরীকৃত হইয়াছিল। সাধারণে ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারে নাই; কারণ, সাধারণে যাহাতে ইহার আভাস পর্য্যন্ত না পায় এরূপ ব্যবস্থা শাসকবৃন্দ করিয়াছিলেন। জনসাধারণের প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনা করিবার জন্য আহূত কোনও সভায়ও ইহা পেশ করা হয় নাই। লর্ড মর্লি স্বয়ং পার্লামেণ্টে বলিয়াছিলেন,—"এই রূপান্তরিত প্রস্তাবটী অর্থাৎ আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গকে লইয়া একটি নূতন প্রদেশ-গঠনের প্রস্তাব বাঙ্গালার জনসাধারণের অভিমত-গ্রহণের জন্য সরকার কর্ত্তৃক প্রচারিত হয় নাই।"

বড়লাট লর্ড কার্জ্জন এবং বাঙ্গালার লাট স্যর এনড্রু ফ্রেজার আশা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা বাঙ্গালার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে তাঁহাদের মতে আনিতে পারিবেন কিন্তু সে আশা সফল হইল না। তখন তাঁহারা জনমতকে উপেক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা যদি

তাঁহাদের এই প্রস্তাব সাধারণকে জানাইয়া বলিতেন যে, সরকার তাঁহাদের শাসন-কার্য্যের সৌকর্য্যার্থ পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম নামে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করিবেনই, তাহা হইলে সরকারেব উদ্দেশ্য বুঝা যাইত। কিন্তু তাঁহারা এই নূতন সঙ্কল্পের বিষয় কাহাকেও জানাইলেন না। লড কার্জ্জন অত্যন্ত সংগোপনে বিলাতে 'ডেস্‌প্যাচ' পাঠাইলেন অর্থাৎ ইংলণ্ডের গবর্মেণ্টের নিকট তাঁহার এই প্রস্তাব পেশ করিলেন। লর্ড কার্জ্জনের পূর্ব্ববঙ্গ-পরিভ্রমণের পর এই ব্যাপারের কোনও রূপ উচ্চবাচ্য সবকার-পক্ষ হইতে না হওয়ায় লোকের ধারণা হইয়াছিল যে বঙ্গভঙ্গের কল্পনা সরকার ত্যাগ করিলেন। বাঙ্গালার জননায়কগণ যদি ঘুণাক্ষরে লর্ড কর্জ্জনের গুপ্তভাবে বিলাতে প্রস্তাব-প্রেরণের এই ব্যাপাবটী জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চিতই উহা নাকচ করাইবার জন্য বিলাতে একদল প্রতিনিধি প্রেরণ করিতেন।

বঙ্গব্যবচ্ছেদ ঘোষণা—২০শে জুলাই, ১৯০৫

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বিলাতে গিয়া মিষ্টাব বড্‌রিকের (তদানীন্তন ভারত-সচিব) সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার সহিত বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ-সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথের আলোচনা হয়। তিনি বঙ্গব্যবচ্ছেদের সমর্থন-চেষ্টা করেন নাই। সুরেন্দ্রনাথেব ধারণা ছিল,—যদি লর্ড কার্জ্জন গোপনে এই প্রস্তাব বিলাতে পেশ না করিতেন এবং বাঙ্গালাব জনসাধারণ ইহা জানিতে পারিলা প্রতিকার-চেষ্টা করিত, তাহা হইলে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব কখনই কার্য্যে পরিণত হইত না; যথাসময়ে যদি বাঙ্গালা দেশ হইতে বিলাতে একদল প্রতিনিধি প্রেরিত হইত, তাহা হইলে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইত না।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুলাই তারিখে গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করেন যে, বঙ্গদেশকে ব্যবচ্ছিন্ন করা হইবে। যেভাবে বাঙ্গালা দেশকে খণ্ডিত করা হইবে তাহাও সেই ঘোষণা-পত্রের সহিত গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপিত করেন। লোকে সেই প্রথম জানিতে পারে যে, পূর্ব্ববঙ্গকে পশ্চিমবঙ্গ হইতে পৃথক করা হইবে। এই সরকারী ঘোষণায় বাঙ্গালী জাতি বিস্মিত, চকিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। তাহারা ইহাকে বিনা মেঘে

বজ্রপাতের তুল্য মনে করে। সর্ব্বত্র প্রতিবাদের তুমুল কোলাহল উত্থিত হয়।

কিন্তু এই ব্যাপারে হঠাৎ বিহ্বল ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেও বাঙ্গালার জননায়কগণ স্থৈর্য্য ও উৎসাহ হারাইলেন না। তাঁহারা বিপুল উদ্যম-সহকারে ইহার প্রতিকারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা বৈধ উপায়ে ইহা নাকচ করিবার জন্য বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করিলেন। বাঙ্গালীর মনীষা, বাঙ্গালীর কর্ম্মশক্তি এবং বাঙ্গালীর সমবেত প্রয়াস এই আন্দোলন-পরিচালনে নিয়োজিত হইল। সুরেন্দ্রনাথ এই আন্দোলনের পুরোভাগে থাকিয়া ইহাকে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন ঃ—"আমরা অনুভব করিলাম যে, আমরা অপমানিত হইয়াছি; আমাদের মর্য্যাদা-হানি করা হইয়াছে এবং আমাদিগের সহিত চাতুরী করা হইয়াছে। বঙ্গভাষা-ভাষী ব্যক্তি-গণের মধ্যে যে সংহতি-শক্তি ও আত্মচেতনার বিকাশ ঘটিতেছে বঙ্গব্যবচ্ছেদ দ্বারা ইচ্ছা করিয়াই তাহার মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। প্রথমে শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য বঙ্গ-বিভাগ করাই সরকারের ইচ্ছা ছিল, পরে আমরা উপলব্ধি করিলাম যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য বঙ্গভঙ্গ হইতেছে। যদি আমরা বিনা প্রতিবাদে বঙ্গভঙ্গ হইতে দিই, তাহা হইলে রাজনৈতিক উন্নতির পথ রুদ্ধ হইবে এবং যে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের উপর ভারতের উন্নতি বহুলপরিমাণে নির্ভর করিতেছে সেই হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ও মিলনের উপায়ও বিনষ্ট হইয়া যাইবে। কারণ, সরকার-পক্ষ স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, নবগঠিত পূর্ব্ব-বঙ্গ ও আসাম প্রদেশের শাসন-নীতি মুসলমান সম্প্রদায়ের সুযোগ-সুবিধা ও অধিকারের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াই পরিচালিত হইবে।"

বঙ্গচ্ছেদের রাজনৈতিক কারণ

বঙ্গচ্ছেদ কেন সংঘটিত হইল, গবর্মেণ্ট কেন ইহা করিলেন—তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া বাঙ্গালার জননায়কগণের ধারণা হইয়াছিল

যে, বঙ্গভঙ্গের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। লর্ড কার্জ্জন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী (Imperialist) ছিলেন এবং তাঁহার মনে মনে এইরূপ স্পর্দ্ধা ছিল যে, তাঁহার মত সুপণ্ডিত, রাজনীতিবিশারদ ও সুচতুর আর কেহ নাই। আর ইংরেজ জাতির কল্যাণ-সাধনে তাঁহার মত সামর্থ্যও আর কাহারও নাই। লর্ড কার্জ্জন বাঙ্গালী জাতির মনীষা, রাজনৈতিক বুদ্ধিকৌশল, সমগ্র ভারতে রাজনৈতিক শিক্ষা-প্রচার দ্বারা ঐক্য-স্থাপনের চেষ্টা প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া ঐগুলি সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য এই বঙ্গচ্ছেদের পরিকল্পনা করেন। চিন্তাশীল মনীষী শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' (নবপর্য্যায়) মাসিক পত্রের ১৩২২ সালের কার্ত্তিক মাসের সংখ্যায় এই সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাতে বঙ্গচ্ছেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের এবং বাঙ্গালী জাতির মধ্যে নব-প্রেরণা সঞ্চারের বিষয় সুপরিস্ফুট হইয়াছে। এইজন্য আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

"বঙ্গবিভাগের দ্বারা ইংরেজ এমন এক স্থানে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে, যাহার উপরে আমাদের সকল ভবিষ্যৎ উন্নতি ও মুক্তি সম্পূর্ণ-রূপে নির্ভর কবিতেছে। এই প্রস্তাবের দ্বারা ইংরেজ-রাজ আমাদের নবোন্মেষিত জাতীয় জীবনের কেবল যে পেলব পল্লবে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে তাহা নহে, পরন্তু তাহার মূলে একেবারে আপনার সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা চালাইবার চেষ্টা করিয়াছে। যাহার উপর আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি, সাহিত্যের সম্প্রসারণ, আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি, শক্তি-সঞ্চার ও রাজনৈতিক মুক্তিলাভ—সকলই একান্ত নির্ভর করিতেছে। ইংরেজ প্রস্তাব করিয়া সেই বস্তুকে আমূল উৎপাটিত ও বিনষ্ট করিবার প্রয়াস পাইতেছে।

"ইংরেজের আধুনিক শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য আমাদের মানসিক উন্নতি-সাধনের সহায়তা করা নহে, কিন্তু ভারতে ইংরেজ-প্রভুশক্তির স্থায়িত্ব রক্ষা করা। এইজন্য এই শিক্ষা আমাদিগের জাতীয় জীবনের প্রাচীন গৌরব-কাহিনীকে ঢাকিয়া রাখিয়া আমাদিগের সরল

চিত্তকে অভিভূত করিয়া রাখিবার জন্য এমন অপরিসীম ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া থাকে যে, যে সকল উপায়ে আমাদের উদ্ভাবনী শক্তি ফুটিয়া উঠিতে পারে, সর্ব্বদা সশঙ্কিতে, নানা কৌশল-অবলম্বনে, তাহার পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহে। রাজকার্য্যে ও স্বদেশের শিক্ষা, সম্পদ, সৌন্দর্য্য ও শক্তি-বিধানের শতমুখ পন্থায় মানসিক শক্তিনিয়োগ ও মৌলিক গবেষণা করিবার অবাধ সুযোগ ও অবসর প্রাপ্ত হওয়া যায়,—ইংরেজ সেগুলি প্রায় সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। সকলক্ষেত্রে, সর্ব্ববিধ বিষয়ে, দেশের রাজশক্তি তাহার হস্তগত আছে বলিয়া, ইংরেজ এদেশে হুকুমদার হইয়া রহিয়াছে ;—দেশের গণ্যমান্য শিক্ষিত ও শক্তিশালী যে যেখানে আছে, হয় বিজনে পারিবারিক জীবনের সঙ্কীর্ণতা ও নির্জ্জীবতার মধ্যে পড়িয়া আপনার স্বভাবদত্ত শক্তিরাশির অপচয় করিতেছে, অথবা ইংরেজের তাঁবেদার হইয়া দাসের উপজীবিকা সংগ্রহ করিয়া স্বল্পবিস্তরপরিমাণে ইংরেজের প্রসাদ ভোগ করিতেছে। আফিসে ইংরেজ কর্ত্তা, এদেশীয়গণ তাহার ভৃত্য। ব্যবসায়-বাণিজ্যে ইংরেজ ধনী, এদেশীয়েরা কেবল জন খাটিয়া জীবন ধারণ করিতেছে। জাতীয় জীবনের বিশাল কর্ম্মভূমিতে যথাযোগ্য কর্ত্তৃত্ব, সুযোগ ও অবসর আমাদের ভাগ্যে কদাপি লাভ হয় না। এ অবস্থায় আমাদের মানসিক, নৈতিক, আর্থিক বা সামাজিক কোন প্রকারের উন্নতি লাভের আশা অলীক কল্পনামাত্র।

"অল্পে অল্পে আমরা এইটি বুঝিয়া উঠিতেছিলাম। ক্রমে ক্রমে আমাদের নবোন্মেষিত জাতীয় জীবনকে স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠিত করিবার আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা আমাদের মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছিল। ইংরেজ শাসনক্ষেত্রকে অধিকার করিয়া আছে, থাকুক। পুলিশ-পাহারার ভার এবং এই পুলিশ-পাহারার জন্যই রাজস্ব আদায় ও ব্যয় করিবার ভারও সে আপনার হাতে রাখিবে তাহাও রাখুক। আইন-কানুন যাহা করিতে হয়, সে করুক। এ সকল বিষয়ে আমরা এখনি তাহাকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি আমাদের সে শক্তি নাই কিন্তু এই সকলের বাহিরে যে বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া আছে, যথাসাধ্য আমবা অগ্রে সে ক্ষেত্র

অধিকার করিতে চেষ্টা করিব। দেশের লোকের শিক্ষার ভার আমরা স্বহস্তে যথাসাধ্য গ্রহণ করিব। দেশের দারিদ্র্য দূর করিবার যথাবিহিত উপায় রাজশাসন-নিরপেক্ষ হইয়া যতটা অবলম্বন করা সম্ভব, আমরা স্বয়ং তাহা করিব। দেশের শিক্ষিত দলের সঙ্গে আপামর-সাধারণের স্বাভাবিক নেতৃনীত-সম্বন্ধ যতটা বর্ত্তমান অবস্থাধীনে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব, ইংরেজের শাসননীতির কুটিল গতির প্রতি বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আমরা তাহার যথাযোগ্য উপায় উদ্ভাবন ও প্রতিষ্ঠা করিব। এইরূপে বিবিধ ক্ষেত্রে, বিবিধ উপায়ে স্বজাতির আভ্যন্তরীণ প্রজাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া, জাতীয় জীবনের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চারিদিকেই হইতেছিল। এই চেষ্টার সঙ্গে ইংরেজ-রাজের স্বার্থের একটা সহজ বিরোধ রহিয়াছে।

"ইংরেজের স্বার্থর সঙ্গে, বর্ত্তমান অবস্থায়, আমাদের জাতীয় স্বার্থের সম্মিলন ও সামঞ্জস্য কদাপি সম্ভব নহে। আমরা যে ভাবে আমাদের জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি করিতে চাই, সে ভাবে আমাদের শক্তিবৃদ্ধি হয়, ইংরেজ ইহা ইচ্ছা করিতে পারে না। রাজনীতিক্ষেত্রে আমাদিগকে অশক্ত করিয়া রাখিতে পারিলেই, এদেশে তাহার নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিবে, অন্যথা নহে। এইটি ইংরেজ বিলক্ষণ বুঝে এবং বুঝে বলিয়াই বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের এই অভিনব অঙ্কুরোদগম দর্শন করিয়া আপনার স্বার্থ ও প্রভুত্বের অনিষ্টাশঙ্কার অধীন হইয়া, বাঙ্গালা দেশকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়া বাঙ্গালী জাতির এই বিকাশোন্মুখ রাজনৈতিক শক্তি ও প্রভাবকে ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে।

"বর্ত্তমান ভারতবর্ষে যে অভিনব রাজনৈতিক আন্দোলন-স্রোত প্রবাহিত হইয়া ভারতবাসীর রাজনৈতিক জীবনকে উর্ব্বর ও সজীব করিয়া তুলিতেছে, সেই পুণ্যধারার পবিত্র গোমুখী, ভারত-ভাগ্য-বিধাতা, বহু শতাব্দী হইতে বিষমসম্পাতগ্রস্ত ভস্মাবশিষ্ট ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য, এই মুখসর্ব্বস্ব বাঙ্গালীর মধ হইতেই প্রবাহিত করাইয়াছেন। বোম্বাইয়ে, মাদ্রাজে, পঞ্জাবে, আগ্রা ও অযোধ্যায় যে রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা আজ জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার মূলে এই অধম বাঙ্গালী জাতির রাজনৈতিক-

আন্দোলন-আলোচনা প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। বাঙ্গালী কার্য্যক্ষম নহে, কিন্তু অবলাজনের ন্যায় তাহার দুর্ব্বল হৃদয়ের সংস্পর্শে ভারতের কর্ম্মঠ ও বীর্য্যবান্ জাতিসকলের জীবনে, ভাবে, চরিত্রে ও চেষ্টায় এক অলৌকিক বল সঞ্চার করিয়া দিয়াছে। এখনও ভারতের অন্যত্র লোকে রাজনীতি ক্ষেত্রে যে সৎসাহসের পরিচয় দিতে পারে না,—বাঙ্গালী প্রতিদিন তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে।***গোমুখীতে গঙ্গার ক্ষীণ নির্ঝরকে যদি বন্ধ করিতে পারা যায়, তবে গঙ্গা-পদ্মা, সকলের শক্তি যেরূপ ক্ষীণ হইয়া যাইবে সেইরূপ বাঙ্গালীর রাজনৈতিক জীবনকে যদি ভাঙ্গিয়া দিতে পারা যায়, তবে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্তাপ ও বেগ নিশ্চয়ই কমিয়া আসিবে। এইজন্যই, আপনার ভবিষ্যৎ অকল্যাণের আশঙ্কা সমূলে উৎপাটন করিবার জন্য ইংরেজ এই বঙ্গবিভাগ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছে।

"বাঙ্গালার রাজনৈতিক শক্তি বাঙ্গালী-হিন্দুদিগের মধ্যে বিশেষভাবে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালী হিন্দুদিগের ঐক্য ও উপচীয়মান প্রভুত্বকে যদি বিনাশ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে বাঙ্গালার রাজনৈতিক জীবন ও শক্তি বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এই বঙ্গবিভাগের দ্বারা ইংরেজ তাহারই চেষ্টা করিতেছে।"

প্রতিকার চেষ্টা

অবিলম্বে প্রতিকার চেষ্টা আরম্ভ হইল। সুরেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে প্রকাশ :—"পাথুরিয়াঘাটায় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাসাদে পরামর্শ-সভার অধিবেশন হইল। মহারাজা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং সভার কার্য্যে যোগদান করেন। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে মিষ্টার এইচ-ই-এ কটনও ছিলেন। তিনি তখন কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতেন। এক্ষণে (১৯২৫ সালে) তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেণ্ট। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল উহার প্রতি তাঁহার পূর্ণ সহানুভূতি ছিল।

"ষ্টেটসম্যান" পত্রের তদানীন্তন সম্পাদক মিষ্টার র‍্যাটক্লিফ এবং ইংলিশম্যানের তদানীন্তন সম্পাদক মিষ্টার ফ্রেজার ব্লেয়ারও এই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। এংলো-ইণ্ডিয়ানগণ প্রায়ই সরকারকে সমর্থন করেন; কিন্তু বঙ্গব্যবচ্ছেদ-ব্যাপারে তাঁহারা সরকারের অনুসৃত কার্য্যপদ্ধতির নিন্দা করিয়াছিলেন। তবে অধিক দিন তাঁহাদের এই মনোভাব স্থায়ী হয় নাই। সে যাহা হউক, বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সূত্রপাতের সময়ে এংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলির অভিমত আমাদেরই অনুকূল ছিল।

এই পরামর্শ-সভায় ইহাই স্থির হয় যে, মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বড়লাটের নিকট এই মর্ম্মে টেলিগ্রাম করিবেন যে, বঙ্গভঙ্গের আদেশ সম্বন্ধে যেন পুনর্ব্বিবেচনা করা হয়। একান্তই যদি শাসন-কার্য্যের সুবিধার জন্য বঙ্গদেশ দ্বিভাগ করা আবশ্যকই হয়, তাহা হইলে বঙ্গভাষা-ভাষী জনগণকে একই শাসন-ভুক্ত করা হউক অর্থাৎ বঙ্গভাষা-ভাষীগণকে লইয়া একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠিত হউক।

পরে লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন লর্ড কার্জ্জন-কৃত বঙ্গভঙ্গের সংস্কার সাধন করেন, তখন তিনি এই পরামর্শ-সভার সিদ্ধান্তকেই কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা দেশকে যদি এরূপভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইত, যাহাতে বঙ্গভাষাভাষী জনগণ এক ভাগে এবং অবশিষ্ট জনগণ অপর ভাগে পড়িত, তাহা হইলে শাসন-ঘটিত অসুবিধা দূরীভূত হইতে পারিত এবং তাহাতে জনসাধারণও সন্তুষ্ট হইত। কিন্তু এই ব্যবস্থা লর্ড কার্জ্জন ও তাঁহার পরিচালিত গবর্ণমেণ্টের মনঃপূত হয় নাই। কারণ, এই ব্যবস্থার অন্তরালে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিহিত ছিল; সেই জন্যই মহারাজার প্রস্তাব-অনুযায়ী বঙ্গ-বিভাগ করিতে লর্ড কার্জ্জন ও তাঁহার গবর্ণমেণ্ট সম্মত হন নাই।

৭ই আগষ্ট—প্রথম প্রতিবাদ-সভা

মহারাজা স্যর যতীন্দ্রমোহনের প্রাসাদে পরমর্শ-সভার পর ইণ্ডিয়ান

এসোসিয়েসন ভবনে অথবা মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরীর আলয়ে প্রায় প্রত্যহই পরামর্শ-সভা বসিতে লাগিল। এই সকল অধিবেশনে আলোচনার ফলে স্থির হইল যে, ৭ই আগষ্ট কলিকাতার টাউন হলে এক বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। এই সভার অধিবেশনের দিন যাহাতে মফস্বলের নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন সেইজন্য তাঁহাদিগকে পত্র লেখা হইল। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে জানাইলেন যে, তাঁহারা এই সভার কার্য্যে উৎসাহ-সহকারে যোগদান করিবেন।

সুরেন্দ্রনাথের বন্ধু অনাথবন্ধু গুহ মহাশয় তাঁহাকে পত্রযোগে জানাইলেন যে, মফঃস্বলের অধিবাসীগণকে সংহতি ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইবার জন্য টাউনহলের সভার তারিখ পিছাইয়া দেওয়া হউক। কিন্তু বঙ্গ-ভঙ্গের আদেশ-প্রচারের ফলে লোকের মনে যে উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে এবং সকলেই প্রতিবাদের তরঙ্গ তুলিবার জন্য যেরূপ ব্যস্ত হইয়াছেন, তাহাতে সভার দিন পিছাইয়া দেওয়া সুরেন্দ্রনাথের সহ-যোগীগণ যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। সেইজন্য সুরেন্দ্রনাথ অনাথবন্ধু গুহ মহাশয়কে লিখিলেন যে, এ সকল ব্যাপারে সময় উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পরম সহায়; উহাকে উপেক্ষা করা চলে না। প্রতিবাদের স্বরূপ যত শীঘ্র সম্ভব সকলকে দেখাইয়া দেওয়া উচিত। তাহা হইলে এই আন্দোলন কি ভাবে কোন্ পথে পরিচালিত হইবে তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে; ইহার ফলে সমগ্র দেশে অন্দোলনের ভবিষ্যৎ গতি-প্রকৃতির ধারা নির্দ্ধারিত হইতে পারিবে।

৭ই আগষ্টের সভায় কি কি প্রস্তাব গ্রহণ করা হইবে অনেকগুলি পরামর্শ-সভায় সে সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা হইয়াছিল। এই সকল সভায় পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যোগদান করিয়াছিলেন। কেবল সভায় বক্তৃতা করিয়া যে কোনও ফল হইবে না—ইহা সকলেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। লর্ড কার্জ্জনের গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের অভিমতকে বরাবরই প্রকাশ্যভাবে উপেক্ষা ও অপমান করিয়া আসিতে-ছেন। প্রতিবাদের জন্য আরও কিছু আবশ্যক—যাহাতে গবর্ণমেণ্ট

বুঝিতে পারেন যে, লোকের মনে লোকমতের উপেক্ষাজনিত যে তীব্র বেদনা আছে তাহা এই আন্দোলনের মূলে সঞ্চিত রহিয়াছে। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে প্রায় প্রত্যহ যে সকল সভা হইত, তাহাতে নানারূপ প্রস্তাব লোকে করিতেন। তন্মধ্যে একটি প্রস্তাব এই—আমরা সকল অবৈতনিক পদে, যথা—অনারারী হাকিম, জেলা বোর্ড ও মিউনিসি-প্যালিটীর সদস্যপদগুলিতে ইস্তফা দিব। কিন্তু এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি উঠিল। জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটীর সদস্যরূপে এবং অনারারী হাকিমের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আমরা দেশবাসীর সেবা করিবার সুযোগ পাইতেছি; বিশেষতঃ এই পদগুলিতে অধিষ্ঠিত আছি বলিয়া সাধারণের উপর আমাদের প্রভাববিস্তারেরও কতকটা সুবিধা আছে; ইহা বর্ত্তমান আন্দোলনে আমাদের আনুকূল্য করিবে। তার পর,—এই ইস্তফা-দানের ব্যাপারে সমগ্র দেশ আমাদের অনুসরণ করিবে কি না তাহাও সন্দেহজনক। এই বিরাট আন্দোলন এবং গবর্ণমেণ্টের সহিত সংঘর্ষের প্রারম্ভে যদি আমরা কিয়ৎপরিমাণেও নিষ্ফল হই, তাহা হইলে তাহার ফল শোচনীয় হইবে। এইজন্য অবৈতনিক পদগুলিতে ইস্তফা দিবার প্রস্তাব বর্জ্জন করা হইয়াছিল।"

বাঙ্গালীর মহাজাগরণ

বঙ্গবিভাগের প্রস্তাবের প্রতিবাদ-কল্পেই যে, বাঙ্গালী প্রথম রাজ-নৈতিক আন্দোলন আরম্ভ করে তাহা নহে; ইহার পূর্ব্বেও বাঙ্গালী বহুবার সরকারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিল। সেই সকল আন্দোলনের মূলে ছিল ব্রিটিশ বিচার-নীতির উপর অবিচলিত বিশ্বাস এবং ইংরেজের ন্যায়পরতার প্রতি সুদৃঢ় আস্থা। কিন্তু বঙ্গ-বিভাগের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বাঙ্গালী যে আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহার মূলে যে ইংরেজের ন্যায়নিষ্ঠার উপর পূর্ণ অবিশ্বাস ছিল, এমন কথা বলা চলে না। কারণ, বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের নেতৃবর্গ বিলাতের গবর্ণমেণ্টের ও বিলাতের জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্যই

এই আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; সুরেন্দ্রনাথ—এই আন্দোলনকে 'Constitutional agitation' অর্থাৎ বৈধ আন্দোলন নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। ইহার অর্থ কি? ইংরেজের বিধি-ব্যবস্থার গণ্ডীর ভিতরে এই আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ করিয়া পরিচালিত করিতে হইবে। সুতরাং ইহাতে বুঝা যায়, ইংরেজের বিধি-ব্যবস্থা ও বিচার-নীতির উপর তখনও বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের নেতৃবর্গের বিশ্বাস বিনষ্ট হয় নাই, তবে উহা যে হ্রাস পাইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সূত্রপাতে বাঙ্গালীর ভাব পরিবর্ত্তন বা মানসিক বিপ্লবের যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে এই আন্দোলনের ও বাঙ্গালীর মহাজাগরণের স্বরূপ ও তত্ত্ব উপলব্ধি হইতে পারিবে। এ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন :—

"বাঙ্গালীর আলোচনা-আন্দোলনের অভাব ছিল না; আত্মচেষ্টার অভাবেই বাঙ্গালী জানিয়া-শুনিয়াও হৃদয়-দৌর্ব্বল্য পরিহার করিতে পারে নাই। সেইজন্য বাঙ্গালীর আলোচনা-আন্দোলন প্রথামাত্রে পর্য্যবসিত হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছিল; তাহা প্রতিদিবসের কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না পারিয়া, সভামণ্ডপকেই আশ্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ঘটনাক্রমে তাহা এখন সভা ছাড়িয়া গৃহে গৃহে, হৃদয়ে হৃদয়ে স্থানপ্রাপ্ত হইতেছে; একস্থান ছাড়িয়া অনেক স্থানে,—অনেক স্থান ছাড়িয়া সকল স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে। ইহাতেই বাঙ্গালীর আত্মচেষ্টা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিবার আশা হইয়াছে।

"বাঙ্গালী বিচ্ছিন্ন হইয়াই উৎসন্নে গিয়াছিল। সে অনেক দিনের কথা,—অনেক ঘটনার কথা,—অনেক অকথ্য কলঙ্কের কথা! বহু বিড়ম্বনা সহ্য করিয়া বাঙ্গালী যেদিন আত্মশক্তি লাভ করিবার সন্ধিকাল প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেদিনও আত্মচেষ্টার উপর নির্ভর করিতে সাহস করে নাই। সেদিন বাঙ্গালী কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির আশায় পরশক্তির কণ্ঠলগ্ন হইয়াছিল। যাহাদের সহায়তায় বহু বিপ্লবের অবসানে বাঙ্গালী শান্তিলাভ করিয়াছে, বাঙ্গালী তাহাদিগকে আপন স্কন্ধে বহন করিয়া

আনিয়াই রাজসিংহাসনে বসাইয়া দিয়াছিল। শ্রদ্ধায়, বিশ্বাসে, ভক্তিতে বিগলিত হইয়া বাঙ্গালী তাহাদের মন্ত্রী সাজিয়া, দালাল সাজিয়া, গোমস্তা সাজিয়া, লাঠিয়াল সাজিয়া, ভারত-বিজয়ের সহায়তা-সাধনের জন্য অকাতরে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে ;—স্বদেশের ইতিহাস-বিখ্যাত শিল্পবাণিজ্যের সর্ব্বনাশ সাধিত করিয়াও বিদেশের শিল্প-বাণিজ্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে ইতস্ততঃ করে নাই! একদিনের জন্যও বাঙ্গালীর প্রভুভক্তি পরাভূত হয় নাই ; বরং রাজাকে অবতার জ্ঞান করিয়া বাঙ্গালী কাতরনয়নে ভিক্ষাপাত্রহস্তে রাজদ্বারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অধ্যবসায়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে! মুষ্টিভিক্ষার আশা পাইলে, আশামাত্র লইয়াই বাঙ্গালী কত উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে ;—আত্মশক্তির ছায়া পাইলে, ছায়াকে কায়া দান করিবার আশায় বাঙ্গালী কত প্রাণপণে অবৈতনিক রাজকার্য্যের ভার বহন করিয়াছে; এক রাজপুরুষ যাহা দান করেন, অন্য রাজপুরুষ আসিয়া তাহার প্রত্যাহার করিলে বাঙ্গালী সেই হস্তবিচ্যুত অধিকারের উদ্ধার-সাধনের আশায় পুনঃ পুনঃ পরিশ্রান্ত হইয়াও রাজদ্বার পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করে নাই। অবশেষে আঘাতের পর আঘাতে রাজদ্বার উন্মুক্ত না হইয়া, মাতৃভূমির মঙ্গলদ্বার উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালী বুঝিয়াছে,—বাঙ্গালী যাহার জন্য কাতর ক্রন্দনে রাজদ্বারে করাঘাত করিতে গিয়া কশাঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা ছায়া,—অধিকার নহে ;—অধিকারের ছদ্মবেশ! প্রধান রাজ-পুরুষ স্বয়ং আয়াস স্বীকার করিয়া বুঝাইয়া দিতেছেন;—প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণীর ইতিহাসবিখ্যাত ঘোষণাপত্রও ছায়া ;—তাহাও —অধিকারপত্র নহে, অধিকার-পত্রের ছদ্মবেশ! ইহাতে বাঙ্গালী বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল ; প্রধান রাজপুরুষের ভ্রম-প্রদর্শনের জন্য তর্কযুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিল। এমন সময়ে সকলেই চাহিয়া দেখিল,—স্বায়ত্ত-শাসন, উচ্চশিক্ষা, অভ্যুদয়সাধক মিলনক্ষেত্র,—সমস্তই একে একে ভাসিয়া চলিয়া যাইতেছে ;—জনসাধারণের কাতর ক্রন্দন উপেক্ষা করিয়া, তাহাদের পরাধীনতার কথা হাড়ে হাড়ে ক্ষোদিত করিয়া দিয়া, অকূলসাগরে ভাসিয়া চলিয়া যাইতেছে। পরশক্তির উপর বিশ্বাস

এইরূপে একবার বিচলিত হইবামাত্র, আত্মশক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবসর উপস্থিত হইয়াছে।

"এত কালের পর! তথাপি ইহাই পরম লাভ বলিয়া বাঙ্গালী আত্মচেষ্টার আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। আত্মচেষ্টা ভিন্ন কোন জাতি অভ্যুদয় লাভ করিতে পারে না। তাহাই আত্মশক্তির মূল। রাজভক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, রাজশক্তির মুখাপেক্ষী না হইয়া, প্রজাশক্তি আত্মচেষ্টায় কিরূপে অভ্যুদয় লাভ করিতে পারে, আধুনিক সভ্যসমাজ তাহার বিবিধ পথের সন্ধান প্রদান করিয়াছে। বাঙ্গালী জাগিয়া উঠিয়া, সেই পথে ধাবিত হইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছে। রাজপুরুষগণ না বুঝিয়া, ইহাকে রাজবিদ্রোহ ভাবিয়া, আতঙ্কে অধীর হইয়া, হাস্যাস্পদ হইতেছেন। আবেদনে আন্দোলনে রাজপ্রসাদ লাভ করিলেও, তাহা পুনরায় হস্তচ্যুত হইতে কতক্ষণ? যাহা রাজপ্রসাদে বর্দ্ধিত হয় না—রাজরোষেও বিনষ্ট হইতে পারে না, বাঙ্গালী সেই প্রজাশক্তি লাভ করিবার জন্যই লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে। তাহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের—সমগ্র সভ্যসমাজের—সর্ব্ববাদি-সম্মত ন্যায়ানুমোদিত অক্ষুণ্ণ অধিকার। তাহাকে রাজবিদ্রোহ বলিয়া তিরস্কার করিবার উপায় নাই।

"বাঙ্গালী আর কখনও এমন করিয়া এই মহারত্ন লাভ করিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করে নাই। এই ব্যাকুলতা একের নহে, অনেকের নহে, সকলের। ইহাই যে বাঙ্গালীর আন্তরিক ব্যাকুলতা তাহা বুঝিবার জন্য ধীরে ধীরে চেষ্টা না করিয়া, রাজপুরুষগণ অধীর হইয়া উঠিতেছেন।" *

বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রস্তাবে সমস্ত দেশের লোকের ভাবনা একসঙ্গে জাগাইয়া তুলিয়াছে। বাঙ্গালীর উৎসাহ-উদ্যম বহুকালের নিষ্ক্রিয় আগ্নেয়গিরির আকস্মিক অগ্নিনিঃস্রাবের মত বিভিন্ন দিকে উৎসারিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। দেশের চারিদিকে উত্তেজনা। মানুষ যেন

---

* বঙ্গদর্শন, পৌষ, ১৩১২ ; ৪২৬—৪২৮ পৃষ্ঠা। ('নবজীবন' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)

কি করিব—কি করিব বলিয়া পাগল হইয়া উঠিয়াছে। সকলেই বলিতেছে—আমরা দল বাঁধিয়া লর্ড কার্জ্জনর এই জবরদস্তির প্রতিকার করিব। এই অবস্থার একটি চিত্র কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধে চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছিল। প্রবন্ধটী তিনি কলিকাতার টাউন হলে ১৩১২ সালের ৯ই ভাদ্র পাঠ করিয়াছিলেন। ইহারই এক স্থলে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"ঐক্যের যে কি শক্তি, কি মাহাত্ম্য, তাহা ইংরেজ আমাদের চেয়ে ভাল করিয়াই জানে। ইংরেজ জানে, ঐক্যের অনুভূতির মধ্যে কেবল একটা শক্তিমাত্র নহে, পরন্তু এমন একটা আনন্দ আছে যে, সেই অনুভূতির আবেগে মানুষ সমস্ত দুঃখ ও ক্ষতি তুচ্ছ করিয়া অসাধ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হয়। ইংরেজ আমাদের চেয়ে ভাল করিয়াই জানে যে, ক্ষমতা-অনুভূতির স্ফূর্ত্তি মানুষকে কিরূপ একটা প্রেরণা দান করে। উচ্চ অধিকার লাভ করিয়া রক্ষা করিতে পারিলে সেইখানেই তাহা আমাদিগকে থাকিতে দেয় না —উচ্চতর অধিকার-লাভের জন্য আমাদের সমস্ত প্রকৃতি উন্মুখ হইয়া উঠে। আমাদের শক্তি নাই, আমরা পারি না, এই মোহই সকলের চেয়ে ভয়ঙ্কর মোহ। যে ব্যক্তি ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার পায় নাই, সে আপনার শক্তির স্বাদ জানে না; সে নিজেই নিজের পরম শত্রু। সে জানে যে, আমি অক্ষম এবং এইরূপ জানাই তাহার দারুণ দুর্ব্বলতার কারণ। এরূপ অবস্থায় ইংরেজ যে আমাদের মধ্যে ঐক্যবন্ধনে পোলিটিকাল-হিসাবে আনন্দ বোধ করিবে না, আমাদের হাতে উচ্চ অধিকার দিয়া আমাদের ক্ষমতার অনুভূতিকে উত্তরোত্তর সবল করিয়া তুলিবার জন্য আগ্রহ অনুভব করিবে না, এ কথা বুঝিতে অধিক মন-শক্তির প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশে যে সকল পোলিটিক্যাল্ প্রার্থনা-সভা স্থাপিত হইয়াছে, তাহারা যদি ভিক্ষুকের রীতিতেই ভিক্ষা করিত, তাহা হইলেও হয় ত মাঝে মাঝে দরখাস্ত মঞ্জুর হইত—কিন্তু তাহারা গর্জ্জন করিয়া ভিক্ষা করে, তাহারা দেশ-বিদেশের লোক একত্র করিয়া ভিক্ষা করে, তাহারা ভিক্ষাবৃত্তিকে একটা শক্তি করিয়া তুলিবার চেষ্টা করে, সুতরাং এই

শক্তিকে প্রশ্রয় দিতে ইংরেজ রাজা সাহস করে না। ইহার প্রার্থনা পূরণ করিলেই ইহার শক্তির স্পর্দ্ধাকে লালন করা হয়—এইজন্য ইংরেজ-রাজনীতি আড়ম্বর-সহকারে ইহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া ইহার গর্ব্বকে খর্ব্ব করিয়া রাখিতে চান। এমন অবস্থায় এই সকল পোলিটিক্যাল্ সভা কৃতকার্য্যতার ফল লাভ করিতে পারে না ;—একত্র হইবার যে শক্তি, তাহা ক্ষণকালের জন্য পায় বটে, কিন্তু সেই শক্তিকে একটা যথার্থ সার্থকতার দিকে প্রয়োগ করিবার যে স্ফূর্ত্তি, তাহা পায় না। সুতরাং নিষ্ফল চেষ্টায় প্রবৃত্ত শক্তি ডিম্ব হইতে অকালে জাত অরুণের মত পঙ্গু হইয়াই থাকে—সে কেবল পরের রথেই জোড়া থাকিবার উমেদার হইয়া থাকে, তাহার নিজের উড়িবার কোনো উদ্যম থাকে না।”

বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালীর অবস্থা যেরূপ হইয়াছিল, বাঙ্গালীর আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি যেরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহা রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তি হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। বাঙ্গালী তখনও ইংরেজের ন্যায়-বিচারের উপর আস্থা একেবারে হারায় নাই ; অথচ আত্মশক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইতেও পারে নাই। তখন কংগ্রেস সুরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ নেতৃবর্গের হস্তে। তাঁহাদের বিশ্বাস,—আন্দোলন রীতিমত চালাইতে পারিলে বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ লর্ড কার্জ্জনের এই অন্যায় প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে দিবেন না ; আবার তাঁহারা ইহাও বুঝিলেন - এই আন্দোলনের ফলে দেশের লোক আত্মশক্তিতে নির্ভরশীল হইতে চাহিতেছে—এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে। সে সময়ে সুরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ প্রবীণ নেতৃদলের ইহাই ধারণা হইয়াছিল যে, বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের ফলে দেশবাসী যখন প্রয়োজন বুঝিবে তখন গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইবে এবং যেখানে তাহার প্রয়োজন বুঝিবে না সেখানে তাহারা আত্মনির্ভর হইবে। বঙ্গব্যবচ্ছেদ-আন্দোলনের সময় বাঙ্গালীর মনের অবস্থা এইরূপই হইয়াছিল। মোট কথা, বাঙ্গালী তখন সম্পূর্ণরূপে আত্মশক্তিতেও বিশ্বাসবান হইতে পারিতেছিল না, এবং গবর্ণমেণ্টের প্রতি আশা ও নৈরাশ্য যুগপৎ বাঙ্গালীর হৃদয়কে আলোড়িত করিতেছিল।

বিদেশী বর্জ্জন ও স্বদেশী আন্দোলন

বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বাঙ্গালী যখন তাহার সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিল, সেই সময়ে কখন কেমন করিয়া সেই বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের মধ্যে 'বয়কট' বা বিদেশী পণ্য-বর্জ্জন এবং স্বদেশী-গ্রহণের আন্দোলন অনুপ্রবিষ্ট হইল এবং প্রথমোক্ত আন্দোলনকে চাপা দিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, তাহার প্রকৃত তথ্য খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভবপর নহে। যখন বাঙ্গালার জনমতকে উপেক্ষিত ও অপমানিত করিয়া লর্ড কার্জ্জনের গবর্ণমেণ্ট বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব করিলেন, তখন গবর্ণমেণ্টের সহিত নানা বিষয় সম্পর্ক ছিন্ন করিবার আলোচনা যে দেশে আরম্ভ হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেই সময়ে হঠাৎ একটা রব উঠিল—ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট যেমন আমাদের মতকে পাদদলিত করিয়াছেন, আমরাও পাণ্টা জবাবে তেমনই ইংরেজের শিল্পদ্রব্য বর্জ্জন করিব ; তাহা হইলে ইংলণ্ডের শিল্পীদের হাঁড়িতে বাড়ি পড়িবে এবং তাহার ফলে তাহাদের দৃষ্টি ভারতের শাসন-ব্যবস্থার দিকে স্বতঃই আকৃষ্ট হইবে। তখন লর্ড কার্জ্জন বাঙ্গালা দেশের অধিবাসীদের প্রতি যে অবিচার করিয়াছেন তাহার প্রতিকার হইবে এবং বঙ্গভঙ্গ বন্ধ হইয়া যাইবে। ইংরেজের দ্বারে কাতর প্রার্থনা না করিয়া আমরা যদি এই উদ্দেশ্যে 'বয়কট' আরম্ভ করি, তাহা হইলে আমাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধিও তেমনই সহজে হইবে। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালী আর কখনও 'বয়কট' আন্দোলনে প্রবৃত্ত হয় নাই। বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব-জনিত অপমানের জ্বালা বয়কটের প্রলেপে যে উপশম বোধ করিয়াছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন ঃ—"বয়কটের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা লিখিয়াছেন এবং বলিয়াছেন। কিন্তু কাহার উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে ইহা প্রথম উদ্ভূত হইয়াছিল এবং প্রচারিত হইয়াছিল তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। তবে বাঙ্গালার

আকাশ 'বয়কটে'র হাওয়ায় ভরিয়া গিয়াছিল। যখন কোনও আকস্মিক বৃহৎ ঘটনায় জনশক্তি জাগ্রৎ হইয়া উঠে, যখন জাতির অন্তর্নিহিত শক্তির রুদ্ধ উৎস-মুখ হঠাৎ খুলিয়া যায়, যখন জাতির সুপ্ত শক্তি কোনও বিরাট স্পন্দন বা আলোড়নে জাগিয়া উঠে অথবা জাতি যখন তাহার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সংযোজিত করিবার জন্য আগ্রহাকুল হইয়া উঠে, তখন নব নব ভাবের উদ্দীপনায় ও সাফল্যের চাঞ্চল্যে জাতি কর্ত্তব্যের প্রেরণা অনুভব করে ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া থাকে।"

বিদেশী-বর্জ্জনের ভাব স্বদেশীগ্রহণের আন্দোলনের সহিত আরও প্রবল হইয়া উঠিল। দেশীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও উন্নতি-সাধনের জন্য জনসাধারণ ব্যগ্র হইয়া পড়িল। হাটে মাঠে বাটে গান হইতে লাগিল—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই
দীন দুখিনী মা যে মোদের
তার বাড়া তাঁর সাধ্য নাই।"

বয়কট-আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গেই স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। স্বদেশী শিল্পের পুনরুদ্ধার ও বিদেশীর পরিবর্ত্তে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার এই আন্দোলনেরই ফল। দেশের সর্ব্বত্র স্বদেশীভাব প্রচারিত হইল। বাঙ্গালী স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিতে বদ্ধপরিকর হইল। দেশের গগনে পবনে স্বদেশী ভাব। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বদেশী-ভাবে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এদিকে লোকে স্বদেশজাত-দ্রব্য ব্যবহার করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল বটে, কিন্তু আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য তখন স্বদেশে প্রস্তুত হইত না। কাজেই লোকে বুঝিতে পারিল যে, নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য সম্বন্ধে তাহারা কত অসহায় এবং পরনির্ভর। এই অসহায় অবস্থা হইতে পরিত্রাণ-লাভের জন্য দেশব্যাপী প্রচেষ্টা আরম্ভ হইল। অল্পদিনের মধ্যেই নানারূপ স্বদেশী শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। লোকে ক্রমে বিদেশী ছাড়িয়া স্বদেশজাত দ্রব্য ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে লোকে

বুঝিতে পারিল যে, একমাত্র বয়কট দ্বারা আমাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইবে এবং স্বদেশী শিল্পেরও উন্নতি সাধিত হইবে।

'বয়কট' অবলম্বিত হইবে কি না—সে সম্বন্ধে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রায়ই আলোচনা হইত এবং সে সম্বন্ধে প্রায় প্রত্যহই পরামর্শ বৈঠক বসিত। এই সকল আলোচনার ফলে নেতৃবৃন্দ অনেকটা একমত হইতে পারিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ এই সকল পরামর্শ-সভার প্রাণ-স্বরূপ ও সর্ব্বস্ব ছিলেন। সেই সময়ে দেশের লোকের মনের ভাব যেরূপ হইয়াছিল তাহাতে বয়কটের প্রস্তাব যে জনসাধারণ আগ্রহ-সহকারে গ্রহণ করিবে তাহা নেতৃবর্গ উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ নেতৃবর্গের একটিমাত্র আশঙ্কা হইয়াছিল যে, যদি বাঙ্গালী বয়কট ঘোষণা করে, তাহা হইলে কংগ্রেসের ইংরেজ বন্ধুগণ তাহা কি ভাবে গ্রহণ করিবেন? ইহার ফলে কংগ্রেস কি তাঁহাদের সহানুভূতি হারাইবে? অথবা তাঁহারা বয়কটের উদ্দেশ্য বুঝিয়া উহার প্রতি সহানুভূতিশীল হইবেন? তাঁহারা কি ইহাকে ইংরেজ-বিদ্বেষ-জাত বলিয়া মনে করিবেন? কলিকাতায় এমন অনেক ইংরেজ ছিলেন যাঁহারা বঙ্গভঙ্গের সমর্থন করেন নাই এবং যেভাবে ইহাকে কার্য্যে পরিণত করা হইয়াছে তাঁহারা উহারও অনুমোদন করিতে পারেন নাই। বঙ্গভঙ্গ যাহাতে রদ হইতে পারে, সে পক্ষে তাঁহারা নেতৃবর্গকে পরামর্শ দিয়া আসিতেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি তাঁহাদের পরোক্ষ সাহায্য পাইতেছিলেন। যাহাতে তাঁহাদের মূল্যবান সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইতে না হয় এবং যাহাতে নেতৃগণ বরাবর তাঁহাদের পরামর্শ হইতেও বঞ্চিত না হন এমন কোনও কার্য্য করা উচিত নহে—নেতৃবর্গ এই-রূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই চলিতে উৎসুক ছিলেন। ভারত গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালীর উপর যে অবিচার করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে নেতৃবর্গ ব্রিটিশ জনসাধারণের নিকটও প্রতিকার-প্রার্থী হইয়াছিলেন। নেতৃবর্গ জানিতেন,—ভারত সরকার যে অন্যায় আদেশ প্রচার করিয়াছেন তাহা বলবৎ রাখিবার জন্য লর্ড কার্জ্জন ও ভারত-সচিব যথাসাধ্য প্রয়াসী

হইবেন। ব্রিটিশ জনসাধারণ বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন কিরূপ চক্ষে দেখিবেন, সে বিষয়ে নেতৃবর্গের সন্দেহ ছিল।

সুরেন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে এই মর্ম্মে লিখিয়াছেন ঃ—"বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন গোড়ায় 'ব্রিটিশ-বিরোধী' ছিল না অথবা পরেও উহা ব্রিটিশ-বিদ্বেষী হয় নাই। কিন্তু সরকারপক্ষের সমালোচকেরা এই আন্দোলনকে ব্রিটিশ-বিরোধী প্রতিপন্ন করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। এদেশের যে সকল ইংরেজের সহিত ইংলণ্ডের জনসাধারণের গতি-প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল তাঁহাদের নিকট হইতে ব্রিটিশ জাতির অভিমত জানিবার জন্য আমরা ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলাম। এক ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের প্রবর্ত্তন করিয়া ভারত সরকারের আদেশ নাকচ করিবার জন্য ব্রিটিশ জনসাধারণের নিকট প্রতিকার-প্রার্থী হওয়া যে কিরূপ নির্ব্বোধের কর্ম্ম তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারেন। বাঙ্গালার নেতৃবর্গ নিশ্চয়ই এতটা নির্ব্বোধ ছিলেন না। যে আন্দোলনের মূলে ব্রিটিশ-বিদ্বেষ আছে সেই আন্দোলন দ্বারা ব্রিটিশ জনসাধারণের উপর যে কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারা যাইবে না—এইটুকু বুদ্ধির অভাব তাঁহাদের ঘটে নিশ্চিতই হয় নাই।"

টাউন হলের সভায় বয়কট বা বিলাতী পণ্য-বর্জ্জন সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল তাহা হইতে বুঝা যায় যে, বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদকারীগণ যথোচিত সতর্কতা ও ধীরতার সহিত বয়কট-আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যাঁহারা বঙ্গভঙ্গ-ব্যাপারে বাঙ্গালার নেতৃবর্গের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, তাঁহারা যাহাতে নেতৃবর্গের প্রতি বিরূপ না হন, এজন্য নেতৃবর্গ যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তদানীন্তন নায়কগণ সুরেন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন বয়কট সম্বন্ধে ইংরেজ বন্ধুগণের অভিমত গ্রহণ করেন। সুরেন্দ্রনাথ তদনুসারে তাঁহার ইংরেজ বন্ধুগণকে এই মর্ম্মে পত্র লিখেন যে, বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদকল্পে ইংলণ্ডের জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য বাঙ্গালী জাতি ব্রিটিশ পণ্য বর্জ্জন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। ব্রিটিশ জাতি যদি বঙ্গভঙ্গ নাকচ করিয়া দিতে সহায়তা করেন এবং পার্লামেণ্টের সাহায্যে উহা

নাকচ করাইয়া দেন, তাহা হইলে বাঙ্গালীজাতিও ব্রিটিশ-পণ্য-বর্জ্জন প্রত্যাহার করিবেন। যতদিন বঙ্গভঙ্গ রদ না হইবে ততদিন বিলাতী পণ্য বাঙ্গালা দেশে ব্যবহৃত হইবে না। ইংরেজ বন্ধুগণ সকলেই একবাক্যে নেতৃবর্গের এইরূপ প্রস্তাব-গ্রহণে কোনও রূপ আপত্তি প্রকাশ করেন নাই।

ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের প্রাসাদে স্থির হয় যে, নিম্নলিখিত মর্ম্মের প্রস্তাবটী টাউন হলের সভায় উত্থাপিত ও পরিগৃহীত হইবে। টাউনহলের সভার প্রস্তাবটী ছিল এই ঃ—

বাঙ্গালা দেশের মফস্বলের বহু সভায় এইরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, যতদিন পর্য্যন্ত বঙ্গভঙ্গ রদ না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য বাঙ্গালী জাতি ক্রয় করিবে না। বিলাতের জনসাধারণ ভারত-শাসন-ব্যাপারের প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন বলিয়া ভারতের বর্ত্তমান শাসক-সম্প্রদায় ভারতের লোকমতকে উপেক্ষা করেন। ইহার প্রতিবাদ-কল্পেই বাঙ্গালীজাতি ব্রিটিশ-পণ্যবর্জ্জনের এই সঙ্কল্প করিয়াছিল।

টাউন হলের সভা বাঙ্গালার জনসাধারণের এই সঙ্কল্পের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছিল।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন ঃ—"ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, কোন বিশিষ্ট উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বাঙ্গালী কিছুদিনের নিমিত্ত বিলাতি পণ্য-বর্জ্জনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই বয়কট প্রত্যাহার করা হইবে—ইহাই স্থির ছিল। বাঙ্গালী জাতির প্রতি যে ঘোর অবিচার করা হইয়াছিল তাহার প্রতি বিলাতের জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করাই বিলাতী পণ্য-বর্জ্জনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। বঙ্গভঙ্গ রদ হইলে এবং বাঙ্গালীর আপত্তি ও অভিযোগের কারণ দূরীভূত হইলে বয়কটও প্রত্যাহৃত হইবে—ইহাই বাঙ্গালার জনসাধারণের সঙ্কল্প ছিল। বঙ্গভঙ্গ রদ হইলে বাঙ্গালার জনসাধারণও তাঁহাদের সঙ্কল্প অনুসারেই কার্য্য করিয়াছিলেন।

"বয়কট আন্দোলনে মধ্যে মধ্যে অত্যাচার-উপদ্রব যে হইয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সকল বৈধ আন্দোলনেই এইরূপ দোষ-ত্রুটি

হইয়া থাকে ; কারণ এই ত্রুটি সকল মানুষের প্রকৃতিতেই আছে। কার্য্য যতই নিঃস্বার্থ ও মহৎ হউক—সকল কার্য্যেই ধীরপন্থা ও চরমপন্থা আছে। জনসাধারণের প্রতি অবিচারের প্রতিকার করিতে হইলে বৈধ উপায় অবলম্বন না করিয়া অত্যাচার-উপদ্রবের পথ অবলম্বন করিতে হইবে ;—এ কথা কেহই বলে না। বৈধ আন্দোলনের ভিতরেও অত্যাচার-উপদ্রব ঘটিয়া থাকে, কিন্তু তাহা হয় বলিয়া অত্যাচার-উপদ্রবের পথই অবলম্বনীয় নহে। যদি কেহ ইহাই অবলম্বনীয় বলিয়া মত প্রকাশ করেন, তাহা হইলে মানব-ইতিহাসের কয়েকটি সমুন্নত ও সুমহৎ অধ্যায় রচিতই হইত না এবং বৈধ উপায়ে স্বাধীনতা-লাভের জন্য মানবজাতি যে নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও একনিষ্ঠ স্বদেশপ্রেমের পরিচয় প্রদান করিয়া আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতেছে, আমরা আজ তাহা হইতে বঞ্চিত হইতাম। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালাদেশে বিপ্লববাদমূলক প্রচারকার্য্য আছে ; তবে উহার প্রভাব যে নিতান্ত অল্প সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এইজন্য কি বৈধ-রাজনৈতিক আন্দোলন ত্যাগ করিতে হইবে? ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় প্রগতির যাঁহারা পরিপন্থী তাঁহারা ত ইহাই কামনা করেন। যাঁহারা ভারতবাসীর রাজনৈতিক উন্নতি ও অভ্যুদয়ের কামনা করেন, তাঁহারা কখনই এরূপ কামনা করিতে পারেন না।

"বয়কট বা বিলাতী-পণ্য-বর্জ্জনের প্রস্তাব সভায় উপস্থাপিত করিবার ভার নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের উপর অর্পিত হইয়াছিল এবং তিনিই সেই প্রস্তাব সভায় উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার এই প্রস্তাব বিপুল উৎসাহ-সহকারে ও একবাক্যে পরিগৃহীত হইয়াছিল।

"বিলাতী-পণ্য-বর্জ্জনের এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ শ্বেতাঙ্গ সম্পাদকগণ প্রথমে করেন নাই। পরে তাঁহারা বয়কটের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে লেখনী চালনা করিয়াছিলেন। 'ষ্টেটসম্যান' পত্র বয়কট আন্দোলনকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন ; কিন্তু বয়কট-আন্দোলনকে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন বলিয়া অভিহিত করেন নাই। এই আন্দোলন সম্বন্ধে 'ষ্টেটসম্যানে'র অভিমত প্রণিধানযোগ্য। 'ষ্টেটসম্যানে'র অভিমতের মর্ম্ম এই :—

'বিলাতী-পণ্য-বর্জ্জন প্রস্তাবের জন্য যাঁহারা দায়ী, তাঁহারা চীনের অধিবাসীদিগের আদর্শেই যে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চীনের অধিবাসীরা আমেরিকা-জাত পণ্য বর্জ্জন করিয়া সাফল্য লাভ করিয়াছিল, বাঙ্গালার প্রস্তাবকারীরা ইহাতে আশান্বিত হইয়া বিলাতী-পণ্য-বর্জ্জনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইউরোপীয়গণ এজন্য একাধিক কারণে না হাসিয়া থাকিতে পারিবেন না। তবে ইহা দেখিয়া গবর্মেণ্ট যদি মনে করেন যে, সমগ্র আন্দোলন ভণ্ডামিমাত্র, তাহা হইলে তাঁহারা বুদ্ধিমানের কার্য্য করিবেন না। বরং কিছুদিন হইতে দেখা যাইতেছে যে, বঙ্গদেশের জনসাধারণ গবর্মেণ্টের কার্য্যের প্রতিবাদের অন্য প্রকার প্রবলতর উপায় অবলম্বন করিতে শিক্ষা করিয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় রাজনৈতিক আন্দোলন-ক্ষেত্রে যে নূতন কার্য্যকর পদ্ধতির প্রবর্ত্তন হইয়াছে, গবর্মেণ্ট তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না'।"

বয়কটের প্রস্তাব-সম্পর্কে প্রথমে এংলো-ইণ্ডিয়ানগণের অভিমত যে বিরূপ ছিল না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পরে যে তাঁহাদের অভিমত আন্দোলনের প্রতিকূল হইয়াছিল তাহার কারণ—সরকার এই আন্দোলনকে বিষ-নেত্রে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই আন্দোলন যতই সফল ও প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, এংলো-ইণ্ডিয়ানগণের অভিমতও ততই উহার বিরোধী হইয়া পড়িতেছিল। কোনও নূতন অবস্থার উদ্ভব হইলে অথবা যেরূপ অভ্যুদয়ের আশা করা যায় নাই সেরূপ অভ্যুদয় ঘটিলে আমলাতন্ত্র সরকার সেই অবস্থার অনুকূল ব্যবস্থা করিতে অক্ষম হইয়া থাকেন। যতদিন অবস্থা 'যথা পূর্ব্বং তথা পরং'-বৎ ছিল; যতদিন অবস্থার গতানুগতিকতা নষ্ট হয় নাই, ততদিন আমলাতন্ত্র পুরাতন নথিপত্রের নজীর দেখাইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে শাসনকার্য্য পরিচালন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু যখন আকাশে মেঘের উদয় হইল, ভীষণ ঝটিকার পূর্ব্বলক্ষণ দৃষ্ট হইল, তখন শাসক-সম্প্রদায় চঞ্চল ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন; তখন নথিপত্রে যার নজীর মিলে না; দপ্তরে আর উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; সত্যই তাঁহারা অধীর

হইয়া পড়িলেন ; মনের শান্তি নষ্ট হইল ; চাঞ্চল্য ক্রোধে পরিণত হইল এবং যেখানে বিপদ নাই সেখানে বিপদের মিথ্যা আশঙ্কা করিয়া চণ্ডনীতি অবলম্বন করিলেন ; তাহাতে ফল বিপরীত হইল ; শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তিই প্রবল হইয়া উঠিল।

ভারতে আর কখনও বয়কট-আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হয় নাই ; প্রবর্ত্তন ত দূরের কথা,—উহার কল্পনাও কেহ করে নাই, প্রবর্ত্তনের চেষ্টাও কেহ করে নাই। ইহার পরিকল্পনা যে বিপুল সাহসিকতাপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। প্রথমে দর্শকেরা ইহাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়াছিলেন ; কিন্তু যখন অল্পদিনের মধ্যেই ইহার সাফল্য দেখিতে পাওয়া গেল, তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, এই আন্দোলনের প্রতি জনসাধারণের কিরূপ সহানুভূতি ছিল। দেশসুদ্ধ লোক ইহাকে সমর্থন করিয়াছিল ; নহিলে ইহা ব্যর্থ হইয়া যাইত। ইহার সাফল্য দেখিয়া ইহার প্রবর্ত্তকগণ পর্য্যন্ত বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন ; কারণ, এতদূর সাফল্যের আশা তাঁহারাও করেন নাই। কিন্তু শাসক-সম্প্রদায় জনসাধারণের এই বিরাট জাগরণের ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন না। সরকারী দপ্তরখানার নথিপত্রে এই জাগরণের নজীর নাই বলিয়া তাঁহারা বাঙ্গালীর জাগরণের পরিচয় লইলেন না। কাজেই জনসাধারণের নব জাগরণ ও নবীন উদ্দীপন দেখিয়া তাঁহারা চমকিয়া উঠিলেন ; বিচলিত হইলেন ; আত্মসংযম হারাইলেন ; যেখানে বুদ্ধি-বিবেচনার প্রয়োগ করিয়া শান্তভাবে কাজ করিলে ফল হইত, সেখানে কঠোর দমননীতির প্রয়োগ করিলেন। কাজেই চারিদিকে অশান্তি অধিকপরিমাণে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল ; শাসক-সম্প্রদায় আইন ও শৃঙ্খলার নামে লোকের মনোভাব প্রকাশের অধিকার কাড়িয়া লইবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন ; জনসাধারণের কণ্ঠরোধে উদ্যত হইলেন ; তাঁহারা যতই কঠোরতা অবলম্বন করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইতে লাগিল। এদিকে লোকের উৎসাহ এবং অশান্তিও ততই দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিল। ব্যাপার দেখিয়া কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন—

"ওদের আঁখি যত রক্ত হবে
মোদের আঁখি ফুটবে,
ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে
মোদের বাঁধন টুটবে।"

স্বদেশী আন্দোলন ও ছাত্রসমাজ

স্বদেশী ও বিলাতী-বর্জ্জন আন্দোলনে ছাত্রসমাজ কিরূপ কার্য্য করিয়াছিল স্থরেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে তাহার নিম্নরূপ পরিচয় দিয়াছেন :—

"ছাত্রসম্প্রদায় যে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহারা উৎসাহ ও আগ্রহের আতিশয্যে সময় সময় সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়াছিল। যখন কোনও বিরাট নূতন ভাবের বন্যা কোনও সম্প্রদায়ের চিত্ত আলোড়িত করিয়া তুলে, তখন তরুণের ভাব-চঞ্চল হৃদয়ই সেই নব ভাবের প্রেরণা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুভব করিয়া থাকে। সকল যুগেই নব আন্দোলনের প্রবর্ত্তকগণ তরুণ সম্প্রদায়কেই উদ্দেশ করিয়া আপনাদের ভাব ব্যক্ত করেন। খৃষ্টধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, সাক্ষাৎ ভগবদ্-প্রেরণা-প্রাপ্ত যুগাবতার যীশুখৃষ্ট বলিতেন—Suffer little children to come unto me অর্থাৎ হে বালকগণ! তোমরা যদি আমার নিকট আসিতে চাও, তাহা হইলে সকল প্রকার দুঃখ, ক্লেশ, নির্য্যাতন প্রভৃতি অসীম সহিষ্ণুতা-সহকারে বরণ করিয়া লও। গ্রীসে, ইটালীতে, আমেরিকায়, জর্ম্মণীতে—পৃথিবীর সর্ব্বত্র যখনই কেহ কোনও নূতন ভাব নূতন আশার বাণী বুকে করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, তরুণেরাই তখন সকলের আগে তাঁহার আহ্বানে উৎসাহ-সহকারে সাড়া দিয়াছে অর্থাৎ নব ভাব প্রচারের বাহনই হইল তরুণ সমাজ।

"আমি এই বিরাট জাতীয় আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য তরুণ-সম্প্রদায়ের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম। যখন আদালত-অবমাননার অভিযোগে আমি কারারুদ্ধ হইয়াছিলাম, তখন তরুণদল কিরূপ উদ্বেলিত ও বিচলিত হইয়াছিলেন, তাহা আমি জানিতাম। আমি বুঝিলাম যে, জনমত-গঠনে তরুণগণের সাহায্য অপরিহার্য্য।

তাহারা জনমত-গঠনে সাহায্য না করিলে আমাদের চেষ্টা সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না। বহু জন-সভায় আমি তরুণ সম্প্রদায়কে উদ্দেশ করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলাম এবং তাহারা আমার সে আহ্বানে যথোচিত সাড়া দিয়াছিল। এই আন্দোলনের মূল যতটা অর্থনৈতিক ছিল, ততটা রাজনৈতিক ছিল না। বঙ্গভঙ্গের জন্য তরুণগণ যে সমধিক বিচলিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার জন্য যে রাজনৈতিক প্রচারকার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, তদপেক্ষা তাহারা স্বদেশী আন্দোলনের শক্তি-বৃদ্ধির জন্য সমধিক আত্মনিয়োগ করিয়াছিল।

"তাহাদের উৎসাহ এরূপ চরমে উঠিয়াছিল যে, তাহা আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। স্কুল বা কলেজের কোনও ছাত্রের পক্ষে বিদেশ-জাত কাপড়-চোপড় পরিয়া স্কুল বা কলেজে আসা সত্যই বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছিল। বিদেশী কাগজে তৈয়ারী খাতা ছাত্রগণ পরীক্ষার সময়ে ব্যবহার করিতে কিছুতেই সম্মত হইত না। আমার মনে পড়ে, রিপণ কলেজিয়েট স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে একটি ছাত্র বিদেশজাত কাপড়ে তৈয়ারী জামা গায়ে দিয়া স্কুলে আসিয়াছিল। যখনই অন্যান্য ছাত্রেরা ইহা জানিতে পারিল, তখনই তাহারা তাহার গায়ের জামাটি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। ছাত্রটি কোন ও রূপে প্রহারের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। এই প্রকার আরও একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। রিপণ কলেজের ছাত্রগণের পরীক্ষা-গ্রহণের সময়ে কলেজের কর্তৃপক্ষ বিদেশজাত কাগজ ছাত্রগণকে প্রশ্নের উত্তর লিখিবার জন্য প্রদান করিয়াছিলেন। ছাত্রেরা বলিল— 'আমরা বিদেশী কাগজ স্পর্শ করিব না।' ছাত্রদের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা দেখিয়া কলেজ-কর্তৃপক্ষ উহাকে উপেক্ষা করা নিরাপদ মনে করেন নাই। তখনই ভারতজাত কাগজ সরবরাহ করা হয় এবং ছাত্রগণ যথারীতি পরীক্ষা দেয়।

ছাত্রগণের এই উৎসাহ সমগ্র সমাজে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং সমাজকে নব-ভাবোদ্দীপ্ত করিয়া কর্ম্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলে। এরূপ ব্যাপার যে ঘটিবে, তাহা কেহ কল্পনায়ও অনুভব করিতে পারে নাই। ইহাকে জনসাধারণের বিরাট জাগরণ ও নবভাবের প্রেরণায়

জনসাধারণের নব-উদ্বোধন বলা যাইতে পারে। স্বদেশী আন্দোলন আমাদের অন্তঃপুরে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছিল এবং ইহা আমাদের নর-নারীগণের হৃদয়ও অধিকার করিয়াছিল। পুরুষ অপেক্ষা স্বদেশজাত দ্রব্য-ব্যবহারে নারীগণ অধিকতর আগ্রহ প্রদর্শন করিতেন। আমার এক পঞ্চমবর্ষীয়া দৌহিত্রীকে কোনও আত্মীয় এক জোড়া জুতা উপহার দিয়াছিলেন; কিন্তু উহা বিদেশজাত বলিয়া সে উহা ফেরত দিয়াছিল। দেশের আকাশ বাতাস পর্য্যন্ত স্বদেশীভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, দেশের এই বিরাট ভাব-বিবর্ত্তন একমাত্র তরুণ-সম্প্রদায় দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছিল।

স্বদেশী আন্দোলন ও সুরেন্দ্রনাথ

"আমি আমার জীবনে কখনও কোনও বিপ্লব প্রত্যক্ষ করি নাই, অথবা বিপ্লব যে কেমন তাহা কখনও কল্পনাতেও অনুভব করিতে পারি নাই। কিন্তু কেমন করিয়া জনগণের ভাব-পরিবর্ত্তন হয়, কেমন করিয়া লোকমতের গতির বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটে, কোনও বৈপ্লবিক আন্দোলনের পূর্ব্বক্ষণে জনসাধারণের উৎসাহ-উদ্যম কিরূপ সুবিপুল হইয়া থাকে, তাহার কতক আভাস আমি স্বদেশী আন্দোলন হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। সত্যই দেশে বিস্ময়জনক আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং সেই আবহাওয়ায় তরুণ ও বৃদ্ধ, ধনী ও দরিদ্র, পণ্ডিত ও মূর্খ—সকলেরই সত্তা ডুবিয়া গিয়াছিল। এই আবহাওয়ার অদৃশ্য প্রভাব সকলেরই উপর বিস্তৃত হইয়াছিল এবং তাহার ফলে সকলেরই ভাবান্তর ঘটিয়াছিল। যুক্তি-তর্ক নিষ্ক্রিয় হইয়াছিল; বিচার-বিবেচনাও বন্ধ হইয়াছিল; এক বিরাট ভাবের স্রোতে সমগ্র সমাজ ভাসিয়া চলিয়াছিল। কোনও সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার স্বদেশী আন্দোলন যখন পূরা দমে চলিতেছিল সেই সময়ে আমাকে বলিয়াছিলেন—আমার এক বালিকা রোগী বিকারের ঝোঁকে এই বলিয়া চীৎকার করিত যে, সে বিদেশী ঔষধ খাইবে না।

"সকলেই এই ভাবে উদ্বোধিত ও উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। ইহা

কিরূপে ঘটিল ? কেবল বাহিরের অবস্থা দেখিয়া ইহার সম্যক্ কারণ নির্দ্দেশ করা চলে না। কিন্তু যদি কোনও রহস্য ইহার ভিতরে থাকে, তাহা হইলে অনিসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে তাহা তিষ্ঠিতে পারিবে না। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ বন্ধ করিবার জন্য যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, স্বদেশী আন্দোলন যে উহারই ফলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। বঙ্গদেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য যে জাতীয় জাগরণ আরম্ভ হইয়াছিল, স্বদেশী আন্দোলন তাহারই ফল। মানুষের মন ভিন্ন ভিন্ন রুদ্ধদ্বার প্রকোষ্ঠে বিভক্ত নহে ; ইহা সজীব অখণ্ড ইন্দ্রিয়বিশেষ। যখন ইহার এক অংশে কোন ভাবের আবেগ অনুভূত হয়, তখন সমগ্র ইন্দ্রিয় সেই আবেগে চঞ্চল হইয়া উঠে এবং মানবের কর্ম্মক্ষেত্রের সকল বিভাগেই ইহার শক্তি প্রত্যক্ষীভূত হয়। বিগত শতাব্দীর শেষভাগে কংগ্রেস রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল, সেই সময়ে, এমন কি, এখনও একদল লোক বলিয়া থাকেন যে, কংগ্রেস যদি রাজনৈতিক সংস্কার-সাধনের চেষ্টা না করিয়া প্রথমে সমাজ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইত, তাহা হইলে অধিকতর সুফল লাভ করা যাইত। সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর লেখকগণ ভারতবাসীর প্রতি সুহৃদ্‌ভাবাপন্ন নহেন। ইঁহাদের অভিমত এই—রাজনৈতিক সংস্কারের চেষ্টা পরে করিলে ফল আরও ভাল হইত। প্রথমে আমাদের সমাজের সংস্কার সাধন করিয়া, উহাকে সমুন্নত করিয়া তুলিয়া পরে রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের পক্ষে উচিত ছিল ! কিন্তু আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ধারা ইঁহাদের এই ধারণা যে মিথ্যা তাহা প্রমাণিত করিয়া দিয়াছে। আমাদের নেতৃবর্গের রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে যে বিরাট জাতীয় জাগরণের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহারই পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া আমাদের সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং শিল্পসম্পর্কিত উন্নতি সংঘটিত হইয়াছে। সকল প্রকার উন্নতিই পরস্পর সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ ; একে অন্যের সাপেক্ষ। একটি উন্নতির প্রভাবে অপর একটি উন্নতি সম্ভবপর হয়। একটির ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়া অপর সকলের উপর গিয়া পড়ে :

পরস্পরের প্রভাবে পরস্পর শক্তি সঞ্চয় করিয়া থাকে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কর্ম্মশক্তি কেশবচন্দ্র সেনকে সমাজ-সংস্কারে সহায়তা করিয়াছিল এবং তাঁহার সংস্কারের প্রেরণাকে সমুদার ও শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল। কেশবচন্দ্রের কর্ম্মশক্তি আবার কৃষ্ণদাস পাল ও অপরাপর ব্যক্তির কর্ম্মের সহায়ক হইয়াছিল। ইহাদের পর যে রাজনৈতিক নেতৃবর্গ আসিলেন, তাঁহারা নূতন রাজনৈতিক ভাবধারা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

"তাঁহারা প্রতীচ্যের রাজনৈতিক ভাবধারা ও কর্ম্মধারার সহিত প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হইয়া আসিয়াছিলেন; তাঁহারা প্রতীচ্য রাজনৈতিক প্রভাবে অভিভূত ছিলেন। তাঁহারা রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরাতন পথ পরিত্যাগ করিয়া নূতন পথে অভিযান করিলেন এবং তাঁহাদের কর্ম্মের পরিধি মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের— এমন কি, অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে পর্য্যন্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন। তাঁহাদের নূতন আদর্শ ও নূতন কর্ম্মপদ্ধতি জনমণ্ডলীকে অভিভূত করিল এবং লোকের মনে তাঁহারা এমন এক ভাবের সঞ্চার করিলেন যে, তাহার ফলে নবজাগরিত জাতীয় জীবন বিবিধ কর্ম্মক্ষেত্রে আপনাকে নিয়োজিত করিল।"

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে শিক্ষিত বাঙ্গালী যে আন্দোলনের তুমুল তরঙ্গ তুলিয়াছিল, সুরেন্দ্রনাথই হইয়াছিলেন তাহার অবিসংবাদিত নেতা। এই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গেই দেশে বিলাতী-পণ্য-বর্জ্জনের আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই বিলাতী-পণ্য-বর্জ্জনের আন্দোলনই স্বদেশী আন্দোলনের জনয়িতা। বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন যে রাজনৈতিক ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই রাজনৈতিক আন্দোলনের অঙ্গস্বরূপ যে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইল, তাহার মূলে ছিল বাঙ্গালার ধ্বংসোন্মুখ শিল্পকে পুনঃ-সঞ্জীবিত করিবার চেষ্টা। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বাঙ্গালার জনসাধারণ সঙ্কল্প করিল

যে, স্বদেশজাত দ্রব্য ব্যতীত তাহারা বিদেশজাত দ্রব্য ব্যবহার করিবে না। সেইজন্য স্বদেশী আন্দোলনকে কেহ কেহ স্বদেশী শিল্প-সংরক্ষণের আন্দোলন (Protectionist movement) আখ্যাও দিয়াছিলেন। সে সময়ে ব্যবস্থাপক সভায় আইন প্রণয়নের কর্ত্তৃত্ব যদি দেশবাসীর হস্তে থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা স্বদেশীশিল্পের সংরক্ষণ-মূলক আইন প্রবর্ত্তিত করিতেন; কিন্তু সে অধিকার ও ক্ষমতা দেশবাসীর ছিল না বলিয়া তাঁহারা কেবল স্বদেশী দ্রব্য-ব্যবহারের প্রতিজ্ঞাতেই আপনাদিগকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন এবং সেই প্রতিজ্ঞা সাধ্যমত পালন করিয়াছিলেন। বিদেশী অপেক্ষা অধিক মূল্য দিয়া লোকে স্বদেশী দ্রব্য ক্রয় করিত; তথাপি বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করিত না। বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ জাতি। সেইজন্য তাহারা এই আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ আহার-নিদ্রা ভুলিয়া এই আন্দোলন পরিচালনা করিয়াছিলেন। বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার জন্য তিনি দেহ-মন প্রাণ সকলই সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাগ্মিতার বন্যায় দেশ ভাসিয়া গিয়াছিল। সেই সময়ে তাঁহার পতাকা-মূলে সকল শিক্ষিত বাঙ্গালী সমবেত হইয়াছিলেন। ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল নেতাই সে সময়ে সুরেন্দ্রনাথর নেতৃত্বে এই আন্দোলন-পরিচালনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

ক্রমে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস পাইল; কিন্তু স্বদেশী আন্দোলন প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিতে লাগিল। স্বদেশী দ্রব্য ভিন্ন লোকে বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিতে চাহিত না। বিবাহের তত্ত্বে বিদেশী দ্রব্য দিলে তাহা গৃহীত হইত না, দেবতার পূজোপকরণে বিদেশী কোনও সামগ্রী থাকিলে পুরোহিত সেই পূজা করিতে চাহিতেন না। বিলাতী লবণ ও বিলাতী চিনি লোকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিল। কোনও মিষ্টান্নের দোকানে যদি বিলাতী চিনিতে মিষ্টান্ন তৈয়ারী হইত, তাহা হইলে সেই দোকানের মিষ্টান্ন লোকে খাইত না। বিলাতী চিনি দ্বারা প্রস্তুত মিষ্টান্ন দেখিতে পরিষ্কার এবং খুব সাদা হইত। স্বদেশী চিনিতে প্রস্তুত মিষ্টান্ন দেখিতে ময়লা ও অপরিষ্কার হইত। তথাপি লোকে দেশীয় চিনি হইতে প্রস্তুত মিষ্টান্নই খাইত। লোকে

লিভারপুলের বিলাতী লবণ ত্যাগ করিয়া সৈন্ধব ও করকচ লবণ ব্যবহার করিত। বিলাতী কাপড়, বিলাতী গেঞ্জী, বিলাতী, মোজা বিলাতী এসেন্স, বিলাতী সাবান, বিলাতী কেশ তৈল, বিলাতী তোয়ালে, বিলাতী জুতা প্রভৃতি লোকে ব্যবহার করিত না। এইজন্য এদেশে এইসকল দ্রব্য তৈয়ারী হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ইহা স্বদেশী আন্দোলনের মুখ্য ফল। বিলাতী ধুতি বা শাড়ী দামে সস্তা ছিল, তবু লোকে তাহা কিনিত না। যদি কেহ সস্তা বলিয়া বিলাতী ধুতি বা শাড়ী ক্রয় করিতে চাহিত, তাহা হইলে রাত্রির অন্ধকারে অত্যন্ত গোপনে তাহাকে তাহা করিতে হইত। কারণ, যদি কেহ ইহা দেখিতে পাইত, তাহা হইলে সমাজে তাহার নিন্দা ও লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না। বিলাতী পরিচ্ছদ কোন ও ইউরোপীয় দোকান হইতে ক্রয় করিয়া কোনও প্রসিদ্ধ দেশীয় অধ্যাপকের পত্নী শকটারোহণে গৃহাভিমুখে গমন করিতেছিলেন। ছাত্রেরা ইহা দেখিয়া তাঁহার শকটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল—"হয় আপনি পরিচ্ছদগুলি ফেরত দিয়া আসুন, না হয় আমরা এই শুইয়া পড়িলাম, আমাদের বুকের উপর দিয়া গাড়ী চালাইয়া যাউন। আপনি আমাদের মা, মাকে আমরা বিলাতী পোষাক পরিতে দিব না।" অধ্যাপক-পত্নী বলিলেন, "আমি পছন্দ করিয়া জিনিসগুলি কিনিয়া আনিয়াছি, ফেরত দেওয়া সঙ্গত কার্য্য হইবে না। আমি এগুলি তোমাদের হাতে দিলাম, তোমাদের যাহা ইচ্ছা কর। অতঃপর দেশী জিনিসই ব্যবহার করিব।" ছাত্রেরা তখনই গুরুপত্নীর পদধূলি লইয়া আনন্দধ্বনি করিতে করিতে সেই বিলাতী পরিচ্ছদগুলি অগ্নিসাৎ করিয়া ফেলিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে বিলাতী কাপড়ের উপর লোকের কিরূপ বিরাগ জন্মিয়াছিল তাহা ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপকতা

স্বদেশী আন্দোলনকে বহু ইউরোপীয় লেখক ও রাজপুরুষ কপট বলিয়া অভিহিত করিতেন। এমন কি, এ দেশের প্রত্যেক গণ-

আন্দোলনকেই তাঁহারা ফক্কিকারী আখ্যা দিতেন। তাঁহারা বলিতেন —এইসকল আন্দোলনের সহিত দেশের জনসাধারণের নাড়ীর যোগ নাই। কিন্তু কোনও গণ-আন্দোলনেই সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরা হাতে কলমে যোগ দেয় না; তবে যদি তাহাদের স্বার্থ ইহাতে বিজড়িত থাকে, তবেই তাহারা উহাতে মুখ্যভাবে যোগ দেয়, নহিলে গৌণতঃ উহার সমর্থন করে। সকল বিরাট আন্দোলনই দেশের শিক্ষিত জনসাধারণ কর্ত্তৃক পরিকল্পিত, প্রবর্ত্তিত ও পরিচালিত হইয়া থাকে; জনসাধারণ উহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে এবং উহার পরিচালনায় গৌণভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। স্বদেশী আন্দোলনে দেশের জনসাধারণ ও সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরা দেখিয়াছিল যে, তাহাদের আর্থিক লাভের ব্যবস্থা উহা হইতে হইয়াছে। তাহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, যদি এই আন্দোলন সফল হয়, তাহা হইলে তাহাদের অর্থাগমের—দারিদ্র্য-দূরীকরণের একটি নূতন পথ উন্মুক্ত হইবে। তাই স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব সমাজের সর্ব্বস্তরে প্রবিষ্ট ও অনুভূত হইয়াছিল।

সুরেন্দ্রনাথের আদর্শ-ত্রয়

সুরেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন:—"প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন দেশসেবার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই, তখন তিনটী আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আমি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। এই তিনটী আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উৎসাহ-উদ্দীপনার বা প্রেরণার অভাব আমার কখনও হয় নাই। আমার রাজনৈতিক জীবনে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সেইসকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে যখনই আমি সুযোগ পাইয়াছি, আমি আমার এই তিনটী আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। সেই তিনটী আদর্শ এই—(১) যে রাজনৈতিক স্বার্থ ভারতের সকল সম্প্রদায়ের পক্ষে সমান ও সাধারণ সেই রাজনৈতিক স্বার্থলাভের জন্য যাহাতে ভারতের সকল সম্প্রদায় একই বেদীর উপরই সম্মিলিতভাবে দাঁড়াইতে পারেন—এইজন্য সকল

সম্প্রদায়ের ভারতবাসীকে ঐক্য-সূত্রে আবদ্ধ করা; (২) ভারতের উন্নতির প্রথম অপরিহার্য্য উপায় বা পন্থা—হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সখ্যতা ও ভ্রাতৃভাবের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ সম্প্রীতি-স্থাপন এবং (৩) জনগণের উন্নয়ন এবং গণ-আন্দোলনে তাহাদের সাহচর্য্য-গ্রহণ। প্রথম দুইটি আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আমি ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়াছিলাম। সেই সময়ে বহুসংখ্যক জনসভায় আমি ভারতের সকল প্রদেশের অধিবাসিগণকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে এবং ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়াছিলাম। কেবল তাহাই নহে, সকল ভারতবাসীর যাহা প্রধান অভাব ছিল সেই অভাব দূর করিবার জন্য একই সাধারণ বেদীর উপর দাঁড়াইয়া যাহাতে ভারতের সকল প্রদেশের অধিবাসীরা তাঁহাদের মত প্রকাশ করিতে পারেন এবং সম্মিলিতভাবে আন্দোলন পরিচালনা করিতে পারেন সে জন্য চেষ্টা করিতে আমি সকলকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। স্বদেশী আন্দোলনে আমি দেখিলাম যে, আমার জীবনের একটি আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার প্রভূত সুযোগ পাওয়া গিয়াছে; কাজেই আমি সেই সুযোগ গ্রহণ করিতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করি নাই।

"দেশের সর্ব্বত্র স্বদেশী সভার অধিবেশন হইয়াছিল; এমন কি, বাঙ্গালা দেশের বাহিরে পর্য্যন্তও স্বদেশী সভা হইয়াছিল। আমার স্বাস্থ্যে ও সামর্থ্যে যতদূর কুলাইত. আমি যত অধিকসংখ্যক স্থানে যত অধিকসংখ্যক সভায় যোগ দিতে পারিতাম তাহা করিতাম। সে সময়টি ছিল বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার ও অশ্রান্ত কর্ম্মের সময়। সকলেই সে সময়ে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। যাঁহার সামর্থ্যে যতদূর কুলাইয়াছিল তিনি ততদূর করিয়াছিলেন। বহু অপরিচিত—অজ্ঞাত—দুর্গম স্থানে আমরা গিয়াছিলাম; অপরিচিত খাদ্য খাইয়াছিলাম। কিন্তু সে সকলে আমার ভ্রূক্ষেপ করি নাই এবং সে সকলের জন্য কোনও অভিযোগ আমরা করি নাই। দূরবর্ত্তী স্থানসমূহে যাইবার অন্য আমাদিগকে বহু ক্লেশ ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইত, আমরা সে সকল দুঃখ-কষ্ট ও অসুবিধা অকাতরে সহ্য করিতাম। ম্যালেরিয়া ও ওলাউঠায় আক্রান্ত

হইবার সম্ভাবনাকে পর্য্যন্ত আমরা অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম। অদম্য উৎসাহ-উদ্দীপনাই ছিল আমাদের রক্ষা-কবচ। কোনও বিপদে আমরা পড়িব না, কোনও রোগে আমরা আক্রান্ত হইব না—অন্তরের অন্তরে এই দৃঢ়বিশ্বাস লইয়া কার্য্য করিতাম বলিয়া আমরা বিপদেও পড়ি নাই, রোগেও আক্রান্ত হই নাই; ইহাকে অব্যর্থ নৈতিক টীকা (moral inoculation) বলা যাইতে পারা যায়।

পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

"এই প্রসঙ্গে আমার একজন সহকর্ম্মী ও অন্তরঙ্গ সঙ্গীর নাম উল্লেখ না করিয়া আমি থাকিতে পারিতেছি না। আমি অধিকতর তৎপরতার সহিত তাঁহার নাম উল্লেখ করিতেছি—কারণ বহুদিন হইল, আমরা তাঁহাকে হারাইয়াছি। তাঁহার নাম পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ। তিনি "হিতবাদী" পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; তিনি মূত্রাশয়-ঘটিত রোগ (Bright's disease) ভোগ করিতেছিলেন। তথাপি যে কোনও স্বদেশী সভায় তিনি নিমন্ত্রিত হইতেন, সেই সভাতেই ভগ্ন স্বাস্থ্য সত্ত্বেও তিনি যোগদান করিতেন। তিনি স্বদেশী সভা-সমূহে একটি নূতন প্রথার প্রবর্ত্তন করেন। সেই প্রথা এক্ষণে অধিকাংশ জন-সভায় অবলম্বিত হইতেছে। প্রথাটি হইতেছে এই—সভারম্ভে একটি সময়োপযোগী দেশাত্মবোধ-মূলক গান করা। কাব্যবিশারদের সুন্দর গান রচনা করিবার শক্তি ছিল। তিনি স্বয়ং গান গাহিতে পারিতেন না বটে, কিন্তু তিনি প্রতিভাশালী সঙ্গীত-রচয়িতা ছিলেন। তাঁহার রচিত এইসকল গান স্বদেশী সভায় গীত হইত এবং সেগুলি লোকের মনে রেখাপাত করিত। সঙ্গীত রচনায় তাঁহার স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল। হিন্দী ভাষায় তাঁহার পূর্ণ অধিকার না থাকিলেও "দেশকা এ কেয়া হাল" নামক তৎরচিত হিন্দী গানটি যেমন ভাবোদ্দীপক, তেমনই সুন্দর। এই গান শুনিয়া লোকের মনে বিদেশজাত দ্রব্য বর্জ্জনের তীব্র সঙ্কল্পের উদয় হইত এবং স্বদেশজাত দ্রব্য ব্যবহারের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগিত। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেসে যখন

এই গানটী গীত হইয়াছিল তখন আমাদের সহস্র সহস্র দেশবাসী ইহা শ্রবণ করিয়া প্রবল ভাবোচ্ছ্বাসে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

"কাব্যবিশারদ যখন কোনও স্বদেশী সভায় যাইতেন তখন তাঁহার সহিত দুইজন সুদক্ষ গায়ক থাকিতেন। তাঁহাদের একজন সভারম্ভের পূর্ব্বে একটি উদ্বোধন-সঙ্গীত করিতেন এবং অপর জন সভা শেষ হইবার পূর্ব্বে একটী গান গাহিতেন। এই দুই জন গায়কের জন্য তিনি নব নব গান রচনা করিতেন। তাঁহার গায়কদ্বয় সেই সকল নূতন গানের মহলা দিতেন। গায়কদ্বয়কে তিনি ভরণপোষণ করিতেন। কাব্যবিশারদ ধনী ছিলেন না; তথাপি তিনি এই দুইজন গায়কের ভরণপোষণের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইত তাহা তিনি নিজেই দিতেন, বাহির হইতে এক কপর্দ্দক সাহায্য গ্রহণ করিতেন না। বাগ্মিতাশক্তি তাঁহার তেমন বিশেষ ছিল না; কিন্তু তিনি সুলেখক ছিলেন। ওজস্বিনী ও তেজোময়ী ভাষায় তিনি ভারতবাসীর উন্নতি ও স্বার্থের পরিপন্থীগণকে আক্রমণ করিতেন। সে ভাষা ছিল শত্রুর পক্ষে যেমন তীব্র তেমনই মর্ম্মভেদী। তিনি একনিষ্ঠ স্বদেশভক্ত ছিলেন; দেশমাতৃকার সেবায় তাঁহার বিরাম-বিশ্রাম ছিল না। আমার মনে আছে, ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে যোগদান করেন, তখন তিনি জ্বর ভোগ করিতেছিলেন এবং এক মানহানির মামলা-ঘটিত গ্রেপ্তারী পরওয়ানা তাঁহার বিরুদ্ধে জারি করা হইয়াছিল, সেখানা একরূপ তাঁহার মাথার উপরই ঝুলিতেছিল। স্বাস্থ্যকে তিনি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেন না; জীবনটাকে মোটেই তোয়াক্কা করিতেন না। তিনি কাহারও প্রতিবাদ শুনিতেন না; কাহারও পরামর্শ মানিতেন না; তাঁহার মনের শক্তি ছিল যেরূপ অধিক, একরোকাও ছিলেন তিনি তেমনই অদ্ভুত রকমের। কিন্তু তিনি দ্রুতগতিতে মরণের পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। যাঁহারা কাব্যবিশারদকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন তাঁহারা মনে করিলেন যে, তাঁহার বড় সাধের এ স্বদেশী আন্দোলনের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে তাঁহাকে দূরে সরাইতে দিতে পারিলে তাঁহার স্বাস্থ্যরক্ষার সুব্যবস্থা হয়। স্বদেশী আন্দোলনে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়াও তিনি যেরূপ নিষ্ঠা ও অনুরাগের সহিত দেশসেবা

করিতেছিলেন তাহাতে এরূপ গুরু পরিশ্রম তিনি অধিক দিন সহ্য করিতে পারিতেন না। সেই জন্য বন্ধু-বান্ধব সকলেই তাঁহাকে অন্যত্র সরাইয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। একজন ডাক্তার বন্ধু একখানি যাত্রী জাহাজের ডাক্তার হইয়া জাপানে যাইতেছিলেন। কাব্যবিশারদের আত্মীয়-স্বজনগণ তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন—"আপনি ইহার সহিত জাপান যাত্রা করুন; বিশ্রামে সমুদ্রবায়ুতে আপনার স্বাস্থ্যের প্রভূত উপকার হইবে।" কেন বলিতে পারি না, এই পরামর্শ আমার ভাল লাগিল না। ভাবী অশুভ আশঙ্কার ছায়া আমার চিত্তপটে নিপতিত হইল। সম্ভবতঃ আমার অন্তরের অন্তস্তলে তখন তাঁহার অভাবে স্বদেশী আন্দোলনের কার্য্য ক্ষুণ্ণ হইবে,—এরূপ ধারণা হইয়াছিল এবং তাহাতেই হয়ত আমার বিচার-বুদ্ধিতে পক্ষপাত স্পর্শ করিয়াছিল। সে যাহা হউক, আমি কাব্যবিশারদকে আত্মীয়-বর্গের পরামর্শ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে তাঁহার রাজনীতিক গুরু বলিয়া অভিহিত করিতেন; এইরূপ অন্যান্য অনেকেই করিতেন। কিন্তু কাব্যবিশারদের যেরূপ আমার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল তাঁহাদের তাহা ছিল না; তাঁহারা গুরুনিন্দা করিবার জন্য অর্থাৎ গুরুকে গালি দিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। তিনি এক-বার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, তিনি সমুদ্র-যাত্রা করিবেন না; কিন্তু শেষে সকলের অনুরোধে ও নির্ব্বন্ধাতিশয্যে ইহাতে সম্মত হইলেন। আমরা উভয়ে বেঙ্গল নাগপুর রেলপথে, কলিকাতা হইতে কয়েক মাইল দূরে, মৃগকল্যাণ নামক স্থানে একটি স্বদেশী সভায় যোগদান করিতে গিয়া-ছিলাম। ট্রেণ হাওড়া ষ্টেশনে উপনীত হইলে তিনি আমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আমার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। আমি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলাম। হায়! আর আমাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইল না; কারণ, স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের পথে—সমুদ্র-বক্ষেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

"তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালা সংবাদপত্রের একজন যোগ্যতম ও স্বদেশ-ভক্ত সম্পাদককে দেশ হারাইল। ভাষার উপর তাঁহার এরূপ

অধিকার ও প্রভাব ছিল এবং তাহার লেখনী এরূপ শক্তিশালিনী ছিল যে, তাঁহাকে যে কেবল তাঁহার শত্রুগণই ভয় করিত তাহা নহে দেশের যাহারা শত্রু তাহারাও তাঁহার ভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিত। ব্যক্তিগত নিন্দা-কুৎসা তিনি খুবই করিতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এখনও ব্যক্তিগত নিন্দা-কুৎসার বিষময় প্রভাব হইতে বাঙ্গালা সংবাদপত্রসমূহ মুক্তিলাভ করে নাই। পারিবারিক গণ্ডীও তাঁহার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইত না। তাঁহার এই নীতির নিন্দা আমরা না করিয়া পারি না। কিন্তু ভারতবাসীর উন্নতি যাহাদের চক্ষুশূল ছিল তাহাদের উপরই তাঁহার আক্রমণ ভীষণতম ও তীব্রতম হইত। বিশেষতঃ যাহারা বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীর ছদ্মবেশে দেশের অনিষ্ট করিত, তাহাদিগকে তিনি সুতীক্ষ্ণ ভাষার শায়কে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিতেন। ১৯০৭ সালের ৭ই জুলাই তারিখে তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছে। ইহারই দুই সপ্তাহ পরে বারাসতে চব্বিশ পরগণা জেলা-সম্মিলনীর বৈঠক বসে। যখন স্বদেশী সঙ্গীত গান করিয়া সভার উদ্বোধন-কার্য্য আরম্ভ হয়, সেই সময়ে সভা-মণ্ডপে সমবেত অধিকাংশ ব্যক্তিই তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার দোষ-ত্রুটি অনেক ছিল কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি একান্ত নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের সহিত এবং অকুতোভয়ে দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

"কাব্যবিশাদের মত একজন প্রসিদ্ধ স্বদেশী কর্ম্মীর মৃত্যু হইল বটে, কন্তু সে জন্য স্বদেশী আন্দোলন ও দেশসেবা-কার্য্য অক্ষুণ্ণভাবেই চলিতে লাগিল। সকল বিরাট আন্দোলনই বহু ব্যক্তির প্রতিভা ও নেতৃত্বের নিকট ঋণী থাকে বটে, কিন্তু বিশিষ্ট জননায়কগণের অবিদ্যমানেও সে সকল আন্দোলন আপনা-আপনি চলিতে থাকে। ইঁহারা বীজ বপন করেন; তাহার ফলে এমন এক দল লোকের উদ্ভব হইয়া থাকে—যাঁহারা বিদ্যা-বুদ্ধি ও শক্তিতে উঁহাদের অপেক্ষা হীন হইলেও উঁহাদের কার্য্যভার গ্রহণ ও বহন করিতে সমর্থ হন। দেশের সর্ব্বত্র যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছিল, কাব্যবিশারদের উৎসাহ তাহারই প্রতিবিম্বমাত্র।"

গবর্মেণ্টের উদ্বেগ ও আশঙ্কা

জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছে দেখিয়া গবর্মেণ্ট শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহারা তাঁহাদের সুপরিচিত দমন-নীতি অবলম্বন করিলেন, কিন্তু তাহাতে লোকের উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। গবর্মেণ্টের হস্তে বিপুল ক্ষমতা ন্যস্ত রহিয়াছে। কাজেই সহজেই তাঁহারা ক্ষমতার প্রয়োগ দ্বারা শীঘ্র উত্তেজনা দমন করিতে প্রলুব্ধ হইয়া থাকেন। কিন্তু দেশে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল তাহা একেবারেই অপ্রত্যাশিত; এরূপ অবস্থা পূর্ব্বে কখনও হয় নাই।

কঠোর-শাসন- ব্যবস্থার প্রয়োগ গবর্মেণ্টের হাতের মধ্যেই রহিয়াছে। গবর্মেণ্ট মনে করিলেন,—কঠোর শাসন-নীতির প্রবর্ত্তন করিলেই শীঘ্র সুফল পাওয়া যাইবে। শীঘ্র প্রতিকার-লাভের আগ্রহে গবর্মেণ্ট দমন-নীতিই অবলম্বন করিলেন। কিন্তু এজন্য গবর্মেণ্টকে যে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতে হইবে এবং দূর ভবিষ্যতে ইহার পরিণাম যে বিষময় হইয়া পড়িবে, গবর্মেণ্ট ক্ষমতার মোহে পড়িয়া তাহা লক্ষ্য করিতে পারিলেন না; সম্ভবতঃ দমন-নীতি-প্রয়োগের ফলে কিছুদিনের জন্য গবর্মেণ্টের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি ঘটিয়াছিল; কিন্তু ইহার ফলে যে অনিষ্ট ঘটিল তাহা স্থায়ী হইয়া পড়িল এবং এইজন্যই ভবিষ্যৎ অশান্তির বীজ উপ্ত হইল।

ছাত্র ও তরুণদল এবং স্বদেশী আন্দোলন

সুরেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন ঃ—"দেশের ছাত্রগণ এবং তরুণ সম্প্রদায় যে স্বদেশী আন্দোলনে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাহাদের জ্বলন্ত উৎসাহ সমাজের সকল স্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। উহারা নিজেরাই নিজদিগকে স্বদেশী-প্রচারের কার্য্য করিতে নিযুক্ত করিয়াছিল। সরকার উহাদের কর্ম্ম-স্রোতে বাধা দেওয়া প্রয়োজন বলিয়া মনে করিলেন। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটগণ প্রত্যেক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের উপর এই মর্ম্মে এক ইস্তাহার জারি করিলেন যে, যদি স্কুল ও কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ এবং

শিক্ষকগণ তাঁহাদের ছাত্রগণকে স্বদেশী আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট বয়কট বা বিদেশী-বর্জ্জন, পিকেটীং বা দ্রব্য ক্রয় করিতে লোককে বাধাদান এবং অন্যান্য উপদ্রব হইতে প্রতিনিবৃত্ত না করেন, তাহা হইলে স্কুল ও কলেজে সরকারী সাহায্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে, স্কুল-কলেজের ছাত্রদের বৃত্তিলাভের জন্য প্রতিযোগিতা করিবার যে অধিকার আছে তাহা কাড়িয়া লওয়া হইবে এবং উহাদিগের নাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা হইতে কাটিয়া দিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করা হইবে। মফঃস্বলের স্কুলসমূহে এই ইস্তাহারখানি প্রেরণ করা হইয়াছিল। এই ইস্তাহারে কলিকাতার ছাত্রগণ তাহাদের মফঃস্বলের ভ্রাতৃবৃন্দের মতই স্বদেশী আন্দোলনে সমান উৎসাহশীল ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের প্রবলতর উত্তেজনার সময়ে একদল ছাত্র প্রত্যহ গড়ের মাঠের কোণে দাঁড়াইয়া থাকিত এবং সেখান হইতে দেখিত, কোনও ভারতবাসী হোয়াইটএওয়ে লেডল কোম্পানীর দোকানে বিলাতী দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য প্রবেশ করিতেছে কি না। কোনও ভারতবাসীকে এই দোকানে প্রবেশ করিতে দেখিলে তাহারা অতি বিনীতভাবে তাঁহাকে বলিত,—'আপনি বিদেশজাত পণ্য ক্রয় করিবেন না, যদি কেহ ঐ কোম্পানীর দোকান হইতে বিদেশী সামগ্রী ক্রয় করিয়া ফেলিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বিনীতভাবে বলিত—যাহা হইবার হইয়াছে, অতঃপর আর যেন বিদেশী জিনিস ক্রয় না করেন।' আমি শুনিয়াছিলাম, একবার কোনও এক সৌখীন বাঙ্গালী মহিলার পদতলে এই ছাত্রদলেরই কয়েকজন নিপতিত হইয়াছিল। তিনি তখন জিনিসপত্র কিনিয়া হোয়াইটএওয়ে লেডল কোম্পানীর দোকান হইতে বাহির হইতেছিলেন। তাঁহাকে উহারা বলে,—'যখন স্বদেশী দ্রব্য পাওয়া যাইতেছে, তখন আপনি প্রতিজ্ঞা করুন—আর বিদেশজাত দ্রব্য ক্রয় করিবেন না'।

"এই ইস্তাহার-জারির ফলে উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পাইল। যে সকল সংবাদপত্র সাধারণতঃ গবর্মেণ্টের কার্য্য ও নীতির সমর্থন করিয়া থাকেন তাঁহারা পর্য্যন্ত এই ইস্তাহারের নিন্দা করিলেন। কেহই এই ইস্তাহারের

প্রশংসা করেন নাই। এমন কি, 'ষ্টেটসম্যান' পত্রও তীব্র ভাষায় এই সম্বন্ধে এই মর্ম্মে মন্তব্য প্রকাশ করেন—'আমরা জানিতে চাই, যে অল্পবুদ্ধি রাজপুরুষের পরামর্শে ছোটলাট বাহাদুর এই ইস্তাহারের অনুমোদন করিয়াছেন তাঁহার নাম কি? গবর্মেণ্ট নিঃসন্দেহ এমন এক ব্যক্তি কর্তৃক ভ্রান্তপথে পরিচালিত হইয়াছেন যিনি হয় বর্ত্তমান অবস্থা-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, না হয় তিনি গত কয়েক সপ্তাহের আজগুবী ব্যাপার দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের মনে হয়, গবর্মেণ্ট ভুল করিয়া এমন এক বালকোচিত ও ব্যর্থ নীতি অবলম্বন করিয়াছেন যাহার ফলে দেশে একদল সুলভে সুনাম ও প্রতিষ্ঠালাভেচ্ছু কপট আত্মোৎসর্গকারী ব্যক্তির উদ্ভব হইবে।' ছাত্র-দমন-উদ্দেশ্যে প্রচারিত এই প্রথম ইস্তাহারটী সম্বন্ধে "ষ্টেটসম্যান" পত্র এইরূপ কঠোর ভাষায় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

"কিন্তু 'ষ্টেটসম্যানে'র এইরূপ মন্তব্যেও আমলাতন্ত্র সরকার বিচলিত হইলেন না, তাঁহারা ইস্তাহারের উপর ইস্তাহার জারি করিতে লাগিলেন। তাহার ফল এই হইল যে, গবর্মেণ্ট ছাত্রগণের যে উৎসাহ-উদ্যম দমন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন সেই উৎসাহ-উদ্যম ও উত্তেজনা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। গবর্মেণ্টের প্রতিকার-চেষ্টা নিষ্ফল হইতে আরম্ভ হইল।

'বন্দে মাতরম' ইস্তাহার

"এইসকল ইস্তাহারের মধ্যে 'বন্দে মাতরম্'-সম্পর্কিত ইস্তাহার ছিল অন্যতম। এই ইস্তাহারখানি জারি করিয়াছিলেন নব-প্রতিষ্ঠিত পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্মেণ্ট। এই ইস্তাহারে পূর্ব্ববঙ্গ সরকার ঘোষণা করেন যে, রাজপথে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিলে অর্থাৎ 'বন্দে মাতরম্' বলিয়া চীৎকার করিলে তাহা অবৈধ বা বে-আইনী হইবে। শুনিতে পাওয়া যায়, জনৈক উচ্চপদস্থ ইউরোপীয় রাজপুরুষের আমাদের দেশের পুরুষপরম্পরায় প্রচলিত পৌরাণিক আখ্যানাদিতে বিশিষ্ট অধিকার ছিল। তাঁহার এই বিদ্যা ও জ্ঞানের দৌড় এত অধিক ছিল যে, তিনি

এই বলিয়া 'বন্দে মাতরমে'র বাখ্যা করিয়াছিলেন—ইহা আর কিছু নহে, 'প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য দেবী কালিকার আহ্বান। কোথা হইতে তাঁহার মনে এই ধারণা বা ভাবের উদ্ভব হইয়াছিল তাহা বুঝিয়া উঠা অত্যন্ত কঠিন। সকলেই জানেন,—'বন্দে মাতরম্' একটি প্রসিদ্ধ সঙ্গীতের প্রারম্ভমূলক দুইটী শব্দ। ইহাতে স্বদেশের সৌন্দর্য্য ও শক্তির প্রশংসা করিয়া স্বদেশের প্রতি সুগভীর প্রেম ও ভক্তি নিবেদন করা হইয়াছে। কিন্তু সরকারী গণ্ডীর মধ্যে অর্থাৎ রাজপুরুষদিগের ভিতরে যেরূপ উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে এরূপ অকপট সঙ্গীতেও দুরভিসন্ধিমূলক অর্থের আরোপ করা হইল। যিনি আমাদের সকলের মাতা—সেই দেশমাতৃকাকে, সেই দেশজননীকে আমি বন্দনা করিতেছি; ইহাই হইল 'বন্দে মাতরমে'র সরল অর্থ। কিন্তু সরকারের এক শ্রেণীর আমলারা ইহার অন্যরূপ অর্থ গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের নূতন গবর্মেণ্ট তখনই রাজপথে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করা নিষিদ্ধ বলিয়া ইস্তাহার প্রচার করিলেন। আমরা ব্যবহারাজীবগণের অভিমত গ্রহণ করিলাম। অন্যান্য ব্যবহারাজীবের সহিত কলিকাতার তদানীন্তন প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিষ্টার পিউ যে অভিমত প্রকাশ করিলেন তাহা আমাদেরই অনুকূল হইল। তাঁহাদের মতে নির্দ্ধারিত হইল যে, এই ইস্তাহার অবৈধ।

"বন্দে মাতরম্" বঙ্কিমচন্দ্রের সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস 'আনন্দমঠে'র একটি গান। গানটী বাঙ্গালা; কিন্তু ইহাতে এত অধিক সংস্কৃত শব্দ আছে যে, ভারতের সকল প্রদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণই ইহার অর্থ বুঝিতে পারেন। ইহার শব্দবিন্যাসমাধুরী, ইহার ছন্দের সৌন্দর্য্য, ইহার অন্তর্নিহিত স্বদেশপ্রেম, ইহার ভাবের মহনীয়তা, ইহার ভাষার কমনীয়তা ইহাকে জাতীয় সঙ্গীতের পর্য্যায়ে উন্নীত করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত এখন আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। যখনই জাতীয় কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণের জন্য কোনও সভার অধিবেশন হয়, তখনই সেই সভার উদ্বোধন-রূপে এই জাতীয় সঙ্গীতটি গীত হইয়া থাকে। যখন বঙ্কিমচন্দ্র এই গীত রচনা করিয়াছিলেন তখন তিনি হয় ত আশা করেন নাই যে,

স্বদেশী আন্দোলনে তাঁহার রচিত 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত প্রধান অংশ গ্রহণ করিবে এবং দেশবাসীর প্রত্যেক জাতীয় সভায় ইহা সমুৎসাহে গীত হইবে। দান্তে যখন ইটালীবাসিগণের মিলন-সঙ্গীত গান করিয়াছিলেন, তখন তিনি কল্পনাতেও আনিতে পারেন নাই যে, ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডি তাঁহার এই গানটীকে কাজে লাগাইবেন অথবা ইটালীর জাতীয় রাষ্ট্রীয় অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে এই গানটী প্রধান অংশ গ্রহণ করিবে। প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের আদর্শ বা ভাবের বীজ চারিদিকে ছড়াইয়া থাকেন; উহাদের কতকগুলি উর্ব্বর ভূমিতে পতিত হয়। কালই তাহাতে জল সেচন করে এবং কালের শক্তিতেই তাহারা অঙ্কুরিত হইয়া বিরাট বৃক্ষে পরিণত হয় এবং তাহাতে ভবিষ্য বংশীয়গণের প্রভূত উপকার হইয়া থাকে।"

স্বদেশী আন্দোলনের ফল

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন-প্রসূত স্বদেশী আন্দোলনের নায়ক ও পরিচালক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। তাঁহার অধিনায়কতায় স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব দেশের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে তখন বাঙ্গালার ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল লোকনায়কই স্বদেশী আন্দোলনকে সাফল্যের পথে পরিচালিত করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ এই আন্দোলনের সকল স্তরের সহিত পরিচিত ছিলেন। সুতরাং স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত আমরা নিম্নে উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন ঃ—

"স্বদেশী আন্দোলনে আমাদের রাজনীতি, সাহিত্য ও শ্রমশিল্প অভ্যুদয় লাভ করিয়াছিল। জাতীয় ভাবের পূর্ণ উচ্ছ্বাসে বঙ্গসাহিত্য প্লাবিত হইয়াছিল; ফলে গদ্য ও পদ্যসাহিত্যের প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। সংবাদপত্র এমন শক্তি লাভ করিয়াছিল এবং এরূপ দ্রুত উন্নতির পথে ধাবিত হইয়াছিল যে, বহুকাল তাহা ঘটিয়া উঠিতে পারে নাই। নবভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া বক্তৃগণ স্বদেশী যুগে যে সকল

আন্দোলনের আগাগোড়ায়ই লোকের মনে এই সঙ্কল্পের উদয় হইয়াছিল যে, তাহারা কাপড়-চোপড়ের জন্য ম্যাঞ্চেষ্টার ও বৈদেশিক জাতির মুখাপেক্ষী হইবে না। বোম্বাইয়ের কাপড়-কলওয়ালারা বাঙ্গালা দেশের ধুতি ও শাড়ীর অভাব ধুতি-শাড়ী সরবরাহ করিয়া পূর্ব্ব হইতেই কতক কতক দূর করিতেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলন যখন পূর্ণবেগে চলিতেছিল, সেই সময়ে বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলের মালিকেরা বাঙ্গালীকে বস্ত্র জোগাইয়া বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই সময়ে বাঙ্গালী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে হইল যে, বাঙ্গালা দেশেও কাপড়ের কলের প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত এবং সেই সকল কল হইতে উৎপন্ন কাপড়ে বাঙ্গালীর বস্ত্রাভাব যতটা সম্ভব দূর করিবার চেষ্টা বাঙ্গালীর করা উচিত। এই সময় ভাগীরথীর কূলে শ্রীরামপুরে একটি কাপড়ের কল ছিল, উহা কিছুদিন হইতে চলিতেছিল না। স্থির হইল যে, সেই কলটি কিনিয়া লওয়া হইবে এবং উহাকেই কিছু বাড়াইয়া লইয়া সূতা ও কাপড় তৈয়ারীর ব্যবস্থা করা হইবে। এই জন্য ১৮ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হইবে বলিয়া আনুমানিক হিসাব স্থির করা হইল। অবিলম্বে আবেদনপত্র প্রচারিত হইল। সেই আবেদনপত্রে আমার স্বাক্ষর ছিল। সহজেই এই ১৮ লক্ষ টাকা উঠিয়া গেল। এই কলের অধিকাংশ অংশই আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত ভদ্রসম্প্রদায় এবং মহিলাগণ ক্রয় করিয়াছিলেন। অতঃপর কলটী খরিদ করা হইল, উহার কল-কব্জা বৃদ্ধি করা হইল এবং উহার নামটী পরিবর্ত্তিত হইল—কলটির নূতন নামকরণ হইল—

"বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল"

এই নামকরণে নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছিল, কারণ তাঁহারা এই কলস্থাপনে প্রভূত সহায়তা করিয়াছিলন। "বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলে"র ইতিহাস বৈচিত্র্য-পূর্ণ। ইহাকে বহু বিপদের মধ্য দিয়া যাইতে হইয়াছিল; সম্পদের সময়ও যে ইহার হয় নাই তাহা নহে। অভিজ্ঞতা

লাভের জন্য আমাদিগকে সময়ে সময়ে মূল্য দিতে হইয়াছিল। আমাদিগকে অনেক সময়ে ঠেকিয়া শিখিতে হইয়াছিল। এইরূপে আমরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি তাহা যে আমাদের পক্ষে খুবই মূল্যবান হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এক্ষণে এই কাপড়ের কলটির জীবনের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে এবং আমি আশা করি যে, উত্তরোত্তর ইহার উন্নতিই হইবে।

দেশীয় ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠা—"বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক"

"স্বদেশী আন্দোলনের প্রারম্ভ হইতেই স্বদেশী ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল ; কারণ লোকে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, স্বদেশী শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে ব্যাঙ্কের সাহায্য অপরিহার্য্য। দেশীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে ও স্বদেশী কারবারগুলিতে ইউরোপীয়-পরিচালিত ব্যাঙ্কসমূহ হইতে প্রয়োজনানুরূপ সাহায্য পাওয়া যায় না বলিয়া লোকে অভিযোগ করিত। তদনুসারে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হইল। "বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলে"র মত ইহাও একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান। এই ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগণ হইলেন এদেশেরই অধিবাসী এবং তাঁহারাই হইলেন ইহার পরিচালক ও কর্ত্তা। ইহার ইতিহাস হইতে দেখা যায় যে, বাঙ্গালা দেশে ভারতীয় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইলে তাহা সফল হইতে পারে। "বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলে"র মত এই ব্যাঙ্কটিকেও বহু পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া চলিতে হইয়াছিল। একসময়ে ইহার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু সুখের বিষয়, সে বিপদ কাটিয়া গিয়াছিল।*

দেশীয় বীমা কোম্পানী

"স্বদেশী আন্দোলনের ফলে কতকগুলি দেশীয়-পরিচালিত জীবনবীমা কোম্পানীরও উদ্ভব হইয়াছিল। বয়কট আন্দোলনের বার্ষিকী উপলক্ষে

* পরবর্ত্তী সময়ে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক 'ফেল' হইয়া যায় ; তখন সুরেন্দ্রনাথ পরলোকে। সুতরাং উহার পতনের ইতিহাস এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক।

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে আমি বলিয়াছিলাম যে, জীবনবীমা কোম্পানী-প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমরা আমাদের শক্তির সুপ্রয়োগ করিতে পারি। আমার এই পরামর্শের ফল ফলিয়াছিল এবং কয়েকটী স্বদেশী জীবন-বীমা কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছিল ; এইগুলির মধ্যে ন্যাশন্যাল ও হিন্দুস্থান সমবায় বীমা কোম্পানীর নাম সুপ্রসিদ্ধ এবং ইঁহারা সবিশেষ সাফল্যের সহিত কার্য্য করিতেছেন।

বঙ্গভঙ্গ-প্রতিবাদে শোভাযাত্রা

"যেদিন বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদের জন্য বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হয়, সেদিন ছিল ৭ই আগষ্ট ; সেইদিনই স্বদেশী আন্দোলন প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। এই শোভাযাত্রা সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। মিষ্টার যোগেশ চৌধুরীর নেতৃত্বে কলিকাতার যুবকগণ কলেজ স্কোয়ার হইতে এক বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া টাউন হল অবধি গমন করিয়াছিল। কলিকাতার সমুদয় দেশীয় দোকান বন্ধ হইয়াছিল। সহরের যে অংশে দেশীয় লোকের বাস সেই অঞ্চল নির্জ্জন লোক-পরিত্যক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। কিন্তু টাউন হলের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ বিপুল-জন-সমাগমে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। এত লোকের সমাবেশ হইয়াছিল যে, টাউন হলের উপরতল ও নিম্নতল লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। বারান্দায় পর্য্যন্ত লোকের স্থান সংকুলান হয় নাই। টাউন হলের সম্মুখস্থ ময়দানও লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। আমরা তিনটি সভা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম,—একটি টাউন হলের দ্বিতলে, একটি টাউন হলের একতলে এবং আর একটি লর্ড বেণ্টিকের প্রতিমূর্ত্তির নিকটবর্ত্তী ময়দানে। আমি টাউন হলের সোপান-শ্রেণীর উপর দণ্ডায়মান হইয়া ঘোষণা করিয়াছিলাম যে, বিপুল লোক-সমাগমের জন্য তিনটী স্বতন্ত্র সভা উপরি-কথিত স্থান-ত্রয়ে করা হইয়াছে। সেই বিরাট জনতা তখন তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া যে যাহার সুবিধাজনক স্থানে দণ্ডায়মান হইল। সমবেত লোকগণ সম্পূর্ণ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল ; কেহই হুড়াহুড়ি, ঠেলাঠেলি বা এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করে নাই।

"আমি এই তিনটি সভাতেই বক্তৃতা করিয়াছিলাম। লোকের উৎসাহের অন্ত ছিল না এবং স্বদেশীর প্রতি কি নিষ্ঠা ও অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা একটি ঘটনা হইতে বুঝা গিয়াছিল। ঘটনাটি এই—বঙ্গভঙ্গ-জনিত দেশব্যাপী দুঃখের অভিব্যক্তি-স্বরূপ টাউন হলের উপরতলটি কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রে আবৃত করা স্থির হইয়াছিল। মেসার্স হোয়াইটএওয়ে লেডল কোম্পানীর উপর এই কার্য্যের ভার অর্পণ করা হইয়াছিল। কোম্পানী যথারীতি সে আদেশ কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। সভাধিবেশনের দিন প্রাতঃকালে মিষ্টার হালিম গজনবী আমার নিকট আসিয়া বলিলেন,—যে কালো কাপড় দিয়া টাউন হলের উপরিতল আবৃত করা হইয়াছে সে কাপড় বিদেশজাত। যদি এই কাপড় সরাইয়া ফেলা না হয়, তাহা হইলে আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, একটা হাঙ্গামা বাধিতে পারে। তখনই বন্ধুবান্ধবের সহিত পরামর্শ করা হইল; কারণ, সময় বড় অল্প। সকলেরই মত হইল যে, বিদেশী কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র অপসারিত করা হউক। বলা বাহুল্য, সভারম্ভের পূর্ব্বে উহা সরাইয়া ফেলা হইয়াছিল। কারণ, লোকের মনে উত্তেজনাব ভাব প্রবল ছিল, আমরা উহা উপেক্ষা করিতে পারি নাই। আমরা অনুষ্ঠানের প্রারম্ভেই আমাদের মধ্যে মতভেদজনিত গৃহবিবাদ ডাকিয়া আনা যুক্তিযুক্ত মনে করি নাই।

"কার্য্যারম্ভ হইল। টাউন হলের এই বিরাট সভা ও এই বিরাট শোভাযাত্রার ফলে জনসাধারণের মনে আশা ও বিশ্বাসের সঞ্চার হইল এবং তাহার ফলে জাতির উৎসাহ বৃদ্ধি পাইল। এই সভায় অখণ্ড বঙ্গদেশের সমস্ত প্রতিনিধি যোগ দিয়াছিলেন; সমগ্র বঙ্গদেশের পূর্ণ-প্রতিনিধিমূলক এত বড় সভায় আমি আর কখনও যোগদান করি নাই। কলিকাতার সভায় মফস্বল হইতে যে সকল প্রতিনিধি আগমন করিয়াছিলেন তাঁহারা এই প্রতিজ্ঞা করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন যে, তাঁহারা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এবং স্বদেশীর সমর্থনে পূর্ণ-শক্তিতে আন্দোলন চালাইবেন। বঙ্গভঙ্গে বাঙ্গালার জনমত যেরূপ অপমানিত হইয়াছিল, সেরূপ আর কখনও হয় নাই। ইহার বিরুদ্ধে অখণ্ড

বঙ্গদেশের প্রতিনিধিগণ এই সভায় সমবেত হইয়া বিরাট প্রতিবাদ-ধ্বনি উত্থিত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলন—এই উভয় আন্দোলনই পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবেই চলিয়াছিল; পরস্পরের ক্রিয়া পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনের প্রাবল্যের ফলে ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের আমদানি হ্রাস পাইয়াছিল। এইজন্য ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড়-বিক্রেতা মাড়োয়ারীগণ শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের হাতে অনেক বিলাতী কাপড় মজুত ছিল। তাঁহারা আমাদের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, তাঁহাদের ঘরে মজুত বিলাতী কাপড়গুলি বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হউক। আমরা বলিলাম—যদি আপনারা আপনাদের ঘরে মজুত বিলাতী কাপড়গুলি বিক্রীত হইবার পর পুনরায় আর বিলাতী কাপড় আমদানি না করেন, তাহা হইলে আমরা আপনাদের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি। এই সম্বন্ধে অনেকদিন ধরিয়া কথাবার্ত্তা চালাচলি হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার ফল কিছুই হয় নাই।”

বঙ্গদেশ-দ্বিখণ্ডীকরণ ও রাখীবন্ধন

গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ১৬ই অক্টোবর অর্থাৎ ৩০শে আশ্বিন তারিখে বঙ্গদেশকে দ্বিধা বিভক্ত করা হইবে। বাঙ্গালা দেশের অধিবাসীদের পক্ষে এই দিনটীই শোকের দিন বলিয়া পরিগণিত হইবে—অখণ্ড বঙ্গের নেতৃবৃন্দ ইহা স্থির করিলেন এবং জনসাধারণকে ইহা জানাইলেন। বলা বাহুল্য,—বঙ্গদেশের জনসাধারণ নেতৃবৃন্দের এই উপদেশ পালন করিতে দ্বিমত করিলেন না। এইদিনে জনসাধারণকে কি কি কার্য্য করিতে হইবে তাহা মফস্বলের নেতৃবৃন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া কলিকাতার নেতৃবৃন্দ স্থির করেন এবং সেগুলি মুদ্রিত করিয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়। এইসকল কার্য্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিল—রাখীবন্ধনের উৎসব। এই উৎসব কিরূপে পালন করিতে হইবে এবং লোকমতের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত বঙ্গব্যবচ্ছেদের দুঃখময় স্মৃতি—যতদিন ইহা নাকচ না হয় ততদিন পর্য্যন্ত কি ভাবে হৃদয়ে জাগরূক রাখিতে হইবে,

তাহা এতৎসংক্রান্ত প্রচারপত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। সেই প্রচারপত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

রাখী-বন্ধনের উৎসব

আগামী ৩০শে আশ্বিন বাঙ্গালা দেশ আইনের দ্বারা বিভক্ত হইবে। কিন্তু ঈশ্বর যে বাঙ্গালীকে বিচ্ছিন্ন করেন নাই তাহাই বিশেষরূপ স্মরণ ও প্রচার করিবার জন্য সেইদিনকে আমরা বাঙ্গালীর রাখীবন্ধনের দিন করিয়া পরস্পরের হাতে হরিদ্রাবর্ণের সূতা বাঁধিয়া দিব। রাখীবন্ধনের মন্ত্রটী এই—"ভাই ভাই এক ঠাঁই।"* বিজয়া দশমীর দিনে যেমন বাঙ্গালী আত্মীয়-বন্ধুদের বাড়ী বাড়ী গিয়া প্রণাম, নমস্কার, কোলাকুলি করিয়া আসে সেইরূপ প্রতি বৎসর এই ৩০শে আশ্বিনের তিথিতে আমরা বাঙ্গালা দেশের সকল বিভাগেরই আত্মীয়-বন্ধুবর্গের দক্ষিণহস্তে এই রাখী বাঁধিয়া আসিব। সেদিন বাঙ্গালার পূর্ব্ব বিভাগের সহিত পশ্চিম বিভাগের, উচ্চশ্রেণীর সহিত নিম্নশ্রেণীর, খ্রীষ্টান মুসলমানের সহিত হিন্দুর মিলন স্মরণের দিন—অতএব সেদিন প্রভু ও ভৃত্য, ধনী ও দরিদ্র জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে পরস্পরের হস্তে রাখী বাঁধিয়া দিবেন। বর্ত্তমান বৎসরে এই ৩০শে আশ্বিনে শুক্লতৃতীয়া তিথি পড়িবে—এই তিথিকে আমরা রাখীতৃতীয়া নাম দিয়া উক্ত তিথিতে বাঙ্গালীর মিলনোৎসব সম্পন্ন করিব। উক্ত দিনে সংযমস্বরূপ আমাদের অরন্ধন হইবে—চুল্লী না জ্বালিয়া আমরা ফল দুগ্ধ আহার করিব। উক্ত দিনে বাঙ্গালার পূর্ব্ব বিভাগের লোকেরা পশ্চিম বিভাগের নিকট ও পশ্চিম বিভাগের লোকেরা পূর্ব্ব বিভাগের নিকট "ভাই ভাই এক ঠাঁই" এই লিখিত মন্ত্রসহ রাখীসূত্র পাঠাইয়া দিবেন। রাজার খড়্গ যে বিধাতার বন্ধনকে ছিন্ন করিতে পারে না—ইহাই উপলব্ধি করিবার জন্য আমাদের এই রাখীবন্ধনের উৎসব।

সুরেন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত রিপণ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বা অধ্যক্ষ আচার্য্য

* ইহার পাঠান্তরও আছে ; কারণ কাহারও কাহারও মতে মন্ত্রটী এই ঃ—
"ভাই ভাই এক ঠাঁই
ভেদ নাই ভেদ নাই।"

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এই রাখীবন্ধন-উৎসব-উপলক্ষে “বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা” রচনা করেন। রাখীবন্ধন-উপলক্ষে ইহা বহুস্থানে অনুষ্ঠান-সহকারে পঠিত হইয়াছিল। আমরা নিম্নে উহা উদ্ধৃত করিলাম :—

বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা

বন্দে মাতরম্। বাঙ্গালা নামে দেশ; তার উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে সাগর। মা গঙ্গা মর্ত্তে নেমে নিজের মাটীতে এই দেশ গড়্লেন। প্রয়াগ, কাশী পার হ'য়ে মা পূর্ব্ববাহিনী হ'য়ে সেই দেশে প্রবেশ কর্লেন। প্রবেশ করে' সেখানে শতমুখী হ'লেন। শতমুখী হ'য়ে মা সাগরে মিশ্লেন। তখন লক্ষ্মী এসে সেই শতমুখে অধিষ্ঠান কর্লেন। বাঙ্গালার লক্ষ্মী বাঙ্গালা দেশ জুড়ে বস্লেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ কর্তে লাগলেন। ফলে ফুলে দেশ আলো হ'ল। সরোবরে শতদল ফুটে উঠ্ল। তা'তে রাজহংস খেলা কর্তে লাগ্ল। লোকের গোলা-ভরা-ধান, গোয়াল-ভরা গরু, গাল-ভরা হাসি। লোকে পরমসুখে বাস কর্তে লাগ্ল।

এমন সময় মর্ত্তে কলির উদয় হ'ল। লোকে ধর্ম্মকর্ম্ম ছাড়তে লাগ্ল! ব্রাহ্মণ-সজ্জনে অনাচারী হ'ল। সন্ন্যাসীরা ভণ্ড হ'ল। বেদবিধি অমান্য কর্তে লাগ্ল! লক্ষ্মী চঞ্চলা; তিনি চঞ্চলা হ'লেন। লক্ষ্মী ভাব্লেন—হায়, আমি বাঙ্গালার লক্ষ্মী; আমাকে বাঙ্গালা ছাড়তে হ'ল। তখন বাঙ্গালাতে রাজা ছিলেন; তাঁর নাম আদিশূর। লক্ষ্মী তাঁকে স্বপ্ন দিলেন, আমি বাঙ্গালার লক্ষ্মী; বাঙ্গালায় অনাচার ঘটেছে; আমি বাঙ্গালা ছেড়ে চল্লাম। রাজা কেঁদে বল্লেন,—না মা, তুমি বাঙ্গালা ছেড়ে যেও না; যাতে বাঙ্গালায় সদাচার ফিরে আসে, তা আমি কর্ছি। রাজা ঘুম ভেঙ্গে দরবারে বস্লেন। দরবারে বসে' পশ্চিম দেশে কনোজে লোক পাঠালেন, কনোজ থেকে পাঁচজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আনালেন। তাঁদের সঙ্গে পাঁচজন সজ্জন কায়েত এলেন। রাজা তাঁদের রাজ্যের মধ্যে বাস করালেন। তাঁরা বাঙ্গালা দেশে বেদবিধি নিয়ে এলেন। সদাচার

নিয়ে এলেন। তাঁদের ছেলে মেয়ে বাঙ্গালার গাঁয়ে গাঁয়ে বাস করতে লাগল। তাঁদের দেখাদেখি দেশে বেদবিধি সদাচার ফিরে এল। বাঙ্গালার লক্ষ্মী বাঙ্গালা জুড়ে বস্‌লেন। ধনে ধানে দেশ পূর্ণ হ'ল।

চিরদিন সমান যায় না। লক্ষ্মী চঞ্চলা, লক্ষ্মী আবার চঞ্চলা হ'লেন। বাঙ্গালার ধন দেখে, ধান দেখে মোছলমান বাঙ্গালায় এলেন। তখন বাঙ্গালার রাজা ছিলেন; তাঁর নাম ছিল লক্ষ্মণ সেন। তাঁর রাজ্য গেল। মোছলমান বাঙ্গালার রাজা হ'লেন। হিঁদুর জাতধর্ম্ম নষ্ট হ'তে লাগ্‌ল। হিঁদুর ঠাকুরঘর ভেঙ্গে মোছলমান মস্‌জিদ্ তুল্‌তে লাগ্‌লেন। অৰ্দ্ধেক হিঁদু মোছলমান হ'ল। হিঁদু-মোছলমান এক গাঁয়ে এক ঠাঁয়ে বাস করে' মারামারি-কাটাকাটি কর্‌তে লাগ্‌ল; লক্ষ্মী ভাব্‌লেন—হায় আমি বাঙ্গালার লক্ষ্মী, আমাকে বুঝি বাঙ্গালা ছাড়তে হ'ল। তখন বাঙ্গালাতে গৌড়ের পাঠান বাদশা রাজা ছিলেন, নাম ছিল হুসেন শা। লক্ষ্মী তাঁকে স্বপ্ন দিলেন—আমি বাঙ্গালার লক্ষ্মী, আমার হিঁদুও যেমন মোছলমানও তেমনি; হিঁদু-মোছলমান ভাই-ভাই যখন মারামারি-কাটাকাটি কর্‌তে লাগ্‌ল, আমি বাঙ্গালা ছেড়ে চল্‌লেম। পাঠান রাজা কেঁদে বল্‌লেন—মা তুমি যেতে পাবে না; আমি হিঁদু-মোছলমান সমান দেখ্‌ব, তাদের ভাই-ভাই এক ঠাঁই কর্‌ব, তুমি বাঙ্গালা ছেড়ে যেও না। মা লক্ষ্মী বল্‌লেন—আচ্ছা, তাই হবে; আমি এখন থাক্‌ব: দিল্লীতে মোগল বাদশা হবে; দিল্লীর বাদশা বাঙ্গালার রাজা হবেন; সেই রাজার আমলে হিঁদু-মোছলমান ভাই-ভাই হবে, ঝগড়া-বিবাদ মিটে যাবে। রাজা ঘুম ভেঙ্গে দরবারে বস্‌লেন। দরবারে ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে মহাভারত শোনালে। মোছলমান রাজা ব্রাহ্মণকে মান করে' রাজমন্ত্রী করলেন। হিঁদু গিয়ে মোছলমানের পীরতলায় সিন্নি দিতে লাগ্‌ল। এমন সময় মহাপ্রভু নদীয়ায় অবতার হ'লেন। তিনি যবন-ব্রাহ্মণ সবাইকে ডেকে কোল দিলেন। পাঠানের পর দিল্লীতে মোগল বাদশা বাঙ্গালার রাজা হ'লেন। তিনি হিঁদু-মোছলমানকে সমান চোখে দেখতে লাগলেন। হিঁদু-মোছলমান ভাই ভাই হল,—ঝগড়া-বিবাদ

মিটে গেল। বাঙ্গালার লক্ষ্মী বাঙ্গালা জুড়ে বসলেন। ধনে-ধানে দেশ পূর্ণ হ'ল।

চিরদিন সমান যায় না। এইরূপে বহুদিন গেল। লক্ষ্মী চঞ্চলা, তিনি আবার চঞ্চলা হ'লেন। দিল্লীর তখনকার বাদশা ছিলেন; তাঁর নাম ছিল আলমগীর। তিনি হিঁদু-মোছলমানে তফাৎ করতে গেলেন। বর্গী এসে বাদশার রাজ্য লুঠ করতে লাগ্‌ল। সাত সমুদ্র পার হ'য়ে খৃষ্টান ইংরেজ-সদাগর বাঙ্গালায় বাণিজ্য কর্‌তে এলো। দিল্লীর বাদশা তাদের আদর করে' নিজের রাজ্যমধ্যে জায়গা দিলেন। তাদের বাঙ্গালারদেওয়ান করে' দিলেন। বাঙ্গালার ধন দেখে, ধান দেখে তাদের লোভ হ'ল। লক্ষ্মী তখন দিল্লীর বাদশাকে ছেড়েছেন। ইংরেজ সদাগর হ'য়েছিল বাঙ্গালারদেওয়ান, এখন ত রাই হ'ল বাঙ্গালার রাজা। তারা এসেছিল সদাগর, হয়েছিল বাঙ্গালার দেওয়ান, হ'য়ে গেল দেশের রাজা। রাজা হ'ল, কিন্তু রাজ্যে বাস কর্‌লে না। বাঙ্গালা দেশের ধন সাত সমুদ্রপারে আপন দেশে নিয়ে চল্‌ল। সদাগরের জাত কি না, খুব বুদ্ধি, মেজাজ ঠাণ্ডা, একটু লোভী। তাঁরা চোর-ডাকাত দমন করলেন, প্রজার নানান্ সুবিধা করে' দিলেন, আবার নিজের দেশ হ'তে খেল্‌না এনে, পুতুল এনে প্রজার মন ভুলাতে লাগ্‌লেন। লক্ষ্মী যখন চঞ্চলা হন, তখন মানুষের বুদ্ধিলোপ হয়। বাঙ্গালার লোকের বুদ্ধিলোপ হ'ল; বুড়ামানুষে শিশু সাজল; খেলনা পুতুল নিয়ে ছেলেখেলা কর্‌তে লাগ্‌ল। দেশের জিনিসে লোকের মন উঠে না। বিদেশের ঝুঁটো মণির রঙের বাহার দেখে দেশের সাচ্চা মণিকে অনাদর করতে লাগ্‌ল। রাজা যত আদর দেন, সোহাগ করেন, দেশের লোক ততই খোকা সাজতে লাগ্‌ল। রাজা হাততালি দিতে লাগ্‌লেন; দেশের বুড়োরা হামাগুড়ি দিয়ে আধ-আধ কথা বল্‌তে লাগ্‌ল। লক্ষ্মী বল্‌লেন,—আর না; আমি বাঙ্গালার লক্ষ্মী, আমার আর বাঙ্গালায় থাকা চললো না।

লক্ষ্মী চঞ্চলা। বাঙ্গালার লক্ষ্মী বাঙ্গালা ছেড়ে চললেন। আঁধার রাতে কালপেঁচা ডেকে উঠ্‌ল। তখন সাত কোটি বাঙ্গালী কেঁদে

উঠল। রাজার দোষে লক্ষ্মী আমাদের ছেড়ে চললেন। ইংরেজ রাজার তখন একটা ছোকরা নায়েব ছিল। সে ধরাকে সরা জ্ঞান করত। আলমগীর বাদশার তক্তে বসে' সে আপনাকে আলমগীরের নাতি-হেন ঠাওরা'ত। সে বললে,—এরা বড় ঘ্যান্ ঘ্যান্ করছে, সাত কোটীর ঘ্যানঘ্যানানী শোনা যায় না; থাক্ এদের দু'দল করে' দিচ্ছি; একদিকে থাক্ মোছলমান, আর একদিকে থাক্ হিঁদু। এরা ভাই-ভাই এক ঠাই থেকে বড় বিরক্ত করছে; এদের ভাই-ভাই ঠাই-ঠাই করে' দাও, এদের জোট ভেঙ্গে দাও। এই বলে তিনি বাঙ্গালীকে দু' দল করে' দিলেন,—একদিকে গেল হিঁদু, আর একদিকে গেল মোছলমান; পূবে-উত্তরে গেল মোছলমান, পশ্চিমে-দক্ষিণে হিন্দু।

লক্ষ্মী দেখলেন আমি বাঙ্গালার লক্ষ্মী; আর আমার নিতান্তই বাঙ্গালায় থাকা চললো না। আমার হিন্দু যেমন মোছলমানও তেমনি। হিন্দু মোছলমান যখন ভাই ভাই ঠাই ঠাই হলো, তখন আর আমার বাঙ্গালায় থাকা চললো না।

১৩১২ সাল, আশ্বিন মাসের তিরিশে, সোমবার, কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া, সেদিন বড় দুর্দ্দিন, সেইদিন রাজার হুকুমে বাঙ্গালা দু'খান হবে, বাঙ্গালার লক্ষ্মী বাঙ্গালা ছেড়ে যাবেন। পাঁচ কোটী বাঙ্গালী আছাড় খেয়ে ভূমে গড়াগড়ি দিয়ে ডাকতে লাগল—মা, তুমি বাঙ্গালার লক্ষ্মী তুমি বাঙ্গালা ছেড়ে যেও না, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর। বিদেশী রাজা আমাদের মন বোঝেন না তাই ভাই-ভাই ঠাই-ঠাই করতে চাইলেন। আমরা ভাই-ভাই ঠাই-ঠাই হব না। মা, তুমি কৃপা কর। আমরা এখন থেকে মানুষের মত হব। আর পুতুল খেলা করব না; আর কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ কিনব না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা করবো না। মা, তুমি আমাদের ঘরে থাক। বাঙ্গালার লক্ষ্মী বাঙ্গালীকে দয়া করলেন। কালীঘাটের মা কালীতে তিনি আবির্ভাব হ'লেন। মা কালী নববেশে মন্দিরে দেখা দিলেন। সেদিন আশ্বিনের অমাবস্যা, ঘোর দুর্য্যোগ, ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি, হু-হু করে' হাওয়া। পঞ্চাশ হাজার বাঙ্গালী মা কালীর কাছে ধন্না দিয়ে পড়লো; বললে মা, আমাদের

কর। বাঙ্গালার লক্ষ্মী যেন বাঙ্গালা ছেড়ে না যান। আমরা আর অবোধের মত ঘরের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেল্‌বো না। কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ নেবো না। ঘরের জিনিষ থাক্‌তে পরের জিনিষ নেবো না। মায়ের মন্দির হ'তে মা বলে' উঠ্‌লেন—জয় হউক,—জয় হউক,—ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাক্‌বেন; বাঙ্গালায় থাক্‌বেন; তোমরা প্রতিজ্ঞা ভুলো না। ঘরের থাক্‌তে পরের নিও না। ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হয়ো না। তোমাদের "এক দেশ, এক ভগবান্, এক জাতি, এক মনপ্রাণ"। লক্ষ্মী তোমাদের কৃপা কর্‌বেন। লক্ষ্মী তোমাদের অচলা হবেন।

তিরিশে আশ্বিন, কোজাগরী পূর্ণিমার পর তৃতীয়া। পূর্ণিমার পূজা নিয়ে বাঙ্গালার লক্ষ্মী ঐদিন বাঙ্গালা ছাড়্‌ছিলেন। ঐদিন বাঙ্গালার লক্ষ্মী বাঙ্গালায় অচলা হ'লেন; বাঙ্গালার হাট-মাঠ-ঘাট জুড়ে বসলেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ করতে লাগলেন। ফলে ফুলে দেশ আলো হ'ল। সরোবরে শতদল ফুটে উঠ্‌লো। তাতে রাজহংস খেলা করতে লাগল। লোকের গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, গালভরা হাসি হ'ল

বাঙ্গালার মেয়েরা ঐদিন বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত নিলে। ঘরে ঘরে সেদিন উনুন জ্বল্‌ল না। ঘট পেতে হরিতকী হাতে বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুন্‌লে; হাতে হাতে হল্‌দে সূতার রাখী বাঁধলে; যে এই বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুনে লক্ষ্মী তার ঘরে অচলা হন।

বছর বছর বাঙ্গালীর মেয়েরা এই ব্রত নেবে; বাঙ্গালীর ঘরে ঐদিন উনুন জ্বল্‌বে না। হাতে হাতে হল্‌দে সূতোর রাখী বাঁধবে। বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুনে শাঁখ বাজিয়ে ঘটে প্রণাম করে' পাটালিপ্রসাদ পাবে। ঘরে ঘরে লক্ষ্মী অচলা হবেন। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাক্‌বেন। বাঙ্গালার লক্ষ্মী বাঙ্গালায় থাক্‌বেন।

সবাই বল—

আমরা ভাই ভাই এক ঠাঁই
ভেদ নাই ভেদ নাই

ভাই ভাই এক ঠাঁই
ভেদ নাই ভেদ নাই
ভাই ভাই এক ঠাঁই
ভেদ নাই ভেদ নাই

মা লক্ষ্মী কৃপা কর।। কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ নেবো না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা করবো না। পড়শীকে খাইয়ে নিজে খাব। মোটা অন্ন অক্ষয় হোক্। মোটা বস্ত্র অক্ষয় হোক। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকুন। বাঙ্গালার লক্ষ্মী বাঙ্গালায় থাকুন।

বাংলার মাটী, বাংলার জল,
বাংলার হাওয়া, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান্!

বাংলার ঘর, বাংলার মাঠ,
বাংলার বন, বাংলার হাট,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান্!

বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক,
সত্য হউক, হে ভগবান্।

বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন,
বাঙালীর ঘরে, যত ভাই-বোন,
এক হউক, এক হউক,
এক হউক, হে ভগবান্।

বন্দে মাতরম

অনুষ্ঠান

প্রতি বৎসর আশ্বিনের সংক্রান্তিতে বঙ্গবিভাগের দিনে গৃহস্থ নারীগণ বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত অনুষ্ঠান করিবেন। সেদিন অরন্ধন; দেশসেবা, রোগী ও শিশুর সেবা ব্যতীত অন্য উপলক্ষে গৃহে উনুন জ্বলিবে না। ফল-মূল, চিড়া-মুড়ি অথবা ভিজা ভাত ভোজন চলিবে।

পরিবারস্থ নারীগণ ঘটস্থাপনা করিয়া ঘটের পার্শ্বে উপবেশন করিবেন। বিধবারা ললাটে সিন্দুর ও সধবারা চন্দন লইবেন। হরিতকী বা সুপারী হাতে লইয়া বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুনিবেন। কথা-শেষে শঙ্খ-ধ্বনির পর ঘটে প্রণাম করিবেন। প্রণামান্তে বামহস্তের প্রকোষ্ঠে হরিদ্রা-রঞ্জিত সূত্রে পরস্পর রাখী বাঁধিবেন। রাখীবন্ধনের সময় শঙ্খধ্বনি হইবে। তৎপরে পাটালিপ্রসাদ গ্রহণ করিবেন।

মিলন-মন্দির—ফেডারেশন হল

৩০শে আশ্বিন কেবল যে রাখীবন্ধনের জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা নহে, এই দিনটীতে যাহাতে কোনও জাতিহিতকর অনুষ্ঠানের পত্তন হয়, অনেকেরই মনে এরূপ ইচ্ছার উদয় হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ প্রস্তাব করিলেন যে, ৩০শে আশ্বিনকে স্মরণীয় করিবার জন্য একটি মিলন-মন্দির (Federation Hall) প্রতিষ্ঠিত হউক। যদি বঙ্গব্যবচ্ছেদ রদ না হয় বা উহার রূপান্তর বা সংশোধন না হয়, তাহা হইলে পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গের নেতৃবর্গ এই মিলন-মন্দিরে পরস্পর সমবেত হইয়া সভার অধিবেশন করিতে পারিবেন। ইহা দ্বারা বাঙ্গালী জাতি দেখাইতে পারিবে যে, গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালী জাতির অভিমতকে উপেক্ষা করিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গকে পৃথক করিয়া দিয়াছেন বটে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালী জাতি এক ও অখণ্ডই আছে এবং থাকিবে। এই মিলন-মন্দিরই পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের মিলন-ভূমি এবং সমগ্র বাঙ্গালীজাতির মহামিলনের দ্যোতক ও স্মারক হইয়া থাকিবে।

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস সহরে সুরেন্দ্রনাথ "হোটেল ডি

ইনভ্যালিডস" (Hotel des Invalides) যখন পরিদর্শন করেন তখন তিনি দেখিয়াছিলেন যে, বিরাট পুরুষ নেপোলিয়নের সমাধির চতুর্দ্দিকে ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রদেশের কীর্ত্তিমান লোকনায়কগণের প্রতিমূর্ত্তি বিরাজমান রহিয়াছে কিন্তু আলসেস ও লোরেণ প্রদেশদ্বয়ের নেতৃবর্গের প্রতিমূর্ত্তি বস্ত্রাবৃত ছিল; কারণ, আলসেস ও লোরেণ প্রদেশ দুইটী পুনরায় ফ্রান্সের হস্তে আসিলে উহার নেতৃবর্গের আবরণ উন্মোচিত হইবে—ইহাই তথাকার কর্ত্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত ছিল। সুরেন্দ্রনাথের মনে এইরূপ পরিকল্পনার উদয় হইয়াছিল যে, প্রস্তাবিত মিলন-মন্দিরে বাঙ্গালার সকল জেলার নেতৃবর্গের প্রতিমূর্ত্তি থাকিবে; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি যে যে জেলাকে অখণ্ড বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন সেই সকল জেলার নেতৃবর্গের প্রতিমূর্ত্তিগুলি যতদিন পুনরায় বঙ্গদেশ অখণ্ড ও মিলিত না হয় ততদিন বস্ত্রাবৃত থাকিবে। মিলন-মন্দিরে জনসাধারণের হিতকর অন্যান্য কার্য্যেরও অনুষ্ঠান হইতে পারিবে এই মিলন-মন্দির চিরকাল বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের স্মৃতিচিহ্ন হইয়া থাকিবে এবং ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া বাঙ্গালীজাতির পুনর্মিলন-চেষ্টা উত্তরোত্তর শক্তি সঞ্চয় করিবে।

দানবীর স্যর তারকনাথ পালিত এবং রামকৃষ্ণ মিশনের ভগিনী নিবেদিতা উভয়েই সুরেন্দ্রনাথের এই প্রস্তাবের পূর্ণ সমর্থন করিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা ভারতের কল্যাণ-সাধনে আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং ভারতের সেবা করিতে করিতেই তিনি মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। স্যর তারকনাথ পালিত সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—বাঙ্গালা দেশে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-বিস্তারের জন্য তিনি যে রাজোচিত দান করিয়া গিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার নাম চিরকাল বাঙ্গালীজাতি স্মরণ করিবে। দেশের কল্যাণকর বহু কার্য্যেই তাঁহার সহানুভূতি ছিল। যখন তিনি বুঝিতেন যে, এই রাজনৈতিক আন্দোলন দ্বারা সুফল ফলিবে, তখন তিনি মনে প্রাণে সেই আন্দোলনে যোগ দিতেন এবং রাজনীতি-ক্ষেত্রে তখন তাঁহার কর্ম্মশক্তির প্রভাব অনুভূত হইত। জাতির স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি সর্ব্বদা অবহিত

থাকিতেন। দেশবাসীর তিনি অকপট বন্ধু ছিলেন। এইজন্য অকপট বন্ধুর মত তিনি দেশের কল্যাণের দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন। তীক্ষ্ণধী ব্যবহারাজীবের দূরদৃষ্টিও তিনি দেশসেবার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হইলে প্রয়োগ করিতেন। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ রদ করিবার জন্য তিনিও প্রাণপণ করিয়াছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলন ও সুরেন্দ্রনাথ

স্বদেশী আন্দোলনের সহিত সুরেন্দ্রনাথের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ছিল সুরেন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ ছিলেন এবং স্বদেশী আন্দোলনও সুরেন্দ্রনাথের প্রাণস্বরূপ ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের ধারক ও বাহক অর্থাৎ অধিনায়কই ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। তিনিই এই আন্দোলনকে পরিচালনা করিতেন। এই সকল কার্য্যে বঙ্গের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁহার সহযোগিতা করিয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠনাথ সেন, অশ্বিনী-কুমার দত্ত, অম্বিকাচরণ মজুমদার, আনন্দচন্দ্র রায়, যাত্রামোহন সেন, ব্যারিষ্টার পি মিত্র, চিত্তরঞ্জন দাশ, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়, ললিতমোহন ঘোষাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, অরবিন্দ ঘোষ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার জে-এন, রায়, আনন্দ-মোহন বসু, আশুতোষ চৌধুরী, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্যচৌধুরী, ব্রজেন্দ্রনাথ আচার্য্যচৌধুরী, মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, অধ্যাপক ললিতমোহন দাস, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, গীষ্পতি কাব্যতীর্থ, ব্যারিষ্টার এ রসুল, মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন প্রভৃতি দেশের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ স্বদেশী আন্দোলনের পরিচালনায় সুরেন্দ্রনাথের প্রধান সহচর—কেহ কেহ দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। এই তালিকা আরও দীর্ঘ করা যাইতে পারা যায়; কারণ, স্বদেশী আন্দোলনের প্রধান কর্ম্মীবর্গের সংখ্যা বহু ছিল

গণ-জাগরণ বা জন-জাগরণের প্রকৃতপক্ষে সূচনা হয় স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে। সেই বিপুল জন-চেতনা দেখিয়া গবর্ণমেণ্ট বিচলিত

হইয়াছিলেন। তাহারা ইহার গতি-পথ রুদ্ধ করিবার জন্য দমন-নীতি অবলম্বন করিলেন; কিন্তু ইহার ফল বিপরীত হইল। স্বদেশী আন্দোলন অধিকতর প্রবল বেগে চলিতে আরম্ভ করিল। ছাত্রগণ এবং দেশের তরুণ সম্প্রদায় স্বদেশী আন্দোলনে প্রভূত সহায়তা করিয়াছিল; তাহারাই ছিল ইহার প্রধান প্রচারক। ছাত্রদের কর্ম্মশক্তি ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটগণ মফঃস্বলের প্রত্যেক স্কুল-কলেজে এই মর্ম্মে ইস্তাহার জারি করেন যে, স্কুল ও কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ যদি তাঁহাদের ছাত্রগণকে প্রকাশ্যভাবে বিলাতী দ্রব্য বয়কট, পিকেটিং ইত্যাদি কর্ম্ম করিতে বাধা না দেন তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট স্কুল বা কলেজে যে অর্থসাহায্য করিয়া থাকেন তাহা বন্ধ করিয়া দিবেন, উহার ছাত্রগণকে পরীক্ষায় প্রতিযোগিতামূলক বৃত্তি দিবেন না এবং ঐ স্কুল বা কলেজকে তালিকা-চ্যুত করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করা হইবে "ষ্টেটস্‌ম্যান" পত্রিকা পর্য্যন্ত এই ইস্তাহারের নিন্দা করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ তৎসম্পাদিত 'বেঙ্গলী' পত্রে ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। ইহার পর নবগঠিত পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্টের "বন্দে মাতরম্ ইস্তাহার" এই ইস্তাহারের অর্থ—রাজপথ-সমূহে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করা আইন-বিরুদ্ধ সুরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই সম্বন্ধে কলিকাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মিঃ পিউঘের অভিমত গ্রহণ করেন: তিনি বলেন, গবর্ণমেণ্টের এই ইস্তাহারই বে-আইনী।

"বন্দে মাতরম" ও সুরেন্দ্রনাথ

"বন্দে মাতরম্" সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই:—"বন্দে মাতরম্" যে সঙ্গীতের প্রারম্ভে সেই সঙ্গীতটি আছে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসিদ্ধ উপন্যাস "আনন্দমঠে"। ইহা বাঙ্গালা গান বটে, কিন্তু ইহার ভাষা এত সংস্কৃতবহুল যে, ভারতের সকল প্রদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইহার অর্থ উপলব্ধি করিতে পারেন। ইহার অসামান্য শব্দচ্ছটা, ইহার সুমধুর ছন্দ, ইহার অন্তর্নিহিত দেশাত্মবোধের দ্যোতনা-ব্যঞ্জনা ইহাকে জাতীয় সঙ্গীতের গৌরবময় পর্য্যায় উন্নীত করিয়াছে এবং

ইহা জাতীয় সমিতির উদ্বোধন-সঙ্গীতে পরিণত হইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনে এই "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত কি অংশ গ্রহণ করিবে— বঙ্কিমচন্দ্র তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। দান্তে যখন ইটালীর মিলন-সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন তখন তিনি মনেও করিতে পারেন নাই যে, ভবিষ্যতে এই সঙ্গীত ম্যাটসিন ও গ্যারিবল্ডির মুক্তি-আন্দোলনের প্রধান অবলম্বন এবং ইটালীর অধিবাসিগণের রাষ্ট্রীয় প্রগতির অন্যতম সহায় হইবে। প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের আদর্শ ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া যান; উহাদের কতকগুলি উর্ব্বর ভূমিতে পড়ে; কাল ঐগুলিতে জলসেচন করিয়া থাকে; ঐগুলি হইতেই পরিণামে বিপুল শস্যসম্ভার উৎপন্ন হয় এবং ভবিষ্য-বংশীয়গণের অশেষ কল্যাণসাধন করে।"

প্রথম রাখী-বন্ধন দিবস

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর বা ৩০শে আশ্বিন বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদ-স্বরূপ সমগ্র বঙ্গের অখণ্ডত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য প্রথম রাখী-বন্ধন দিবসের অনুষ্ঠান হয়। মাত্র ইহার দুই এক দিন পূর্ব্বে এই বিষয়টি জনসাধারণের নিকট প্রচারিত হয়। রাখীবন্ধন-অনুষ্ঠান-দিবসের পূর্ব্বদিন স্বেচ্ছাসেবকগণ দেশের সর্ব্বত্র রাখীবন্ধন-অনুষ্ঠানের বার্ত্তা দেশবাসীর গোচর করেন। কিন্তু জননায়কগণের এই আদেশ জনসাধারণ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। ৩০শে আশ্বিন উষালোক বিকশিত হইবার পূর্ব্বেই কলিকাতা সহরে দলে দলে নরনারী গঙ্গাস্নান করিতে চলিল। সমস্ত রাজপথ এবং গঙ্গার ঘাটসমূহ লোকারণ্য হইয়া উঠিল। স্নান করিয়া পরস্পর পরস্পরের হাতে হরিদ্রা রঞ্জিত রক্তবর্ণ রাখী বাঁধিয়া দিতেছে, রাখীর সূতা বিদেশী সূতা নহে— চরকা-কাটা স্বদেশী সূতা। কলিকাতার পথে ঘাটে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি। দেশের ও জাতির কল্যাণ-কামনায় সকলে পবিত্র ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। সকলেই শুদ্ধস্নাত এবং দেশমাতৃকার পবিত্র নাম কণ্ঠে উচ্চারণ করিয়া জাতিকে অখণ্ড মিলন-বন্ধনে আবদ্ধ করিবার জন্য

বদ্ধপরিকর। পূর্ব্বাহ্নে ছিল গঙ্গাস্নান ও স্নানান্তে পুতনির্ম্মলচিত্তে স্বদেশীয় সূত্রে রাখীবন্ধন ব্যবস্থা এবং অপরাহ্নে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এই পুণ্য দিনটিকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য সঙ্কল্পিত মিলন মন্দিরের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা।

মিলন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন

মিলন মন্দিরের ভিত্তিস্থাপনের তারিখ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, ১৬ই অক্টোবর ১৯০৫। অর্থাৎ রাখী-বন্ধনের দিবস। অপরাহ্ন ৪॥০ ঘটিকায় সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার কথা ; কিন্তু তাহার বহুপূর্ব্ব হইতেই সভার স্থান জনাকীর্ণ হইয়া যায়। অনুমান ৫০ হাজার লোকের এক বিরাট জনতা সে স্থানে সমাগত হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি তাঁহারা স্থির ও শান্তভাবেই অপেক্ষা করিতে থাকেন।

ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের ভার অর্পিত হইয়াছিল—ময়মনসিংহের জননেতা আনন্দ মোহন বসুর উপর। পূর্ব্বে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি ছিলেন ময়মনসিংহ জেলার অধিবাসী। বঙ্গ-বিচ্ছেদকে তিনি দেশের পক্ষে গভীর পরিতাপের বিষয় বলিয়া মনে করিতেন। যেসময়ে মিলন-মন্দিরের ভিত্তিস্থাপনের প্রস্তাব হয় তখন তিনি ছিলেন অসুস্থ ;—এমন কি শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু বড় বড় মনীষীদের মধ্যে দেখা যায় যে,—অসুস্থ শরীরের নীচে থাকে একটি উৎসাহের উদ্দীপনা ; যাহা সকল দুর্ব্বলতা, সকল ক্লেশ, এমন কি অবশ্যম্ভাবী আসন্ন মরণের ছায়াকেও তুচ্ছ করিতে পারে। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল।

সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই প্রস্তাব লইয়া আনন্দমোহনের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে, তাঁহার চিকিৎসকের সহিত এই বিষয়ে পরামর্শ করিলেন। চিকিৎসক তাঁহার অভিমত জানাইলেন,—যদি আনুসঙ্গিক ব্যবস্থা ও সতর্কতা লওয়া যায় তাহা হইলে, তিনি এই উৎসবে যোগদান করিতে পারেন।

আনন্দমোহন রুগ্ন শয্যাতেই তাঁহার বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়াছিলেন; কিন্তু স্বয়ং পাঠ করিবার সমর্থ তাঁহার ছিল না। সুতরাং সভাস্থলে উহা পাঠ করিবার ভার পড়িল সুরেন্দ্রনাথের উপর। আনন্দমোহনকে 'ইন্‌ভ্যালিড চেয়ারে' করিয়া 'বন্দে মাতরম্‌' ধ্বনির সহিত সভাস্থলে আনয়ন করা হইল। সমগ্র বিরাট জনতা দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিল। প্রথমে স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় বঙ্গব্যবচ্ছেদের তীব্র সমালোচনা করিয়া বক্তৃতা করিলেন। তাহার পর সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহনের প্রস্তুত বক্তৃতাটি পাঠ করিলেন। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সুস্পষ্ট ও উচ্চ কণ্ঠের প্রভাবে দর্শকগণের শেষ পংক্তির ব্যক্তিও পরিষ্কার ভাবে সমগ্র বক্তৃতাটি শ্রবণ করিতে পারিয়াছিলেন।

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে স্যর আশুতোষ চৌধুরী নিম্নলিখিত ঘোষণাটি ইংরাজীতে পাঠ করেন, এবং তাহার বঙ্গানুবাদ তৎপরে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক পঠিত হয়।

"যেহেতু সরকার বাঙালী জাতির সার্ব্বজনীন প্রতিবাদ সত্ত্বেও—বঙ্গব্যবচ্ছেদ ঘটাইতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তজ্জন্য আমরা এতদ্দ্বারা অঙ্গীকার ও ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদেব প্রদেশের এই ক্ষতিকারক অঙ্গচ্ছেদের প্রতিরোধ করিতে এবং আমাদের জাতির অখণ্ডতা বজায় রাখিতে আমরা সমষ্টিগত ভাবে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইব। ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন!"—আনন্দমোহন বসু।

পরে অবশ্য তাঁহারা অবগত হইবার অবকাশ পাইয়াছিলেন যে, এই ধরণের ঘোষণাপত্র প্রচার সাধারণের অধিকার বহির্ভূত; এবং সরকারই এইরূপ ঘোষণা প্রচারের অধিকারী। কিন্তু সে যাহা হউক, সে সময় ব্যঙ্গব্যবচ্ছেদে সার্ব্বজনীন প্রতিবাদ ও সেই সূত্রে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের আচ্ছেদ্যবন্ধনেব অমর স্মৃতির অবদানস্বরূপ এই উৎসবটি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সরকারের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদের এক চিরস্মরণীয় নিদর্শন রক্ষাই ছিল এই মিলন-মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য।

কুটীর-শিল্পের প্রথম পরিকল্পনা ও সেই সূত্রে বাগবাজারের জনসভায় অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা

সেই শুভদিনে বাগবাজারের স্বনামখ্যাত রায় পশুপতি বসুর সুবিশাল প্রাসাদ-অঙ্গনে আর এক জনসভার অধিবেশন ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় কুটীর-শিল্পের প্রসার ও তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠাকল্পে অর্থ সংগ্রহ। এই প্রচেষ্টার প্রাথমিক পরিচয় বঙ্গের শিল্প বাণিজ্যের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করিবার বিষয়। কেন না, যে কুটীর-শিল্পেব প্রয়োজনীয়তা আজ দেশের বিচক্ষণ অর্থ-নীতিকগণ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার তাহার সমর্থন ও সহায়তায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, বহু বৎসর পূর্ব্বে আলোচ্য বঙ্গভঙ্গ-প্রসূত-আন্দোলনের সময়—বিজ্ঞ মণীষী সুবেন্দ্রনাথের চিন্তাশীল মস্তিষ্কেই প্রথম তাহা পরিকল্পিত হইয়াছিল।

মিলনমন্দিরের ভিত্তিস্থাপনোৎসব সুশৃঙ্খলসমারোহে সম্পন্ন হইলে সমবেত বিপুল জনতা নগ্নপদে উচ্ছ্বসিত আবেগে বাগবাজারের বিশাল সভাস্থলে উপনীত হইলেন।

যথাসময়ে সুরেন্দ্রনাথ সদলবলে সভায় দর্শন দিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন শুর আশুতোষ চৌধুবী, জে, চৌধুবী, অম্বিকাচরণ মজুমদাব এবং কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। বিশাল প্রাঙ্গন তখন জনপূর্ণ, সর্ব্বজনা-কাঙ্ক্ষনীয় সুরেন্দ্রনাথকে দেখিবামাত্র সেই জনসমুদ্র যেন কল্লোলিয়া উঠিল। দেশনেতা সুরেন্দ্রনাথেব জয়নিনাদে আকাশ বাতাস চমকিত! সেই বিপুল জনতা অতিক্রম করিয়া নেতৃবৃন্দের অগ্রসব হইবার উপায় নাই, পথ নাই; সকলের অপেক্ষা অধিক সঙ্কট সুরেন্দ্রনাথের। জনতাব সকলেই তাঁহার চরণ ধূলির প্রার্থী। সুবেন্দ্রনাথের বন্ধুবর্গ অনেক কষ্টে সেই বিপুল জনপ্রবাহের দুর্ব্বার আবর্ত্ত হইতে তাঁহাকে মুক্ত কবিতে সক্ষম হইলেন। নচেৎ তাঁহাকে পিসিয়া ফেলিত। সেইদিনের সে দৃশ্যের সম্বন্ধে তখনকার একখানি দৈনিক পত্রে নিম্নলিখিত বর্ণনাটি বিবৃত হইয়াছিল ঃ—

"সুরেন্দ্রনাথের বন্ধুগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টিত জনতার কবল হইতে মুক্ত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সকলে বিফল হইলেন। জনতার জনসাধারণের মর্ম্মস্পর্শী আকুল উচ্ছ্বাস,—'তাহারা সকলে বহুদূর হইতে অভুক্ত অবস্থায় আসিয়াছে,—শুধু তাহাদের আকাঙ্ক্ষা একবার সুরেন্দ্রনাথকে দর্শন ও তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ।' যখন সভান্তে গৃহে ফিরিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ বাহির হইলেন, তখন পুনরায় সেই বিপুল জনস্রোত প্রবাহিত হইয়া দেখিতে দেখিতে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল। সে সময় আলিপুরের প্রবীণ সরকারি উকিল দেবেন্দ্রনাথ ঘোষের শকট জনতাসান্নিধ্যে উপস্থিত ছিল। দেবেন্দ্রনাথ সেই উদ্বেলিত জনসমুদ্র-বক্ষে জননেতার সঙ্কটসঙ্কুল অবস্থা দেখিয়া কোনও প্রকারে তাঁহাকে শকট মধ্যে তুলিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"

সভাক্ষেত্রে আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সত্তর হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়া গেল। এই সংগৃহীত অর্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানের সমষ্টিতে পূর্ণ হইয়াছিল। এই সাহায্য আসিয়াছিল বাঙলার সুবৃহৎ গৃহস্থ ও মধ্যবৃত্ত সমাজের নিকট হইতে। রাজা মহারাজাগণও অবশ্য সাহায্য করিয়াছিলেন; কিন্তু উহার পরিমাণ অল্প। এই সংগৃহীত অর্থ বয়ন ও কুটীর-শিল্পের উন্নতির পরিকল্পে ব্যয় করা স্থিরীকৃত হয়।

এই সংগৃহীত অর্থ প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনবৃত্তে লিখিয়াছেন,—"বস্ত্রশিল্পের উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার জন্য সে সময় বয়ন বিদ্যালয় খোলা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার কার্য্য আশানুরূপ হয় নাই। সেইজন্য বয়ন বিদ্যালয়ে অর্থ সাহায্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।" আমাদের মনে হয়, এ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত পরিচালকদের অভিজ্ঞতার অভাবেই এই শিল্প বিদ্যালয় আদর্শ শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবার অবকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। সুরেন্দ্র-নাথ তাঁহার আত্মজীবনচরিতে ইহাও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন যে,—অবশিষ্ট অর্থ এক 'ট্রাষ্টির' তত্ত্বাবধানে ইম্পিরীয়্যাল ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা হয় ও সেইভাবেই আছে এবং এই অর্থের বাৎসরিক সুদ হইতে মাননীয়া লেডী কারমাইকেলের প্রতিষ্ঠিত হোম ইণ্ডাসট্রিজ এসোসিয়েশনে এবং

ভারতীয় মহিলাদের শিক্ষা দিবার জন্য অন্যান্য শিল্প বিদ্যালয়ে মাসিক সাহায্য বরাদ্দ করা হইয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গে স্যর ব্যামফাইল্ড ফুলারের নীতি

এই সময় স্যর ব্যামফাইল্ড ফুলার বিচ্ছিন্ন পূর্ব্ববঙ্গের মসনদে অধিষ্ঠিত হইয়া কঠোর শাসননীতি অবলম্বনে রাষ্ট্র-শাসনে ব্রতী। অপরিণত বুদ্ধি ও অপ্রকৃতিস্থ মস্তিস্ক পরিচালনা পূর্ব্বক এই দাম্ভিক শাসনকর্ত্তার রূঢ় ব্যঙ্গবাণী বঙ্গের আকাশ বাতাস বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল, বাঙ্গালী স্তব্ধ বিস্ময়ে এই শাসকের মর্ম্মোচ্ছ্বাস শুনিলেন,—"হিন্দু এবং মুসলমান তাঁহার দুই পত্নী। তিনি তাঁহার মুসলমান পত্নীটির প্রতিই সমধিক প্রীতি সম্পন্ন।" এইরূপ অসম্মানকর ব্যঙ্গোক্তির প্রয়োগ তাঁহার ন্যায় দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তির পক্ষে কতদূর ন্যায় সঙ্গত হইয়াছিল, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার এই উক্তির পূর্ণ প্রভাব পড়িয়াছিল—তাঁহার অধীনস্থ ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের উপর। সুতরাং তাৎকালীন সিবিলিয়ানগণ পূর্ব্ববঙ্গেশ্বরের ব্যঙ্গোক্তির ইঙ্গিত গ্রহণ ও তাহার অনুসরণ পূর্ব্বক যথাযথ ব্যবহারে মোটেই উদাসীন হন নাই।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন,—"যে শাসনকর্ত্তা প্রকাশ্যেই এভাবে অবমাননা জনক অসংযত বঙ্গোক্তির স্পর্দ্ধা করিতে পারেন, তিনি তথাকথিত উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য, ইহাতে ভুল নাই।"

যাঁহারা এই সময়ের আইন-আদালতের আখ্যায়িকার সহিত পরিচিত বা তাৎকালীন সংবাদপত্র নিয়মিত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই অবগত আছেন যে, পূর্ব্ববঙ্গের এই ছোটলাটের আমোলে ইংরেজের ন্যায়ধর্ম্মানুসৃত শাসন যন্ত্র এই শাসকের ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হইয়া সে সময় কত প্রহসনেরই সৃষ্টি করিয়াছিল! দুর্ভাগ্যক্রমে সিবিলিয়ান বিচারকগণও তৎকালে তাঁহাদের ভাগ্যবিধাতা স্যার ফুলারের অবলম্বিত নীতির দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ করিয়াই শাসন কার্য্য সম্পন্ন করিতে বাধ্য হইতেন। কিন্তু ইংরেজের ধর্ম্মাধিকরণ হাইকোর্ট চিরদিনই বিচার-

পদ্ধতির চিরাচরিত বিশুদ্ধ ও অপক্ষপাতিতায় ন্যায়ের পরিপোষক—বিধির মর্য্যাদা রক্ষায় অচল, অটল!—আপীল প্রসঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের কোনও বিচারালয়ে অনুষ্ঠিত আইন ও বিচারগত অনাচারের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া এই সময় কলিকাতার হাইকোর্টের ন্যায়নিষ্ঠ বিচক্ষণ বিচার-পতিগণ প্রথম শিহরণ তুলিলেন !

১৯০৭ সালের কুমিল্লার দাঙ্গা সম্পর্কে এই মামলা আইন-আদালতের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে। দাঙ্গা সম্পর্কে এই মামলার সৃষ্টি এবং দাঙ্গাকারী বলিয়া কতিপয় হিন্দু আসামী শ্রেণীভুক্ত হয়, কিন্তু বিচারকার্য্য সাম্প্রদায়িকতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সম্পন্ন হইবার অবকাশ পায়। ফলে আসামী হিন্দুগণ দণ্ডিত হয় এবং দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে কলিকাতার হাইকোর্টে আপীল উপস্থাপিত হইলে হাইকোর্টের বিচারপতিগণ আসামীদের কারাদণ্ড রহিত করিয়া এই মর্ম্মে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করেন।—

"এই মামলার সাক্ষীগণের জবানবন্দী সম্বন্ধে সম্প্রদায়গত পার্থক্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিজ্ঞ বিচারকের পক্ষপাতিতা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। মুসলমান বলিয়া এক পক্ষের সাক্ষ্য যে ভাবে গৃহীত হইয়াছিল, পক্ষান্তরে হিন্দু সাক্ষীদের সম্বন্ধে সেইরূপ ঔদাসীন্য প্রকাশ পাইয়াছিল। বিচারকের উচিত ছিল, সম্প্রদায়-বিশেষের প্রতি সহানুভূতি সূচক ধারণা বর্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে উপস্থাপিত প্রমানের উপর নির্ভর করিয়া বিচার নিষ্পত্তি করা।"

বিচারপতিদের মন্তব্যের ভাষা অত্যন্ত তীব্র হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কেবলমাত্র জাতি বিশেষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করাই যদি পূর্ব্ববঙ্গের নবপ্রতিষ্ঠিত সরকারের একমাত্র দোষ হইত, তাহা হইলে তত ক্ষোভের বিষয় হইত না; কিন্তু বঙ্গবিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ দমননীতি এমন তীব্রগতিতে চালান হয়,—যাহার ফলে সরকারকে দারুণ অসুবিধায় এবং জটিল অবস্থায় উপনীত হইতে হইল।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উন্মুক্ত রাজপথে জন সভায় এবং সাধারণ সভায় উচ্চারিত করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

এইবার মিলিটারী পুলিশ শান্তিপূর্ণ স্থানে স্থাপন করা হইল। তাহার ফলে হিন্দু জাতির সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ নানাভাবে অসুবিধায় পড়িলেন, সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের চিত্তে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। স্বদেশী ইস্তাহার প্রকাশ করার অজুহাতে দেশের সম্মানীয় অধিবাসীদের উপর রাজোদ্রোহের অভিযোগ আনয়ন করা হইল। এই কারণেই এই সময় বরিশালের সম্মানীয় এবং দেশবরণ্য নেতা অশ্বিনী কুমার দত্ত মিষ্টার জ্যাকের এজলাসে অভিযুক্ত হইলেন। অভিযোগটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ছিল। এজন্য অশ্বিনী বাবু দেওযানী আদালতে পাল্টা অভিযোগ করিয়া ক্ষতিপূরণ পাইলেন। এই প্রকারের চণ্ডনীতির পদ্ধতি চরমে পৌছিল যখন বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভ্যগণের উপর পুলিস বেপরোয়া অত্যাচার করিয়া বসিল! এই ঘটনা ঘটে ১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে। ইহা যেমন চমকপ্রদ, তেমনই মর্ম্মস্পর্শী।

বরিশালের সম্মেলনে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি সম্বন্ধে নিষ্পত্তি

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার কয়েকজন বন্ধু সমবিব্যহারে প্রাদেশিক সম্মিলনীর কয়েক দিবস পূর্ব্বে ঢাকায় গমন করেন। উদ্দেশ্য ছিল সেখানকার কর্ম্মীসঙ্ঘের সহিত সম্মিলনীর কার্য্য-পদ্ধতির কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা। সেখানকার কার্য্য শেষ করিয়া তাঁহারা ষ্টীমারযোগে বরিশালে রওনা হন। সন্ধ্যায় তাঁহারা বরিশালে উপনীত হইয়া দেখেন যে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের প্রতিনিধিগণ পূর্ব্বাহ্ণে আসিয়া পৌছিয়াছেন; কিন্তু তীরে অবতণ করেন নাই—জাহাজেই অবস্থান কবিতেছিলেন। কারণ, অবতরণের পূর্ব্বে কয়েকটি বিষয়ের সমাধান হওয়া তাঁহারা অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, এবং উহা সুরেন্দ্রনাথের পরামর্শ অনুসারে নিষ্পত্তি করা স্থির করেন। ব্যাপারটি ছিল এই, ববিশালেব রাজপথে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি নিষিদ্ধ করা হয়; এবং ববিশালের প্রাদেশিক সম্মেলনের নেতাগণ স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের সহিত এইরূপ একটি সর্ত্তে আবদ্ধ হইয়াছিলেন যে—"প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগ-দানের জন্য সমাগত নেতা বা প্রতিনিধিগণের অবতরণ কালে অথবা

উন্মুক্ত রাজপথে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করিতে পারিবেন না।" অবশ্য এই প্রকারের আদেশ প্রদান যে সম্পূর্ণ অবৈধ, তাহাতে সন্দেহ ছিল না।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন—"আমরা এই প্রকারের আদেশকে অবৈধ বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম; অধিক আমরা এ সম্বন্ধে উপযুক্ত আইনজ্ঞের মত লইতে ত্রুটি করি নাই। এই আদেশ পূর্ব্ববঙ্গের কর্তৃপক্ষের কল্পনা প্রসূত ও বিধি বহির্ভূত জানিয়া আমরা তাহা শিরোধার্য্য করিতে পারিলাম না। আত্মসম্মান এই আত্মসমর্পণে বাধা দিল। কিন্তু বরিশালের নেতাগণ পূর্ব্বাহ্নেই কর্তৃপক্ষের সহিত এইরূপ সর্ত্তে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। প্রতিনিধিগণের মধ্যে যুবক এবং উগ্রপন্থীগণ এই সর্ত্তকে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিবার স্বপক্ষে ছিলেন।"

যাহা হউক সকলের সম্মতিক্রমে একটি মীমাংসা করিয়া লওয়া হইল। সুরেন্দ্রনাথ যুক্তি দেখাইলেন, যেহেতু বরিশালের অধিবাসীগণ তাঁহাদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন, এবং তাঁহারা উহাঁদের অতিথি; সুতরাং এক্ষেত্রে অতিথিদের এমন কোন কাজই করা যুক্তিযুক্ত হইবে না যাহার দ্বারায় আমন্ত্রণকারিদের কোনপ্রকার অসুবিধায় পড়িতে হয়। কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আমন্ত্রণকারিদের বিধিবদ্ধ সর্ত্তের অসম্মান করা উচিত নহে। তবে ইহা স্থির হয় যে নেতাদের অবতরণ কালে অথবা রাজপথে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করা হইবে না বটে, কিন্তু সম্মিলনীর সভামণ্ডপে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিবার কোন বাধাই থাকিবে না; কেন না, কর্ত্তৃপক্ষের সহিত বরিশালবাসীর স্থিরীকৃত সর্ত্তে এ বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই।

এই বিষয়টি নিষ্পত্তি হইবার পর সন্ধ্যার পরে প্রতিনিধিগণ তীরে অবতরণ করেন।

বরিশালে প্রাদেশিক সম্মিলনী

১৪ই এপ্রিল ১৯০৬ সালে শনিবার দিন প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশন আরম্ভ হইবার দিন স্থির হয়। সেইদিন প্রাতে লাকুটিয়ার

জমিদার শ্রীযুত বিহারী লাল রায়ের আবাস ভবনে একটি পরামর্শ সভা বসে। সুরেন্দ্রনাথ এই স্থানেই অবস্থান করিতেছিলেন। প্রধান প্রধান প্রতিনিধিগণ এবং এন্টি সারকুলার সোসাইটির প্রতিনিধি এই সভায় যোগদান করেন। এন্টি সারকুলার সোসাইটি শ্রীযুত কৃষ্ণ কুমার মিত্রের সভাপতিত্বে এবং শ্রীশচীন্দ্র প্রসাদ বসুর সম্পাদকতায় তখন স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল, বঙ্গীয় সরকার বাঙ্গলা দেশের ছাত্রদের চিত্তাকর্ষণ পূর্ব্বক যে সকল ইস্তাহার প্রচার কবিতেছিলেন, তাহার বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা। তাঁহারা একদল স্বেচ্ছাসেবক গঠন করেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই যুবক এবং তাঁহারা স্বদেশের সেবায় আত্মোৎসর্গপরায়ণ।

এই সভায় স্থির হয় যে, সমাগত প্রতিনিধিগণ প্রথমে রাজার হাবেলি নামক স্থানে সমবেত হইবেন; পরে তথা হইতে শ্রেণীবদ্ধভাবে শোভাযাত্রা করিয়া সম্মেলনের 'প্যাণ্ডাল' অভিমুখে রওনা হইবেন এবং সেই সঙ্গে সমস্ত পথটি 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করিতে করিতে যাওয়া হইবে। অবশ্য ইহাও অনুমান করা হয় যে সম্ভবতঃ পুলিশ এই শোভা-যাত্রায় হস্তক্ষেপ করিবে, এমন কি বল প্রয়োগ করিতেও দ্বিধা করিবে না; কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতাগণ একবাক্যে অভিমত প্রকাশ করেন যে, নির্য্যাতনসূত্রে ক্রোধোদ্রেকের শতকারণ ঘটিলেও প্রতিনিধিগণ যেন তৎপরিবর্ত্তে প্রতিশোধ গ্রহণের কোনরূপ প্রচেষ্টা না করেন, অথবা তাঁহারা সঙ্গে কোন প্রকার লাঠি, এমন কি সাধারণ ছড়ি পর্য্যন্ত না লয়েন।

এই প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন,—

"প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবি শ্রীযুক্ত বি, সি, চট্টোপাধ্যায় আমাকে প্রশ্ন করেন—'আমি কি সঙ্গে বেড়াইবার ছড়িটি পর্য্যন্ত লইতে পারিব না?' আমি তৎক্ষণাৎ আবেগভরে বলিয়াছিলাম—নিশ্চয় নয়, বেড়াইবার ছড়ি পর্য্যন্ত লওয়া চলিবে না। আমবা সকলেই এই নির্দ্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন কবিয়াছিলাম।"

পুলিশ কর্ত্তৃক শোভাযাত্রা আক্রান্ত

বেলা ঠিক দুই ঘটিকার সময় শোভাযাত্রা বাহির হইবে, ইহাই স্থির ছিল। সুরেন্দ্রনাথ অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। সম্মেলনেব সভাপতি মিঃ রসুল এবং মিসেস রসুল (ইনি একজন ইংরাজ মহিলা) একখানি শকটারোহণে অগ্রগামী হইলেন। সুরেন্দ্রনাথ, মতিলাল ঘোষ (অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক), ভূপেন্দ্রনাথ বসু শোভাযাত্রার প্রথম পংক্তিতে চলিলেন। যুবকগণ পশ্চাতে রহিলেন। পুলিশবাহিনী রেগুলেশন লাঠি হস্তে বিশেষভাবে সজ্জিত ছিল। একজন সহকারী পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট ঘোড়ায় চড়িয়া টহল দিতেছিলেন। কিন্তু এই সকল ব্যবস্থা করিবার কোন কারণই ছিল না। শোভাযাত্রার প্রবর্ত্তক-গণের ধারণা হইয়াছিল ইহা নিষ্প্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার। কিন্তু পুলিশের পরবর্ত্তী কার্য্যে তাঁহাদের এ ধারণা চূর্ণ হইয়া গেল।

সমগ্র মিছিলটি বিনাবাধায় সুশৃঙ্খলেই কিছুদূর অগ্রসর হইবার অবকাশ পাইল। কিন্তু তাহার শেষ ভাগটি অর্থাৎ যেখানে অ্যান্টি-সারকুলার সোসাইটির তরুণ সভ্যগণ ছিলেন—যেমন হাবেলির ভিতর হইতে বাহির হইয়া রাজপথে পদার্পন করিল, অমনি পুলিশের প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ভাবেই প্রকট হইয়া উঠিল। তাহারা অমিতবিক্রমে ছয় ফিট দীর্ঘ ও স্থূল রেগুলেশন যষ্টি হস্তে মিছিলের যুবকদলের উপর আপতিত হইয়া নির্দ্দয়ভাবে প্রহার চালাইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনিধিদের অঙ্গ হইতে 'বন্দেমাতরম্' ব্যাজ কাড়িয়া লইয়া ছিন্ন করিয়া ফেলিল। পুলিশের লাঠীতে অনেকে সাংঘাতিকভাবে আহত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে ৺ মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের পুত্র, আদর্শ কর্ম্মী ও সুবক্তা চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুবতা আক্রমণের ফলে একটি সলিলপূর্ণ পুষ্করিণীর মধ্যে পড়িয়া গেল। যদি সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে জল হইতে তুলিয়া ফেলা না হইত, তাহা হইলে তাহার অদৃষ্টে সলিল-সমাধি ঘটিত।

এ সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন ঃ—

"এই সকল যুবকগণ কোনও অপরাধই করে নাই। এমন কি পূর্ব্ব-

বঙ্গের সরকারের দারুণ বিরক্তি উৎপাদক ধ্বনি যে 'বন্দেমাতরম্', উহাও পুলিশের আক্রমণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত উচ্চারিত হয় নাই। ইহাদের অপরাধ—সাধারণের কোন ক্ষতি অথবা বিরক্তি উৎপাদন না করিয়া শোভাযাত্রা সহ রাজপথ দিয়া অগ্রসর হইতেছিল। অবশ্য পুলিশ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার পর তাহারা সতেজে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করে এবং দিক দিগন্তে মুহুর্মুহুঃ ইহার প্রতিধ্বনি হইতে থাকে। পুলিশের এই আক্রমণ এরূপ আকস্মিকভাবেই হইয়াছিল যে, তাহা কল্পনার অতীত। যদি শোভাযাত্রাকারিগণ কোন অন্যায় অথবা অপরাধ করিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের অনায়াসে গ্রেপ্তার করিতে পারিতেন; কিম্বা শোভাযাত্রাটি অবাঞ্ছনীয় মনে হইয়া থাকিলে উহা ভাঙ্গিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ যে বৈধ নীতি অবলম্বন করেন নাই আমি ইহা অবিচলিতভাবে বলিতে পারি। শুধু তাহাই নহে,—সেই সময়ে সর্ব্ব সাধারণের এই ধারণা ছিল যে,—একটি পরিকল্পনা পূর্ব্ব হইতে স্থির করা ছিল; উহা ভীতি প্রদর্শন নীতির একটি অন্যতম অংশ, যাহা ধারাবাহিক-রূপে পূর্ব্ববঙ্গের তাবৎ স্থানে প্রয়োগ করা হইতেছিল এবং কর্ত্তৃপক্ষগণ দৃঢ় আশা কবিতেছিলেন যে ইহার দ্বারায় বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে উদ্যত আন্দোলন সমূলে ধ্বংস হইয়া যাইবে। বলা বাহুল্য, এই প্রকাবের আশার কোনও সার্থকতাই নাই। দমননীতি যে শুধু এইস্থানে নিষ্ফল হইয়াছিল তাহা নহে, যেখানে যেখানে ইহা প্রয়োগ করা হইয়াছে, সকল স্থলেই ব্যর্থতা প্রমাণ করিয়াছে। বরং ইহার সহায়তায় জনশক্তির সঙ্ঘশক্তি ও দৃঢ়তা অধিকতর পরিপুষ্ট হইয়াছে এবং জনসাধারণের সঙ্কল্পকে অধিকতর সুদৃঢ় করিতে সাহায্য করিয়াছে।"

সুরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার, তাঁহার বিচার ও অর্থদণ্ড

আক্রান্ত মিছিলের পশ্চাদভাগে যখন এইভাবে পুলিশের অত্যাচার চলিতেছিল, পুরোভাগে অবস্থিত সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতৃবর্গ সে সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারেন নাই, তাঁহারা আপন মনেই অগ্রসর হইতে-ছিলেন। এই সময় ললিত মোহন ঘোষাল উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া

প্রসারিত হস্তে তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আর্ত্তস্বরে কহিলেন—'আপনারা কোথায় চলিয়াছেন? পুলিশ পিছনের প্রতিনিধিদের আক্রমণ করিয়া বেপরোয়া প্রহার করিতেছে।' ইহা শুনিবামাত্রই সুরেন্দ্রনাথ অকুস্থলের উদ্দেশে ছুটিলেন; সঙ্গে চলিলেন মতিলাল ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও অপর কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই পুলিশের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট মিঃ কেম্পের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। সুরেন্দ্র-নাথ তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন—'আপনারা আমাদের লোকজনদের প্রহার করিলেন কেন? যদি তাঁহারা কোন অন্যায় করিয়া থাকেন,—আমাকে আপনি শাস্তি দিন; আমি তাঁহাদের জন্য দায়ী। যদি আপনার ইচ্ছা হয় আমায় গ্রেপ্তার করিতে পারেন।' পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—'আপনি আমার বন্দী।' এই অবস্থায় মতিলাল ঘোষ অগ্রসর হইয়া কহিলেন—'আমাকেও তাহা হইলে গ্রেপ্তার করুন।' পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট কহিলেন,—'আমি মাত্র মিঃ ব্যানার্জ্জীকে গ্রেপ্তারের নির্দ্দেশ পাইয়াছি।' স্পষ্টই বোঝা গেল,—'সুরেন্দ্রনাথের গ্রেপ্তার পূর্ব্বকল্পিত ব্যাপার।'

সুরেন্দ্রনাথ ধৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথ বসুকে কহিলেন,—'আপনি সভায় যান ও সভার কার্য্য যাহাতে আমার অবর্ত্তমানেও যথা-যথ অগ্রসর হয়, তাহার ব্যবস্থা করুন। যেন কোনক্রমে সভা বন্ধ অথবা স্থগিত রাখা না হয়, সুরেন্দ্রনাথের আদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিপালিত হইল। যথেষ্ট বিক্ষোভ ও উত্তেজনা থাকা সত্তেও সভার কার্য্য সুশৃঙ্খলেই অগ্রসর হইল। যেন কিছু পূর্ব্বে কোনও চাঞ্চল্যকর ঘটনাই ঘটে নাই।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন,—"এতবড় একটা নিদারুণ বিক্ষোভের পর সভার অনুষ্ঠানকারীদের এই ভাবের দৃঢ়তা ও আত্মসংযমের পরিচয় বড় অল্প প্রশংসার কথা নহে। স্বায়ত্ত্ব শাসন লাভের যোগ্যতার ইহা অন্যতম নিদর্শন।"

ইতিমধ্যে সুরেন্দ্রনাথ মিঃ কেম্প কর্ত্তৃক ম্যাজিষ্ট্রেটের আবাসে নীত

হইলেন। রাস্তা হইতে একখানা ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ী সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে সেখানে লইয়া যাওয়া হয়। লাকুটিয়ার জমিদার বিহারীলাল রায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ সুরেন্দ্রনাথের সহযাত্রী হইলেন। গাড়ীর ভিতর পাঁচজন ব্যক্তির স্থান সঙ্কুলন হওয়া সম্ভব ছিল না, কেননা মিঃ কেম্পও এই গাড়ীর অন্যতম আরোহী হইয়াছিলেন। ফলে কাব্যবিশারদ মহাশয় গাড়ীর পশ্চাতে সহিসের স্থানে দাঁড়াইয়া চলিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ইমারসনের সহিত সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ,—'আমরা অতঃপর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ইমারসনের গৃহের বারান্দায় কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিতেই আমাদের ডাক পড়িল। আমরা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কামরায় প্রবেশ করিলাম; কিন্তু কাব্যবিশারদ মহাশয় যেমন দরোজার চৌকাঠটি পার হইয়াছেন, অমনি মিঃ ইমারসন চীৎকার করিয়া তাঁহাকে কহিলেন— 'বেরিয়ে যাও।' আমি বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া চাহিলাম; বুঝিলাম, কাব্য-বিশারদ মহাশয়ের প্রতি সাহেবের এই প্রকার অস্বাভাবিক ব্যবহারের হেতু কি! তাঁহার পরিধানে ছিল সাদা থান ধুতি এবং নগ্ন গাত্রের উপর ছিল একখানি উড়ুনি, উপরন্তু স্কন্ধে বিলম্বিত শুভ্র যজ্ঞোপবীত ব্রাহ্মণ্যের পরিচয়ে বরিশালের ভাগ্য বিধাতার চক্ষু ঝলসিত করিতেছিল। কাব্যবিশারদ মহাশয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কালীঘাটের প্রসিদ্ধ হালদার বংশে। কালীঘাটের হালদারগণ ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপীঠের পূজক এবং সেবাইত। সেইসূত্রে কাব্যবিশারদ মহাশয় নিষ্ঠাবান্ সদাচার সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের উপযোগী পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া স্বদেশী সভাদিতে যোগদান করিতেন এবং তিনি সাত্ত্বিক পরিচ্ছদের মধ্য দিয়া ব্রাহ্মণের এই পরিচয়টুকু সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনে প্রয়োগ করিতে প্রয়াস পাইতেন। কিন্তু এই প্রকারের বেশভূষা প্রতিনিধিরূপে সভার অধিবেশনে যোগদানের পক্ষে যতটা উপযোগী ছিল, মিঃ ইমারসনের সম্মুখে এই পরিচ্ছদে উপস্থিতি সেই পরিমাণে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল; এই কারণেই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের ধৈর্য্যচ্যুতি

ও সেই সূত্রেই তাঁহার মুখে এইরূপ রূঢ় উক্তি! কাব্যবিশারদ মহাশয় মিঃ ইমারসনের আদেশ মানিয়া লইলেন বটে, কিন্তু তিনি দ্বারের সন্নিকটেই রহিলেন; যাহাতে ঘরের ভিতরের যাবতীয় ঘটনা দেখিতে ও শুনিতে পান। অল্পক্ষণের জন্যে মিঃ ইমারসনের বসিবার ঘরখানি ধর্ম্মাধিকরণে পরিণত হইল।”

আইন ভঙ্গের অজুহাতে অভিযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ আসামী স্থলাভিষিক্ত হইয়া মিঃ ইমারসনের সম্মুখে উপস্থিত। এই প্রকারের অভিজ্ঞতা যে সুরেন্দ্রনাথের জীবনে এই প্রথম তাহা নহে। কিছুকাল পূর্ব্বে উচ্চ আদালতে—আদালতের প্রতি অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া তাঁহাকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। তবে তখনকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ছিল অন্যরূপ। ম্যাজিস্ট্রেটের ঘরে প্রবেশ করিয়া অশ্বিনী বাবু ও বিহারী বাবু অবাধে দুইখানি চেয়ার গ্রহণ করিলেন, তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া সুরেন্দ্রনাথ যেমন তৃতীয় চেয়ার খানির হাতলটি ধরিয়াছেন, অমনই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ধৈর্য্যচ্যুতি এবং সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ উক্তি—“আপনি বিচারার্থী আসামী, চেয়ারে বসিতে পাবেন না; আপনাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে।” সুরেন্দ্রনাথ ইহার উত্তরে নির্ভীক দৃঢ়স্বরে কহিলেন—“আমি আপনার বাড়ীতে অপমানিত হইতে আসি নাই। আমি আপনার কাছে ভদ্রতা ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারের প্রত্যাশাই করি।”

সুরেন্দ্রনাথের মর্ম্মস্পর্শী দৃপ্তস্বরে দম্ভের অবতার জবরদস্ত মিঃ ইমারসন স্তব্ধ! পূর্ব্ববঙ্গের একটি জেলার উদ্ধত শাসনকর্ত্তা—সমগ্র বাঙ্গলার কোটী কোটী নরনারীর আরাধ্য নেতা সুরেন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ তেজস্বিতার পরিচয় এই প্রথম পাইলেন। কোনও সহৃদয় শাসনকর্ত্তা হইলে নিজ ত্রুটি তৎক্ষণাৎ সংশোধন করিয়া লইয়া মহত্ত্ব প্রকাশ করিতেন। কিন্তু মিঃ ইমারসনের প্রকৃতি ছিল অন্য উপাদানে গঠিত; তিনি তৎক্ষণাৎ ক্রোধ-কম্পিত-হস্তে সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের নথীটি টানিয়া লইয়াই তাঁহাকে স্বপক্ষ সমর্থন করিতে

বলিলেন। সুরেন্দ্রনাথ অবশ্য নিজেকে নির্দ্দোষ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন এবং তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য কিছু সময় প্রার্থনা করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত যখন সুরেন্দ্রনাথের এ সম্বন্ধে বাদানুবাদ চলিযাছিল, তখন একজন ইংরাজ ভদ্রলোক, (পরে তাঁহার পরিচয় সুরেন্দ্রনাথ জানিতে পারেন, তিনি নোয়াখালীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লিজ) সুবেন্দ্রনাথকে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ব্যাপারটি মিটাইয়া ফেলিতে বলেন। সুরেন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ সতেজে জবাব দিলেন—"কখনই নয়। কিসের জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিব। আমি এমন কিছুই অন্যায় করি নাই, যাহার জন্য আমাকে দুঃখ প্রকাশ কবিতে হইবে।"

অতঃপর ম্যাজিষ্ট্রেট বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আনীত আইন অমান্যের অভিযোগে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার প্রতি দুইশত টাকা অর্থ দণ্ডের আদেশ দিলেন।

ইহার পর পুলিশের অভিযোগ গ্রহণ করা হইল, মিঃ কেম্প তাঁহার জবানবন্দি দিলেন। সম্ভবতঃ তিনিই এই অভিযোগের একমাত্র সাক্ষী ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি কর্ত্তৃপক্ষের অননুমোদিত শোভাযাত্রার একজন সহযাত্রী ছিলেন এবং তাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ বন্দেমাতরম্ উক্তি বারংবাব তারস্বরে কীর্ত্তন করিতেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ মিঃ কেম্পকে জেরা করিবার ও তাঁহার সাক্ষী সাবুদ উপস্থিত করিবার জন্য সময় প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু উহা অগ্রাহ্য হইল।

এই অভিযোগেও সুরেন্দ্রনাথ অপরাধী সাব্যস্ত এবং পুনরায় দুইশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন।

অর্থদণ্ড ত হইল, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তখন অর্থ ছিল না। পুলিশ-সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট মিঃ কেম্প প্রথমাবধি সুরেন্দ্রনাথের সহিত যথেষ্ট ভদ্র এবং ভব্যতাজনক ব্যবহার করিতেছিলেন, তাঁহারই সৌজন্যে সুবেন্দ্র-নাথকে আর আটক করিয়া রাখা হয় নাই, মিঃ কেম্প জবিমানার টাকা আদায় লইবার জন্য সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে বাসায চলিলেন।

প্রাদেশিক সম্মিলনের প্রথম দিনের অধিবেশন

জরিমানার অর্থ প্রদান করিয়া সুরেন্দ্রনাথ সম্মিলনে উপস্থিত হইলেন। সভার কার্য্য তখনও যথারীতি চলিতেছিল। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার সহগামী বন্ধুগণসহ সভামণ্ডপে প্রবেশ করিবামাত্র সমগ্র দর্শক-মণ্ডলী একসঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তুমুল হর্ষের সহিত বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। বাধ্য হইয়া কয়েক মিনিট যাবৎ সভার কার্য্য স্থগিত করিতে হইল। কিন্তু পূর্ব্বস্থিরীকৃত করণীয় কার্য্যগুলি পরিচালন করিবার মত মানসিক অবস্থা তখন সভায় কাহারও ছিল না। সদ্য সংঘটিত ঘটনাগুলি সকলের চিত্তকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। সমবেত সকলেই এই নিদারুণ অনাচার সম্বন্ধে আলোচনা কবিতেই একান্ত উৎসুক ; সুতরাং ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয়রূপে সভায় সর্ব্বাগ্রেই আলোচ্য বলিয়া সাব্যস্ত হইল। তৎক্ষণাৎ শ্রীযুত মনোরঞ্জন গুহ তাঁহার আহত পুত্র শ্রীমান চিত্তরঞ্জন গুহকে লইয়া মঞ্চের উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চিত্তরঞ্জনের ললাটের ব্যাণ্ডেজ পুলিশের নিষ্ঠুর প্রহারের পরিচয় দিতেছিল। মনোরঞ্জন বাবু সমাগত প্রতিনিধিগণকে চিত্তরঞ্জনের প্রতি পুলিশের অমানুষিক অত্যাচারের বিবরণ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উদাত্তস্বরে বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। জননেতা মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা স্বদেশীযুগে সুবক্তারূপে প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অতুলনীয় তেজোদৃপ্ত ভাষায় শোভাযাত্রা আক্রমণ ও পুলিশের নির্য্যাতন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত হইয়া দর্শকগণকে স্তব্ধ করিয়া ফেলিল। পুলিশ রেগুলেশন লাঠি হস্তে চিত্তরঞ্জনকে আক্রমণ করে, এবং তাহাব ফলে আহত হইয়া সে একটি পুষ্করিণীর জলে পড়িয়া যায়, আহত তরুণের এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা উপলব্ধি করিয়াও পুলিশ প্রহারে বিরত হয় নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাই যে, চিত্তরঞ্জন কোন প্রকার বাধা দিবার প্রচেষ্টা করে নাই, বরং পুলিশের লাঠির তালে তালে পুনঃ পুনঃ সে তারস্বরে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া অসামান্য সহিষ্ণুতার পরিচয় প্রদান করে। এইরূপ একটি

নিষ্ঠুর অত্যাচারের প্রতিনিরোধ কল্পে এই প্রকারের অহিংস আত্মসমর্পণ এক অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতার নিদর্শন। মঞ্চের উপর পিতাপুত্রের পাশাপাশি দণ্ডায়মান অবস্থা ও তাঁহাদের মর্ম্মস্পর্শী অভিভাষণ সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। আবেগভরে পিতার সমস্ত ঘটনাটি বর্ণনা এবং আহত পুত্রের তাহার প্রত্যক্ষ সাক্ষীরূপে সারা অঙ্গের প্রহার চিহ্ন প্রদর্শন—সে দিনের সভায় সেই দৃশ্যটি চিরস্মরণীয়। এই দৃশ্যটি পরে ক্যানভাসের উপর অঙ্কিত করা হয় এবং ১৯০৬ সালে মিণ্টো কর্ত্তৃক উদ্ঘাটিত কলিকাতা একজিবিসনে একখানি জনপ্রিয় আলেখ্যরূপে সমাদর লাভ করে।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে সম্মিলনের প্রথম দিনের অধিবেশন সাঙ্গ হইল। সভায় সমবেত প্রতিনিধিগণ সভাভঙ্গের পর আবাসভবনে প্রত্যাবর্ত্তনকালে শ্রদ্ধাভরে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। বরিশালের রাজপথ সেই গুরু গম্ভীর আবাবে মুখরিত হইয়া উঠিল, পুলিশ বাহিনী এবার আর এখানে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করিল না। কিন্তু ইহার প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইল পর দিনের সভায়।

সম্মিলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন
অসময়ে পুলিশ কর্ত্তৃক সভাভঙ্গ বিবরণ

পূর্ব্ববঙ্গের সরকার যে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ নিষিদ্ধ বলিয়া ইস্তাহার জারী করিয়াছেন, প্রতিনিধিগণ সেই ধ্বনি উচ্চারণে রাজপথ প্রকম্পিত করিয়া চাঞ্চল্য তুলিয়াছেন; সুতরাং ইহার প্রতিবিধান অবশ্যম্ভাবী। পরদিন যথা সময় সম্মেলনীর অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে এবং যথারীতি সভার কার্য্য চলিয়াছে, এমন সময় ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কেম্প প্যাণ্ডেলে প্রবেশ করিলেন। তিনি সরাসরি মঞ্চের নিকট গিয়া সভাপতিকে বলিলেন—হয় সভা এখনি ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে, নতুবা এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে সভা অন্তে প্রতিনিধিগণ রাজপথে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করিবেন না। সভাপতি মহাশয় প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনা করিবার পর এই প্রকারের প্রতিশ্রুতি প্রদানে অস্বীকৃত হইলেন। অতঃপর মিঃ কেম্প ম্যাজিষ্ট্রেটের লিখিত আদেশটি পাঠ

করিলেন। উহাতে ১৪৪ ধারা মতে সভা ভাঙ্গিয়া দিবার আদেশ ছিল। আবার এক বিষম বিক্ষোভের ঝড় যেন সভার উপর হুঙ্কার তুলিয়া উপস্থিত! প্রতিনিধিগণ এই আদেশ মানিতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। মিঃ জে চৌধুরী এবং অন্যান্য নেতাগণ কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচার মূলক প্রভাব উপলব্ধি করিয়াই এই আদেশ এভাবে উপেক্ষা করিতে নিষেধ করিলেন।

নেতৃবর্গের নির্দ্দেশ সভায় সমবেত প্রতিনিধি ও সভ্যগণ অবহেলা করিতে পারিলেন না; অবশেষে স্বীকৃত হইলেন। এই প্রসঙ্গে সুরেন্দ্র-নাথ লিখিয়াছেন,—'সে সময় নেতৃগণের উপর জনসাধারণের ছিল প্রগাঢ় আস্থা, তাঁহাদের আদেশবাণী তাহারা দৈববাণীর মত শ্রবণ করিত। এই আদর্শ নিয়মানুবর্ত্তিতা ও অবিচলিত ভাবে নেতাদের আদেশ পালনে আন্তরিকতাই তাৎকালীন স্বদেশী আন্দোলনকে সহজে সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারিয়াছিল।'

প্রতিনিধিগণ তৎক্ষণাৎ নিজ নিজ আসন পরিত্যাগ করিয়া সারিবদ্ধ ভাবে বরিশালের রাজপথে বাহির হইয়া পড়িলেন। বলাবাহুল্য, সভা তাঁহারা ভঙ্গ করিয়া উঠিলেন, কিন্তু 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণে বিরত হইলেন না। রাজপথে প্রত্যেকের মুখের ধ্বনি—'বন্দে মাতরম্'। এই সূত্রে আর একটি উল্লেখযোগ্য কাহিনীও অপরিহার্য্য। সভাস্থল হইতে অন্যান্য সকলে নিষ্ক্রান্ত হইযা গেলেন, কিন্তু সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁহাব আসনে স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন; উত্তেজনাজনিত নিদারুণ বিক্ষোভে তাঁহার সমগ্র মুখমণ্ডল তখন আরক্তিম। কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য পূর্ব্বক তাহার চবম পরিণতির জন্য তিনি যেন প্রস্তুত হইয়াই একাকী সভায় আসীন থাকিতে বদ্ধপরিকর। অবশেষে সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতাগণ বহু অনুনয়, বিনয় ও সাধ্য সাধনার পর অতিকষ্টে তাঁহার এই দৃঢ়তাভঙ্গ করিয়া প্যাণ্ডেলের বাহিরে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এখন সমস্যা হইল সম্মিলনে সমাগত মহিলাদের লইয়া। এই সময়

হইতেই স্বদেশী সভাসমূহে মহিলাদের সমাগম আরম্ভ হয় এবং বরিশালের এই আলোচ্য সম্মিলনে বহু ভদ্র মহিলাই যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সংখ্যা সর্ব্বসমেত তিন শতেরও অধিক। বৈশাখের প্রখর রৌদ্রতপ্ত মধ্যাহ্নে এই ভাবে ত হঠাৎ হইল সভার সমাপ্তি ; অধিকাংশেরই যানবাহন তাঁহাদের সভায় পৌছাইয়া দিয়া ফিরিয়া গিয়াছে, সায়াহ্নে পুনরায় সভাভঙ্গের নির্দ্ধারিত সময়ে আসিবার কথা। এখন এতগুলি ভদ্রমহিলা এই অসময়ে মধ্যাহ্নের তীক্ষ্ণ রৌদ্র মাথায় করিয়া কি পদব্রজে গৃহে ফিরিবেন, অথবা প্যাণ্ডেলের মধ্যেই সায়াহ্ন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন, এই লইয়া একটা অলোচনা আরম্ভ হইল। অবশেষে সাব্যস্ত হইল, পরিত্যক্ত সভামণ্ডপে প্রতীক্ষা করা অপেক্ষা পদব্রজেই গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন শ্রেয়ঃ। সুরেন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে মহিলাদের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন,—'মেয়েদের এই আত্মত্যাগ অবহেলার বিষয় নয়। কারণ তখনকার দিনে বাঙ্গলার কুলললনাদের পক্ষে এই ভাবে প্রকাশ্য পথে পদব্রজে গমন করা তাঁহাদের প্রকৃতি, সঙ্কোচ ও চিরাচরিত অভ্যাসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল।'

প্যাণ্ডাল হইতে নেতাগণেব মধ্যে অনেকেই বরিশালের বিশিষ্ট উকীল শ্রীযুত রজনীকান্ত দাসের গৃহে উপস্থিত হইলেন। বিক্ষুব্ধ জনগণও তাঁহাদের অনুগমনে ক্ষান্ত হন নাই। সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যেই সেখানে বিপুল জনসমাগমে একটি বিরাট সভার সৃষ্টি হইল। সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল এবং কাব্যবিশারদ মহাশয় সেই সভায় জনতার উদ্দেশে আবেগময়ী ভাষায় জনসাধারণের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিলেন,—সর্ব্বান্তঃকরণে তোমরা স্বদেশ সেবায় ও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনায় ব্রতী হও। স্বদেশ সেবার মন্ত্র হউক তোমাদের জীবনের মূল মন্ত্র। এই মন্ত্র পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও।

স্বদেশী মন্ত্র ও সেই মন্ত্র রচয়িতা ঋষি

স্বদেশী আন্দোলন সূত্রে স্বদেশীয় দ্রব্যের প্রচারে যে প্রতিজ্ঞাবাণীর প্রভাব মন্ত্রশক্তির মত কার্য্য করিয়াছিল, তাহা 'স্বদেশী মন্ত্র' নামে

পরিচিত। এই মন্ত্রের ঋষি সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং। দৈবনির্দ্দেশেই যেন এক জনসভায় এই মন্ত্রবাণী বঙ্গের এই রাজনীতিক মহাঋষিটীর মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত হইয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সূচনায় ই, আই, রেল পথের মগরা ষ্টেশনের সান্নিধ্যে একদা তিনি এক জনসভায় বক্তৃতাদানে আহুত হইয়াছিলেন। মগরার এই সভাস্থলেই বক্তৃতা দিবার সময় এই প্রতিজ্ঞা মন্ত্রের পরিকল্পনা সহসা তাঁহার মনে বিকাশিত হইয়া উঠে।

এ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন,—'সভার অধিবেশন হইয়াছিল একটি মন্দিরের প্রাঙ্গনে। আমার ঠিক সম্মুখে অধিষ্ঠিত মন্দিরের বিগ্রহ। পারিপার্শ্বিক সুপবিত্র আবেষ্টনে সমস্ত সভাস্থলে এক অনির্ব্বচনীয় শান্ত মধুর গাম্ভীর্য্যভাব, চারিধারেই যেন স্বর্গীয় পবিত্রতা বিদ্যমান। আমার দৃষ্টি তখন মন্দির মধ্যে বিগ্রহের প্রতি নিবদ্ধ; বিগ্রহ দর্শনে চিত্ত যেন আমার চরিতার্থ, মনে এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাবের প্রবাহ বহিল, সঙ্গে সঙ্গে আমি এক অপূর্ব্ব প্রেরণা অনুভব করিয়া ভাবাবেশে সভায় সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে দণ্ডায়মান হইয়া একটি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। দেব বিগ্রহের সম্মুখে এই ত্যাগের মন্ত্রটি শপথ সহকারে লইতে বলিলাম। আমার এই অনুরোধ শুনিবামাত্র সমগ্র দর্শকমণ্ডলী যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত দণ্ডায়মান হইয়া সমস্বরে আমার মুখ হইতে উচ্চারিত সেই মন্ত্রটির পুনরাবৃত্তি করিলেন। সেই প্রতিজ্ঞা-মন্ত্রটি এই:—

"জগদীশ্বরের নাম লইয়া আমাদের সন্তান সন্ততিদের সম্মুখে এই পবিত্র প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতেছি যে আজ হইতে যতদূর সম্ভব স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিব এবং বিদেশী সামগ্রীর ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিব। ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন।"

আমি এই প্রতিজ্ঞাটির সম্বন্ধে পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত চিন্তা করি নাই। ইহা সম্পূর্ণই স্থানের আবেষ্টনের ফলে আকস্মিক ভাবে মনে জাগরিত হয় এবং প্রায় ১০।১৫ হাজার ব্যক্তি একই প্রকার প্রেরণায় চালিত হইয়া একসঙ্গে দণ্ডায়মান হইয়া যখন এই পবিত্র প্রতিজ্ঞাটি গ্রহণ করেন, সে

মহান দৃশ্য লিখিয়া বুঝান অপেক্ষা কল্পনাতেই অধিক পরিস্ফুট হইবে। ইহার পর এই মন্ত্রটি ধর্ম্মানুষ্ঠানেব অন্যতম অঙ্গরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। পুরোহিতগণ যজমান গৃহে পূজার উপচারে বিদেশী সামগ্রী দেখিলে পূজা অর্চ্চনায় ব্রতী হইতেন না; বিলাতী কাপড়, বিলাস সম্ভার, চিনি, লবণ প্রভৃতি সমস্তই ধর্ম্মসংক্রান্ত অনুষ্ঠানে অস্পৃশ্যরূপে পরিবর্জ্জিত হইয়াছিল। দেশাত্মবোধ ধর্ম্মান্দোলনকে উদ্দীপিত করে, সুতরাং স্বদেশিকতার এই মন্ত্র ধর্ম্মের সহিত বিজড়িত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতীকরূপে অখণ্ড প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।"

সাহিত্য সম্মিলনের সভা স্থগিত

প্রাদেশিক সম্মিলনীর পরদিবস, বরিশালে একটি সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশন হইবার কথা ছিল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা হইতে ইহাতে যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু সরকার কর্ত্তৃক প্রাদেশিক সম্মিলন ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ফলে প্রতিবাদ স্বরূপ সাহিত্য-সভার অধিবেশন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। বিশ্বকবি, শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ বসুর সহিত কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

রহমতপুরে সভা এবং পুলিসের নিষ্ফলতা

প্রাদেশিক সম্মিলন ভঙ্গের দুই দিন পরে, বরিশাল সহর হইতে আট মাইল দূরবর্ত্তী রহমতপুর নামক স্থানে স্বদেশী আন্দোলন ও বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ কল্পে অনুষ্ঠিত এক সভায় বক্তৃতা দিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ আহুত হইলেন। চক্রবর্ত্তী পরিবার রহমতপুরের অতি সম্ভ্রান্ত ও পুরাতন বনেদী বংশ এবং তাঁহারা সেখানকার জমিদার। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাদের গৃহে অতিথি হইলেন। চক্রবর্ত্তি মহাশয়গণ স্বদেশী আন্দোলনের বিশেষ সমর্থক ছিলেন। সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ অতিথিগণ বিরাট জলযোগে পরিতৃপ্ত হইলেন। সেই সুদূরপ্রান্তে সে দিনের জন্য সকলে জাতিবিচার স্বদেশিকতার উৎসাহে ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। সকলে একত্র বসিয়া আহার করিলেন, বিলাতফেরত সুরেন্দ্রনাথও ভোজন-পংক্তিতে সাদরে আহুত হইয়াছিলেন।

সভার কার্য্য সবেমাত্র সমাপ্ত হইয়াছে, এমন সময় পুলিস বাহিনী আসিয়া দর্শন দিলেন। তাহারা একটি ঠিকা গাড়ী করিয়া আসিয়াছিল; এবং গাড়ীখানি মোটা রেগুলেশন লাঠিতে পূর্ণ ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহারা সামান্য একটু দেরী করিয়া আসায় কোন লাভই হইল না। সভার কোনও নিদর্শনই যখন নাই, তখন কাহাকেও গ্রেপ্তার করিবার সুযোগ ঘটিল না।

ইতিমধ্যে বরিশাল সহরে প্রবল জনরব প্রচারিত হয় যে রহমতপুরে সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ সভাকারিগণকে পুলিস বাহিনী গ্রেপ্তার করিতে গিয়াছে। সুরেন্দ্রনাথের আত্মীয় লাকুটিয়ার জমিদার স্বর্গীয় বিহারীলাল রায় এ সংবাদ পাইবামাত্র সঠিক ব্যাপার জানিবার ও সাহায্যের জন্য সঙ্গে সঙ্গে রহমতপুরে রওনা হইলেন। বিহারীলালের পৈত্রিক বাসভবন লাকুটিয়ার নিকট তাঁহাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইল। সুরেন্দ্রনাথ তখন বরিশাল অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন, "একজন ইংরাজ মহিলা একদিন আমার সহিত এই সকল বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, কর্ত্তৃপক্ষ আপনার জন্য বরিশালে একটি ফাঁদ পাতিয়াছিলেন কিন্তু আপনি অবহেলা ভরে উহার ত্রিসীমানা এড়াইয়া যান, আর তাঁহারাই অবশেষে নিজেদের ফাঁদে জড়াইয়া পড়েন। সুতরাং এই ব্যাপারে ঘটনাচক্রে আপনিই জয়লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ইংরাজ মহিলাটি সম্পূর্ণ অপক্ষপাতেই রাজনৈতিক অবস্থার গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।"

বরিশাল হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন

রহমতপুর হইতে ফিরিবার পর সুরেন্দ্রনাথ বরিশালে আর একদিন মাত্র অবস্থান করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ফিরিবার মুখে যাত্রাপথের ঘটনাগুলি স্মরণীয় উপাখ্যান। প্রত্যেক ষ্টেশনে যেখানে যেখানে ষ্টীমার অথবা ট্রেণ থামিয়াছে, বিপুল জনতা সুরেন্দ্রনাথকে

অভ্যর্থনা করিয়াছে। দিন কিম্বা রাত্রির বিচার নাই ; সকলেই একান্ত আগ্রহে অধীর তাহাদের দেশবরেণ্য নেতার দর্শন আকাঙ্ক্ষায়,—তাঁহার পদধূলি লাভের প্রত্যাশায় ! সে মহান দৃশ্য বুঝি কল্পনাও করা যায় না। পূর্ণ ২৪ ঘণ্টা এইজন্য সুরেন্দ্রনাথকে বিনিদ্রভাবে কাটাইতে হইয়াছিল। ভোরের বেলা যখন তাঁহাদের গাড়ীখানি শিয়ালদহ ষ্টেশনে প্রবেশ করিল, তখন তিনি দেখিলেন, সেখানে এক বিরাট জনসমুদ্র তাঁহাদের সাদর অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করিতেছে ! অ্যান্টি সারকুলার সোসাইটির যুবকগণ এবং তাহাদের সভাপতি শ্রীযুত কৃষ্ণ কুমার মিত্র মহাশয়ও সুরেন্দ্রনাথের সহিত সেই ট্রেণে ছিলেন।

শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে তাঁহাদের সকলকে কলেজ স্কোয়ারে লইয়া যাওয়া হইল। তখন সবে সূর্য্যোদয় হইয়াছে ; কলিকাতাবাসীর পক্ষে নিদ্রাভঙ্গের সময় মাত্র ! কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কলেজ স্কোয়ারের উদ্যানে দেখা গেল সহস্র সহস্র ব্যক্তি সুরেন্দ্রনাথের দর্শনার্থে উপস্থিত। তাঁহার মুখনিঃসৃত একটি সারগর্ভময় ওজস্বিনী বাণী শ্রবণের জন্য তাহারা আগ্রহে উন্মুখ। মানবের জীবনে এমন এক একটি মুহূর্ত্ত কদাচিৎ আসে, যাহার দ্বারা তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিতে পারে। সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে সেই সময় সমুপস্থিত। বিগত চব্বিশ ঘণ্টাকাল অবিশ্রান্তভাবে দর্শনার্থী ব্যক্তিগণের সম্মুখে বক্তৃতা করিবার ফলে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ প্রায়। কিন্তু তত্রাচ তিনি এশুভ মুহূর্ত্ত উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। সুরেন্দ্রনাথ সেই আগ্রহোন্মুখ জন সমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ জলদগম্ভীর স্বরে আবেগের সহিত যে বক্তৃতা দিলেন, তাঁহার মর্ম্ম এই যে,—তাঁহারা যেন সকলে স্বদেশী ব্রত গ্রহণ করেন এবং বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ স্বরূপ প্রবর্ত্তিত আন্দোলনকে পূর্ণ গতিতে চালাইয়া যান ; স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনে দ্বিধা না করেন।

প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতি মিঃ এ রসুল

সুরেন্দ্রনাথের সহকর্ম্মী এবং বন্ধুগণের মধ্যে মিঃ রসুল ছিলেন অগ্রগণ্য। তিনি ছিলেন কুমিল্লা জেলার অধিবাসী এবং জাতিতে বাঙ্গালী

মুসলমান্। বিলাতের অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটির গ্রাজুয়েট হইয়া তিনি ব্যারিষ্টারী পাশ করেন, এবং কলিকাতার হাইকোর্টে যোগদান করিয়াছিলেন। বঙ্গব্যবচ্ছেদ স্থির ও নির্দ্ধারিত বলিয়া ঘোষিত হইবার পরেও যে সকল অল্পসংখ্যক মুসলমান ইহার প্রতিবাদী হইয়াছিলেন, মিঃ রসুল ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। তিনি সর্ব্বদাই রাজনৈতিক কারণে হিন্দু-মুসলমানকে একতাবদ্ধ হইবার জন্য অসঙ্কুচিত চিত্তে অনুরোধ করিতেন। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা তাঁহার চক্ষুশূল ছিল। বঙ্গব্যবচ্ছেদকে তিনি দেশের দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করিতেন; তাঁহার ধারণায় ইহার দ্বারায় বাঙলাভাষী হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীগণের একসূত্রতা ছিন্ন হইয়া যাইবে; বাঙালী জাতির রাজনৈতিক প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িবে। জীবনের মধ্যভাগেই তাঁহাকে অকস্মাৎ ইহলোকের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পরলোকে প্রয়াণ করিতে হয়। তিনি বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহাদের বিশাল সম্প্রদায়ের মধ্যে যে একজন বিখ্যাত নেতা হইতেন, ইহাতে আর ভুল নাই!

তাঁহার সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন ঃ—

"দেশের দুর্ভাগ্য যে সাংসারিক জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কার্য্য সমাধা করিবার অব্যহিত পূর্ব্বেই মৃত্যু আসিয়া তাঁহাকে ছিনাইয়া লইয়া গেল। একমাত্র কন্যার বিবাহের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় অকস্মাৎ রসুল সাহেবের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া স্থগিত হইয়া যায়। স্বদেশহিতকর কার্য্যে সাফল্যমণ্ডিত হইবার মধ্যভাগেই তিনি মহাপ্রয়াণ করেন। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য কোন একসময়ে তাঁহার সহধর্ম্মীগণের মধ্যে বিশেষ বিরূপভাজন হইয়া পড়েন; কিন্তু তিনি উহাতে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। অবশেষে একদিন তাঁহার সমর্থিত মতবাদ এবং অনুসৃত পন্থা সাফল্যমণ্ডিত হইয়া বিজয়লাভ করে। পরলোকে প্রস্থানের পূর্ব্বে যে তিনি এই বিজয় উল্লাস দেখিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন, ইহাই পরম সান্ত্বনার বিষয়।"

মিঃ রসুলের স্বাস্থ্য একে খুব সবল ছিল না; তাহার উপর বরিশালের সেই প্রাদেশিক সম্মিলনীর গুরুতর দায়িত্ব ও উদ্বেগ তাঁহাকে বহন করিতে

হইয়াছিল। উহা যে তাঁহার স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ক্লেশদায়ক হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি তিনি দেশের সেবা বলিয়া উহা হাস্যমুখে বহন করেন। এই প্রকার স্বদেশ প্রীতির জন্যই তিনি দেশের ও দশের নিকট প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।"

বরিশালের সভা ভঙ্গে দেশব্যাপী প্রতিবাদ

প্রাদেশিক সম্মিলনীতে বরিশালের কর্ত্তৃপক্ষের অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলী সমগ্র শিক্ষিত সমাজকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল। শুধু বাঙ্গালাদেশে নহে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ইহার যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। মাদ্রাজে একটি বিরাট জন সভার অধিবেশন হয়। এসপ্লানেডের উন্মুক্ত ময়দানে দশ সহস্রেরও অধিক দর্শক উপস্থিত হন। বিবরণ হইতে জানা যায় যে, প্রবল স্রোতের ন্যায় দর্শকগণ 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি সহকারে সভাস্থলের উদ্দেশে আসিতে থাকেন। প্রসিদ্ধ জননেতাগণ সভায় অংশ গ্রহণ করেন। মাননীয় নবাব সৈয়দ আহম্মদ বাহাদুর এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং ডাঃ নায়ারের সমর্থনে উহা গৃহীত হয়। উহাতে বরিশালের কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যাবলীর প্রতিবাদ পূর্ব্বক বলা হয় যে,—উহার দ্বারা ব্রিটিশ প্রজার স্বাধীনতায় অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে; ফলে নব গঠনোন্মুখ সরকারের নীতি বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। এই সভার পক্ষ হইতে বিলাতে ভারত সচিবের সকাশে, তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ পূর্ব্বক একখানি 'কেবলগ্রাম' প্রেরণ করা হয়। উহাতে উল্লিখিত থাকে—'পুলিশ কর্ত্তৃক একজন বিশিষ্ট নেতাকে গ্রেপ্তার ও একটি বাৎসরিক সভার অধিবেশন ভঙ্গ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সভায় বহু সহস্র ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এখন প্রার্থনা এই যে, অবিলম্বে সময়োপযোগী এমন সহানুভূতিপূর্ণ আদেশ প্রদান করুন, যাহার দ্বারা এই উত্তেজনা প্রশমিত হয় এবং ব্রিটিশ প্রজার স্বাধীনতার প্রতি ও নাগরিকগণের অধিকার সম্পর্কে জনসাধারণ পুনরায় আস্থাবান হইতে পারেন। অধিকন্তু যে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী এই কার্য্যের জন্য দায়ী তাঁহার যথাযোগ্য শাস্তির ব্যবস্থা করা হউক।'

প্রাদেশিক সম্মেলন ভঙ্গের প্রতিক্রিয়া

কুশাসকগণ দেশে যে একটি অশান্তির ঝড় টানিয়া আনেন তাহাই নহে। তাঁহারা নিদ্রিত অপরিণত জাতিকে পুষ্ট করিবার প্রয়োজনীয় উপাদান যোগাইয়া দেন। তাঁহারা নিদ্রিত সিংহের নিশ্চেষ্টতাকে খোঁচাইয়া তুলেন। দেশসেবার প্রতি জনসাধারণের চিত্তকে আগ্রহান্বিত এবং জাতীয় একতাকে পরিপুষ্ট করিবার মূলে তাঁহাদের অবলম্বিত নীতি ও কঠোর শাসন। ফলতঃ বরিশালের দমননীতির প্রভাবও এইভাবে স্বদেশিকতার প্রতি জনসাধারণের চিত্তকে আকৃষ্ট করিল।

বরিশালে পুলিশের অনুষ্ঠিত তাবৎ কার্য্য সর্ব্বত্র বেড়া আগুনের ন্যায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; জনসাধারণের চিত্ত সহানুভূতিতে আন্দোলিত হইয়া উঠিল। যাঁহারা এই প্রকারের আন্দোলনাদি হইতে দূরে থাকিতেন তাঁহারাও 'স্বদেশী মন্ত্র' গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনে উহার ব্যবহারের অভ্যাস করিতে লাগিলেন। এমন কি সংসার-বৈরাগী সন্নাসীগণও তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থাদি তুলিয়া রাখিয়া নির্জ্জন কন্দর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং স্বদেশী আন্দোলন প্রসারে ও বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য চালাইবার ভার গ্রহণ করিলেন। সমগ্র দেশের আবহাওয়ায় জলে স্থলে যেন প্রতিবাদের মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল।

বাগবাজারে রায় পশুপতি নাথ বসুর প্রাসাদ-অঙ্গনে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হইল। উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে এই সভার আয়োজন হয় এবং উহাতে তিলধারণের স্থানও ছিল না। রায় নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন; তিনি তদানীন্তন সময়ের রাজ-নৈতিক ক্ষেত্রে একজন নরমপন্থী নেতা ছিলেন। বরিশালের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বক্তৃতায় বলেন—"ব্রিটিশ শাসিত ভারতের ইতিহাসে এই ঘটনার তুলনা পাওয়া শক্ত!" তিনি আরও বলেন—সংবাদপত্র এবং বক্তৃতামঞ্চ হইল জনমতের মুখপত্র এবং যখনই এই দুইটির কণ্ঠরোধ করিবার প্রয়াস হইয়াছে, তখনই বিপ্লববাদ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবন স্মৃতিতে উল্লেখ করিয়াছেন,—"তাঁহার এই মন্তব্য যে একেবারে ভবিষ্যতবাণী তাহা পরবর্ত্তী ঘটনায় প্রমাণ হইয়া যায়।"

বিপ্লববাদের আত্মপ্রকাশ

যে বিপ্লববাদী আন্দোলনের ফলে সমগ্র ভারত ত্রস্ত, বিক্ষুব্ধ, যাহাদের কার্য্য কলাপে জনসাধারণ শিহরিত, যাহার মূলচ্ছেদের জন্য আজ ভারতের জননেতাগণ বদ্ধপরিকর,—সেই জাতীয় অভিশাপ সদৃশ এই বীভৎস আন্দোলন সর্ব্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে বাঙলাদেশে;—বঙ্গব্যবচ্ছেদের অব্যবহিত পরে। বিপ্লববাদী আন্দোলন বাঙলাদেশে আত্মপ্রকাশ করিলেও ইহার সৃষ্টি কিন্তু ইউরোপে। বাঙলাদেশের কতকগুলি চপলমতি যুবক ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া ইউরোপের তথাকথিত বৈপ্লবিক সংস্থাগুলির কার্য্যাবলী পাঠে প্রভাবিত হইয়া পড়ে এবং তদানীন্তন সময়ের শাসকবর্গের বিধি বহির্ভূত চণ্ডনীতির ফলে উত্তেজিত হইয়া দেশের শান্তিবিধ্বংশী এই ব্যাধিটিকে আমন্ত্রণ করিয়া আনে। যদিও দেশের কোনও ধীসম্পন্ন ব্যক্তি এই প্রকার আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি যুক্ত ছিলেন না বা আজও নাই, তথাপি এই আন্দোলনটি আত্মপ্রকাশ করিবার কারণ, তদানীন্তন সময়ের কর্ত্তৃপক্ষের কঠোর নীতি।

সমগ্র দেশের তীব্র প্রতিবাদ পদদলিত করিয়া বঙ্গব্যবচ্ছেদ কায়েমি করা হইয়াছিল। ইহার ফলেই অসন্তোষের বহ্নি প্রধূমিত হইয়া উঠিল। তাহার পরে বরিশালে সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় এবং সভার প্রতিনিধিগণের প্রতি পুলিসের অমানুষিক অত্যাচার এই বহ্নিতে ইন্ধন সংযোগ করিল। বঙ্গব্যবচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে ইহার প্রতিবাদ আন্দোলনকে চূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে কর্ত্তৃপক্ষ চণ্ডনীতি প্রয়োগ করিলেন। যাহার ফলে স্বদেশী কর্ম্মী অথবা প্রচারকগণকে বহুস্থলে হয় অভিযুক্ত করা হইতে লাগিল, নতুবা নির্য্যাতিত করা হইল। সাধারণ স্থানে জনসভা করা নিষিদ্ধ! সহরের শান্তিপূর্ণ স্থলে সেনাবাহিনী স্থাপন করা হইয়াছিল। তাহারা নিরীহ ব্যক্তিগণের প্রতি অযথা অত্যাচার করিতে বিরত হইত

না। এই সকল বিবিধ কারণে জনসাধারণের চিত্ত যে বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হইয়া উঠিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

বরিশাল জেলার অন্তর্গত বানরিপাড়া গ্রামে গুরখা সেনাদল স্থাপন করা হয়, তাহাদের অত্যাচারের ফলে তথাকার বহু অধিবাসী দেশান্তরে যাইয়া বাস করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছিলেন। এই গুরখা সেনাগণ বানরীপাড়ায় স্ত্রীলোকগণের প্রতি অত্যাচার করিতে ত্রুটি করিল না এবং তাহা হইতেই বিপ্লববাদ আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিল। জনসাধারণের চিত্ত একেই উত্তেজনায় পূর্ণ; তাহার উপর যুবকগণ সাধারণতই একটু অধৈর্য্য প্রকৃতির হইয়া থাকেন। বাঙলাদেশের আধুনিক ঘটনা সমূহ তাহাদের চিত্তকে গঠনমূলক ব্যবস্থার প্রতি আস্থা-হীন করিয়া তুলিল, তাহাদের নিরাশার সীমানায় ঠেলিয়া লইয়া গেল। চরম অস্ত্র বলিয়া তাহারা যাহা গ্রহণ করিল উহা—বিপ্লববাদ।

বাঙলাদেশের বৈপ্লবিক কার্য্যাবলী যে সম্পূর্ণ ইউরোপ হইতে অধীত বিদ্যাবলে আমদানী হইয়াছিল, তাহার একটি প্রমান এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। কলিকাতার বিখ্যাত 'মুরারী পুকুর ষড়যন্ত্র' মামলায় ধৃত ও দ্বীপান্তর প্রত্যাগত শ্রীযুত হেমচন্দ্র কাননগোই, তাঁহার বাঙ্গালার বিপ্লব কাহিনী প্রবন্ধে একস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন,—

"বারীন এ খবর পেয়েই আমার কাছে এসেছিল আর আমার বিলেতে অর্জ্জিত 'বিদ্যা' চটপট শিখে নিতে উল্লাস ভায়াকেও পাঠিয়েছিল। য়ুরোপ থেকে বৈপ্লবিক কাযের জন্য নিতান্ত আবশ্যক যত সব বই আর কাগজপত্র এনেছিলাম, সে সমস্তই বারীন আদায় করে নিয়েছিল। আমার খুব আশা হয়েছিল, বারীন ঐ সকল পড়ে পাশ্চাত্য প্রথায় তাহার গুপ্ত সমিতিকে নূতন করে গড়ে তুলবে। * *

* * কিন্তু তবু কেন ঐ হত্যা ব্যাপারে সাহায্য করেছি তা বেশ বুঝ্‌তে পারছি। সদ্য প্যারিসে অর্জ্জিত বিদ্যাটি জাহির করবার প্রবৃত্তি এমন উৎকট হয়ে পড়েছিল যে, তার প্রকোপে অন্য সব ধারণা বা আদর্শ অর্থাৎ বিপ্লববাদের উদ্দেশ্য, নিখিল ভারতীয় বৈপ্লবিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি তলিয়ে গিয়েছিল। * *

* * 'প্যারিস' থেকে দেশে ফিরে আসবার মতলব স্থির হয়ে গেলে একটা ট্রাঙ্কে কাপড়-চোপড়ের সঙ্গে বিপ্লবের কাজে আবশ্যক অনেক কিছু পূরে প্যাবিস থেকে কলকাতায় কোন বন্ধুর নামে সেটা মাল-চালানী জাহাজে পাঠিয়েছিলাম। ঐ বন্ধুটি বেশ সুবিধা জনক ছিলেন, কারণ তাঁহার মৃত্যু সংবাদ মাত্র কয়েক দিন আগে পেয়েছিলাম, আর তিনি পুলিস অফিসে কায করতেন। ইহা ছাড়া সঙ্গে নিয়েছিলাম, একটা ছোট ব্যাগ,—তাতে পূরেছিলাম এমন কিছু, যা নাকি খোয়া গেলে তখনকার মনোভাব অনুযায়ী মনে করে ফেলতাম, ভারত উদ্ধারের অৰ্দ্ধেক মাল মসলা নষ্ট হয়ে গেল। আর তা যদি কাষ্টমস্ হাউসে ধরা পড়ত, তা হলে ফাঁসী অথবা তার চেয়েও ভীষণ বলে যা তখন মনে কবতাম, সেই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ছিল নিশ্চিত। যাই হোক ট্রাঙ্ক আর ব্যাগ এ দুটোতেই ধরা পড়বার আশঙ্কা ছিল পনের আনা; তা সত্ত্বেও এত সাহস করতে পেরেছিলাম—শুধু স্বাধীন দেশের আব-হাওয়া মাস কতক গায়ে লেগেছিল বলে।"

উপোরক্ত বিববণ হইতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বাঙলাদেশের বৈপ্লবিক ঘটনাগুলি সম্পূর্ণ য়ুরোপীয় আদর্শের ফল।

বিপ্লববাদ প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন,—"আমাব অভিজ্ঞতা-লব্ধ একটি ঘটনা হইতে আমি স্থির করিতে পারিয়াছিলাম যে এই বিপ্লব-বাদ আন্দোলনের প্রকৃত উৎপত্তির সময় কবে! বাঙলাদেশকে দ্বিধা বিভক্ত কবা এবং তাহার পরে কর্ত্তৃপক্ষেব অনুসৃত নীতিই যে আমাদের দেশে এই আন্দোলনের উৎপত্তির কাবণ, ইহা অসঙ্কোচে আমি বলিতে পারি। অবশ্য দেশের অর্থনৈতিক দুর্দ্দশা যে ইহাকে শক্তিশালী করিয়াছিল তাহাতে ভুল নাই। বরিশালে প্রাদেশিক সম্মিলন ভঙ্গ করিয়া দেওয়ার সঙ্গে সম্পূর্ণ বিধিবিরুদ্ধ হিংসামূলক ব্যবস্থার অবলম্বনের কারণই এই বিপ্লবকে সৃষ্টি করিয়া ফেলিল। এতাদৃশ ধারণাব প্রতি আমার স্থির

বিশ্বাস হইবার মূল কারণ নিম্নের ঘটনাটিতে বর্ণনা করিতেছি এবং উহা হইতে ইহার যথার্থতা প্রতীয়মান হইবে।

বরিশালের ঘটনার কয়েকমাস পরের কথা ;—একদিন সন্ধ্যাবেলা আমার বারাকপুরস্থ বাসভবনে দুইটি যুবক আসিয়া আমার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে। আমি ঘরে প্রবেশ করিয়া উপবেশন করিলে পর তাহারা আমায় বলিল যে, তাহাদের বক্তব্য একটু গুরুতর বিষয় লইয়া এবং বিশেষ গোপনীয়, সুতরাং ঘরের দরজাটি তাহারা বন্ধ করিয়া দিতে চাহে। আমি বিলক্ষণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম। যাহা হউক, আমরা তিন-জনে সেই রুদ্ধঘরে রহিলাম। আগন্তুকগণের মধ্যে একজন, যাঁহাকে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র বলিয়া বোধ হইল, আমার সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, 'আমরা একটি অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে আপনার অভিমত জানিতে আসিয়াছি। আমরা স্যার ব্যামফাইল্ড ফুলারকে (ছোটলাট) গুলী করিয়া হত্যা করিবার একটি কল্পনা করিয়াছি। আমরা আজ রাত্রে এই উদ্দেশ্যে "——" স্থানে যাইতেছি। এ সম্বন্ধে আপনার কি মত বলুন।"

এই প্রকার অস্বাভাবিক প্রস্তাবের জন্য আমি বিন্দুমাত্র প্রস্তুত ছিলাম না। সুতরাং কিয়ৎক্ষণের জন্য আমি যেন স্তব্ধ হইয়া গেলাম। পরে বলিলাম,—তোমরা স্যার ব্যামফাইল্ড ফুলারকে কি জন্য হত্যা করিতে চাহিতেছ ? তিনি কি করিয়াছেন ?

যুবকটি তৎক্ষণাৎ আবেগভরে জবাব দিলেন, তিনি বানরিপাড়ায় গুর্খাদের স্থাপন করিয়াছেন, তাহারা আমাদের স্ত্রীলোকগণের উপর অত্যাচার করিয়াছে। অতএব আমরা তাঁহার উপর দিয়া ইহার প্রতি-শোধ গ্রহণ করিব।

আমি বলিলাম, তোমরা নিশ্চয় ধরা পড়িবে এবং অবশেষে তোমা-দিগকে ফাঁসীতে ঝুলিতে হইবে।

তাঁহারা বলিলেন, আমরা আমাদের অদৃষ্ট পরীক্ষা করিব এবং যদি প্রয়োজন হয়—আমাদের নারীজাতির সম্মান রক্ষার জন্য সে দুঃখ বরণে বদ্ধপরিকর।"

আমার অবস্থা তখন যে কি ভীষণ সঙ্কট ও সঙ্কুল তাহা অবর্ণনীয়! কাহারপক্ষে বোধ হয় কল্পনা করাও কঠিন। দুইটি যুবক, যাহারা তাহাদের নারী জাতির সম্মানরক্ষার্থে প্রতিহিংসা গ্রহণে বদ্ধপরিকর, যাহাদের স্থির বিশ্বাস যে, আইনের সহায়তায় তাহারা কোন প্রতিবিধানই করিতে পারিবে না,—তাহাদের করিতে হইবে সেই সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত—প্রতিনিবৃত্ত! সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় একটি জোর গুজব রটিয়াছিল যে, স্যার ব্যামফাইল্ড পদত্যাগ করিয়াছেন এবং এ সংবাদটি সত্য বলিয়া আমার প্রতীয়মান হইয়াছিল। আমি এই সংবাদটির উপর জোর দিয়া বলিলাম, তোমরা কি জান যে স্যার ফুলার পদত্যাগ করিয়াছেন? সুতরাং এখন সেই মৃতকল্প লোকটিকে হত্যা করিয়া আর কি লাভ হইবে? অপর দিকে তোমাদের এই প্রয়াসের ফলে জনসাধারণের নিবাপত্যতাকে বিপদগ্রস্ত করা হইবে। আমরা সকলে চাই তাঁর ছোটলাটগিরিব হাত হইতে নিস্কৃতি। কিন্তু ধর যদি তোমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়, কেননা তোমরা কিছুতেই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পার না যে তোমরা সফলকাম হইবেই—তাহা হইলে তাঁর পদত্যাগ পত্র নিশ্চয় প্রত্যাহৃত হইবে এবং ফলে তিনি পুনরায় তাঁহার আসনে সমারূঢ় হইবেন। তোমরা কি তোমাদেব দেশের এমনি ক্ষতি করিবে?

ইহাতে যথেষ্ট কাজ হইল; সকল বিষয় নিস্পত্তি হইয়া গেল। যুবক দুইটি তৎক্ষণাৎ তাহাদের সঙ্কল্প ও প্রস্তাব পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন। আমি তখন তাহাদের দৃঢ়ভাবে চাপিয়া ধরিয়া কহিলাম,—'আমার পায়ে হাত দিয়া শপথ করিয়া এই কথা বল।' তাহারা সঙ্গে সঙ্গে আমার অনুরোধ প্রতিপালন করিল। আমিও একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। তথাপি আর একটু অসুবিধা ছিল। তাঁহারা বলিলেন যে—আজ রাত্রের গাড়ীতেই তাহাদের অকুস্থলে অবলম্বিত সকল ব্যবস্থা বন্ধ করিতে হইবে; কিন্তু মুস্কিল যে তাঁহাদের কাছে রাহা খরচের অর্থ নাই। আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের প্রার্থনা অনুযায়ী অর্থ প্রদান করিলাম।

আমি জানিনা তাঁহারা কাহারা ছিলেন এবং আজ পর্য্যন্ত আমি

জানিনা যে তাঁহারা কে ? কেননা আমি তাঁহাদের নাম মূলেই জিজ্ঞাসা করি নাই। কিন্তু তথাপি আমি তাঁহাদের বিশ্বাসের উপযুক্ত মনে করিয়াছিলাম এবং তাঁহাদিগকে প্রদত্ত অর্থ একদিন আমাকে ডাকঘরের মারফতে প্রত্যর্পিত হইয়াছিল।”

তখনকার দিনে আকাশে বাতাসে যে কল্পনা উড়িতেছিল উপরের ঘটনায় তাহারই নির্দ্দেশ রহিয়াছে। বিপ্লববাদের প্রতি কাহারও কোন প্রকারের সহানুভূতি থাকিতে পারে না। হত্যা—চিরদিনই হত্যা! দোষ ক্ষালনের জন্য উহার যে কোন আখ্যাই দেওয়া হউক অথবা উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক না কেন, উহাতে কিছু আসে যায় না। উহা চিবদিনই সাধারণেব—ঘৃণার বিষয়।

স্যরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

“কিন্তু তাহা বলিয়া ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকগণ যেন তদানীন্তন সময়ের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে না ভোলেন। একটি শাসক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তিত বিধি বিধানগুলির ফলে দেশের বায়ুমণ্ডল—অসহায়তা, নিরাশা ও অবিশ্বাসে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং একথাও নিশ্চয় যে, কোন ব্রিটিশ ঐতিহাসিক তাঁহার বিবরণীতে এই ঘটনার কথা উল্লেখ করিবার সময় লজ্জিত না হইয়া পারিবেন না।”

স্যার ব্যাম ফাইল্ড ফুলারের পদত্যাগ

পূর্ব্ববঙ্গের সায়েস্তা খাঁ—স্যার ব্যাম ফাইল্ড ফুলার এই সময় প্রকৃতই পদত্যাগ কবিয়াছিলেন। ‘বনগার শেয়াল রাজার মত’ তিনি পূর্ব্ববঙ্গে পূর্ণ স্বেচ্ছাচাবিতাব সহিত শাসন যন্ত্র পরিচালিত করিতেছিলেন। পাছে সরকাবের সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ হয় এই আশঙ্কায় ভারত সরকার তাঁহার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহারই অনুকম্পায় ঢাকায় হিন্দু মুসলমানে বিবাদ বাধিয়াছিল এবং পুলিন দাস প্রভৃতি হিন্দুদিগের জাত ও মান রক্ষা করিবার জন্য সমিতি গঠিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারত সরকারের সহ্য করিবার ক্ষমতারও একটা সীমা আছে। ফুলারের ব্যবহার সে সীমা লঙ্ঘন করিল। সিরাজগঞ্জের কয়টি স্কুলের

ছেলেরা সহরে অনাচারের অপরাধে অপরাধী হইলে ছোটলাট ফুলার বিশ্ববিদ্যালয়কে সেই সব স্কুল হইতে ছেলেদের পরীক্ষা দিবার অধিকার বন্ধ করিবার জন্য আবেদন করিলেন। ভারত সরকারের ইহাতে সম্মতি ছিল না। তাঁহারা বলিলেন, 'ছোটলাট এমন আবেদন করিলে বঙ্গভঙ্গ লইয়া আবার বিশেষ আলোচনা হইবে এবং ফলে পূর্ব্ব বঙ্গের শাসন ব্যাপারের প্রতি আক্রমণ অনিবার্য্য হইবে।' তাই তাঁহারা সে সম্ভাবনা পরিহার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন নিয়মে স্কুলে রাজনীতি চর্চ্চার ব্যবস্থার জন্য অপেক্ষা করিতে উপদেশ দিলেন। ফুলার বলিলেন, ভারত সরকার এই উপদেশ (বা আদেশ) প্রত্যাহার না করিলে, তিনি চাকরীতে ইস্তফা দিবেন। আন্দোলনের সময় ছোটলাট বদলের অসুবিধা বড়লাট মিণ্টোর অজ্ঞাত ছিল না; কিন্তু তিনি দেখিলেন, পূর্ব্ববঙ্গের সরকারের উপর আর নির্ভর করা যায় না। তিনি যদি ফুলারকে চাকরীতে রাখিতে স্বীকার করান, তবে তাঁহাকে বিরুদ্ধ সমালোচনার সময়ও ফুলারের পক্ষ সমর্থন করিতে হইবে। তিনি ফুলারের ইস্তফা গ্রহণ করিলেন এবং ভারত সচিবও সেই কাজের সমর্থন করিলেন।

ফুলার বিলাতে যাইয়া ভারত সচিব লর্ড মর্লির কাছে স্বীকার করিয়াছিলেন, তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই, তাঁহার ইস্তফা গ্রহণ করা হইবে,—Such a thing never happened before,—লর্ড মিণ্টোর টেলিগ্রাম পাইয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। ফুলারের সহিত আলাপ করিয়া ৫ই অক্টোবর লর্ড মর্লি বড়লাট লর্ড মিণ্টোকে লিখিয়াছিলেন—"আমি যেমন এঞ্জিন চালাইবার কাজের অযোগ্য, 'ফুলার' তেমনই প্রদেশ শাসন করিবার অযোগ্য।"

বিপ্লববাদীদের প্রথম আক্রমণ

পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনার অল্প দিবস পরেই, বাঙলার অন্যতম ছোটলাট সার এনড্রু ফ্রেজারের ট্রেণ খানি মেদিনীপুরের সান্নিধ্যে নরসিংহগড়ের নিকট উড়াইয়া দিবার প্রচেষ্টা হইল। সার এনড্রু ফ্রেজারের প্রতি এই আক্রমণের কারণ তিনি বঙ্গব্যবচ্ছেদের একজন অন্যতম প্রবর্ত্তক ছিলেন, এবং ইহার

ফলে তিনি জনসাধারণের নিকট নিতান্ত অপ্রিয়ভাজন শাসকরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশের ছোটলাট হইয়া আসিবার পূর্ব্বে তিনি এই প্রদেশে আর কোন প্রকারের কার্য্যভার গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার শাসন যন্ত্র পরিচালনার অভিজ্ঞতা মধ্যপ্রদেশে সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি তথাকার পুলিস কমিশনের সভাপতি ছিলেন এবং তাঁহাকে ছোটলাটরূপে মনোনয়ন করায় তীব্র সমালোচনা উঠিয়াছিল।

সার এনড্রু ফ্রেজার বাঙলাদেশে ছোটলাট হইয়া আসেন—একজন অপরিচিত ব্যক্তিভাবে। তাঁহাব অনুকূলে কোন প্রকার সু-জনমত ছিল না। উপরন্তু তাঁহার শাসন ব্যবস্থায় সমগ্র প্রদেশে তাঁহার বিরুদ্ধে একটি দৃঢ় সংস্কাব রচিত হইয়া গেল। সাধারণের ধারণা ছিল যে, তিনিই বঙ্গভঙ্গের আদেশ লইয়া আসিয়াছেন। সুতরাং ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসে—ঐরূপ একটি অপ্রীতিকর বিষয়েব বাহক নির্ব্বাচিত হওবার ফলে, তাঁহাকে যে দুঃখ ভোগ কবিতে হইবে—ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবন স্মৃতিতে উল্লেখ করিয়াছেন,—

"একটি নবগঠিত সুবৃহৎ প্রদেশে কর্ত্তৃপক্ষগণ স্বয়ং অশান্তির স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন। সেস্থানে জনসাধারণ গঠনমূলক ব্যবস্থার প্রতি আস্থাহীন;—যুবক এবং চরমপন্থীরা নিরাশায় বিক্ষুব্ধ। তথাপি তাহারা স্বদেশসেবার জন্য আগ্রহান্বিত। ফলে তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা বিপজ্জনক পথে চালিত হইল। অভিভাবকগণের কোন নিষেধই বাধা দানে সক্ষম হইল না।

নির্দ্দোষ কুলী আসামী বলিয়া দণ্ডিত

মেদিনীপুরের এই ট্রেণ ধ্বংশের প্রচেষ্টা যে বিপ্লবী দলের কীর্ত্তি তাহা সরকার প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই। পুলিস কতকগুলি নিরপরাধ কুলিকে আসামী করিয়া চালান দেয় এবং তাহাবা যথারীতি দণ্ডিত হয়। অবশেষে মুরারী পুকুর ষড়যন্ত্র ধরা পড়িলে তৎসংশ্লিষ্ট বারীন্দ্র ঘোষ আদালতে স্বীকার করেন যে এই কার্য্যটি তাঁহারই অনুষ্ঠিত।

এ সম্বন্ধে তদানীন্তন বিপ্লবী দলভুক্ত শ্রীহেমচন্দ্র কাননগোই লিখিয়াছেন,—

"১৯০৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর বাঙ্গলার লাট সার ফ্রেজার সাহেবের গাড়ী বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল—আমারই বাড়ীর কাছে। তাই বম্বেতে এ খবর পেয়ে একটু ভীত হয়েছিলেম। মেদিনীপুরের বিপ্লবী বন্ধুদের কাছে এই ঘটনার বিশেষ বিবরণ শুনলাম; বারীন খড়গপুর থেকে শ্রীমান—কে খড়গপুরেব প্রায় দশ কি বারো মাইল দূরে একটা নির্জ্জন স্থানে রেললাইনের তলায় কয়েক পাউণ্ড ডিনামাইট পুতে দিয়ে আসতে পাঠিয়েছিল। লাটসাহেবের গাড়ীটা নাকি জখম হয়েছিল। যাই হোক, এই অপরাধের অপরাধীকে ধ'রে দিতে পারলে সরকার থেকে এক হাজার ও আব বি, এন, রেলকোম্পানী থেকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কাব দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

বিপ্লববাদীদের দ্বারা যে এঘটনা ঘটতে পারে অথবা বিপ্লববাদী কোন জীবের অস্তিত্ব যে বাঙলাদেশে থাকতে পারে, সে ধারণা তখন বেঙ্গল পুলিসের বুদ্ধিতে গজায় নি। তার প্রমাণ, তাঁরা নাগপুরী কুলিদের ভেতর থেকে কি রকম করে একদল আসামী বের করে আইন কানুন মোতাবেক তাদের অপরাধ সাব্যস্ত করে ফেলেছিলেন।"

মেদিনীপুর জিলা সম্মেলন পণ্ড করিবার প্রচেষ্টা

সেই সময়, যখন ট্রেণ ধ্বংশের প্রয়াস হয়, সম্ভবতঃ সেইদিনেই মেদিনীপুবে জেলা সম্মিলনীর অধিবেশন হইতেছিল। উহা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য কতকগুলি যুবক বিশেষ চেষ্টিত হন। এই সকল যুবকগণের সম্বন্ধে প্রবল সন্দেহ ছিল যে তাঁহারা কোন বিপ্লবীদলের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন—মেদিনীপুরের বিশিষ্ট নেতা মিঃ কে, বি, দত্ত। তিনি বক্তৃতা দিবার কালে বারংবার বাধা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। সুরেন্দ্রনাথ সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনিও এবম্প্রকার অস্বাভাবিক ঘটনায় বিলক্ষণ বিস্মিত হইয়া যান। যাহাহউক, অবশেষে সুরেন্দ্রনাথ ও দত্ত মহাশয়ের অনুরোধে সভায় পুনরায় শান্তি স্থাপিত হইল এবং সভার কার্য্য যথারীতি অগ্রসর হইতে লাগিল।

এই সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করিয়াছেন,—

"এই ঘটনা আমার কাছে কিন্তু ঈশ্বরের ইঙ্গিত বলিয়া মনে হইল। কয়েক মাস পরে সুরাটে যে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, ইহাকে তাহারই পূর্ব্ব সূচনা বা অগ্রদূত বলা চলে। তবে উহা আর একটু বৃহত্তর ভাবে ঘটিয়াছিল।"

মেদিনীপুরের সভাভঙ্গের এই প্রচেষ্টাও তথাকথিত একটি বৈপ্লবিক দল কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

এ সম্বন্ধেও শ্রীযুত হেমচন্দ্র কাননগোই লিখিয়াছেন,—

"উক্ত ৬ই ডিসেম্বরের পরের দিন মেদিনীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীব বাৎসরিক অধিবেশন হয়েছিল। তাতে মধ্যপন্থী আর চরম-পন্থীদের যে রকম উৎকট ঝগড়াঝাটি বেঁধেছিল এবং চরমপন্থীদের পৃথক্ কন্‌ফারেন্সে ইংরাজ সরকারকে যে রকম বেশ দু'কথা শুনিয়ে দেওয়া হয়েছিল তা থেকে নাকি মেদিনীপুরের পুলিশ কলিকাতা আর মেদিনীপুরের গুপ্ত সমিতির গন্ধ পেয়েছিল বলে ছ'সাত মাস পরে মেদিনীপুর বোমার মামলার এজাহারে প্রকাশ করেছিল। কিন্তু গন্ধ পেলে এই ঘটনার অনেক দিন পরে উক্ত কুলী বেচারাদের অকারণ দণ্ড দিয়ে অক্ষয় কলঙ্কের কালি সরকারের গায়ে আর লেপে দিত না। * * *

* * * ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর মেদিনীপুর কন্‌ফারেন্সে শুনেছি চরমপন্থীদের চেষ্টা নাকি যে কতকটা সার্থক হয়েছিল, তার মূলে ছিল সত্যেনেব (৺ সত্যেন বসু, নরেন গোঁসাইকে হত্যার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত) নির্ভিকতা, তার প্রতি লোকের—বিশেষ ক'রে ভলান্টিয়ার এবং বৈপ্লবিক কর্ম্মীদের একান্ত বিশ্বাস, তার কর্ম্মকুশলতা আর প্রত্যুৎপন্নমতি।"

ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি গুলী নিক্ষেপ

মেদিনীপুর প্রাদেশিক সম্মিলনীর কিছুদিন পরে ২৪শে ডিসেম্বর, কলিকাতায় সংবাদ পাওয়া গেল, পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় গোয়ালন্দ ষ্টেশনের প্লাটফর্ম্মে কাহারা ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এলেনকে গুলী করিয়াছে।

অবশ্য এই ব্যাপার রাজনীতিক বলিয়া প্রচার করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহার সহিত কোন্ নীতির সম্বন্ধ ছিল, তাহা নির্ণীত হয় নাই। বৈপ্লবিক ভিন্ন ভিন্ন দল গুলি নাকি দাবী করিতেন ইহা তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কীর্ত্তি বলিয়া।

বাঙ্গালার এককালের বিপ্লবী শ্রীহেমচন্দ্র কাননগোই লিখিয়াছেন—

"তা ছাড়া সেই ডিসেম্বরের ২৩শে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট এলেন (Mr. Allen) সাহেবকে অকারণে কে পিস্তল দিয়ে গুলী করেছিল। যদিও নাকি বিপ্লববাদীদের প্রায় সবগুলি দল এই কীর্ত্তির অধিকারী বলে নিজেদের মধ্যে দাবী করেছিল, তথাপি ঐজন্য কেউ অপরাধী সাবস্ত হয়ে দণ্ড পায় নি।"

রাখী বন্ধনের স্মৃতি দিবস পালন

১১ই অক্টোবর ভারত সভা গৃহে এক পরামর্শ সভা আহুত হয়, উহাতে রাখী বন্ধনের স্মৃতি দিবস কি ভাবে পালন করা হইবে তাহা আলোচনা করাই ছিল উদ্দেশ্য। সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতাগণ এই সভায় অংশ গ্রহণ করেন। স্থির হয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের পদ্ধতি অনুসৃত হইবে। কিন্তু বিডন বাগানে সভা হইতে পারিবে না, তাহা নিষিদ্ধ; সুতরাং সভার স্থান পরে প্রকাশিত হইবে। ১৬ই অক্টোবর ষ্টেটসম্যান সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয় যে, সভায় রাজদ্রোহ জনক বক্তৃতা দেওয়া হইবে না এবং লোক লাঠি লইয়া সভায় যাইবে না, এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া কোন নেতা গ্রীয়ার পার্ক ব্যবহারের জন্য অনুমতি লইয়াছেন। এই উক্তির উপযুক্ত প্রত্যুত্তর পরদিন সভাক্ষেত্রে প্রদত্ত হইল।

৩০শে আশ্বিন (১৭ই অক্টোবর) প্রাতে গঙ্গা স্নানের পর সেণ্ট্রাল কলেজের প্রাঙ্গণে রাখী বন্ধন হইল। অপরাহ্ণে কল্পিত মিলন মন্দিরের মাঠে প্রায় ৩০হাজার লোক সমাবেত হয়, তাহাদের মধ্যে বোধ হয়, ২০হাজার লোক লাঠি লইয়া গিয়াছিল; মৌলবী লিয়াকত হোসেন তাঁহার বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী দল লইয়া মাঠে উপস্থিত হয়েন। সভায় মতিলাল ঘোষ সভাপতিত্ব করেন। সুরেন্দ্রনাথ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী,

কাব্যবিশারদ মহাশয় প্রমুখ ব্যক্তিগণ বক্তৃতা করেন। অবশেষে, কলিকাতার সাধারণ বাগানগুলি বন্ধ প্রভৃতির জন্য আন্দোলনে ক্ষুণ্নোৎসাহ হওয়া হইবে না, এই প্রস্তাবটি গৃহিত হয়। তখনকার দিনে অনেকে ক্ষতি লাঞ্ছনা স্বীকার করিয়াও জাতীয়ভাবে শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, এই সভায় তাহা উল্লেখ করা হয়। কালী প্রসন্ন কাব্য-বিশারদ একটী গানে এই ভাবটি ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের দুর্ব্বার প্রভাব

সুরেন্দ্রনাথের মস্তিষ্ক প্রসূত স্বদেশী-মন্ত্র বাঙলা দেশে সম্মোহনের ন্যায় কার্য্য করিল। অল্পদিনের মধ্যেই দেশের আপামর জনসাধারণ পূর্ণমাত্রায় স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারে কৃত সঙ্কল্পিত হইলেন। ছাত্র, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, এমন কি পুরবাসী মহিলাগণও সুরেন্দ্রনাথের স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। রাজসাহীর অমর কবি রজনীকান্ত সেন গাহিলেন,—

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই—

বাঙলার নিহিত শক্তি যেন আত্মপ্রকাশ করিল। ভাবের বন্যা বাঙালীর বৈঠকখানা অতিক্রম করিয়া আমাদের শক্তিকেন্দ্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। বিলাতী বস্ত্র ও কাঁচের চুড়ী তথা হইতে নির্ব্বাসিত হইল।

বাঙলার কবি মনোমোহন চক্রবর্ত্তী গান লিখিলেন,—

ছেড়ে দাও কাঁচের চুড়ী, বঙ্গনারী
কভু হাতে আর পরো না।
জাগগো ও ভগিনি, ও জননী
মোহের ঘোরে আর থেকো না।
কাঁচের মায়াতে ভুলে শঙ্খ ফেলে,
কলঙ্ক হাতে মেখো না;
তোমরা যে গৃহলক্ষ্মী ধর্ম্ম সাক্ষী
জগতভরে আছে জানা।

চটকদার কাঁচের বালা ফুলের মালা
তোমাদের অঙ্গে সাজেনা
নাই বা থাক মনের মতন স্বর্ণভূষণ
তাতে ত দুঃখ দেখি না।

সিঁথিতে সিন্দুর ধরি বঙ্গনারী
জগতে সতী শোভনা।

বলিতে লজ্জা করে—প্রাণ বিদরে
বারো লাখের কম হবেনা—
পুঁতি কাঁচ ঝুঠো মুক্তায় এই বাঙ্গালায়
দেয় বিদেশে, কেউ জানেনা।

ঐ শোন বঙ্গমাতা শুধান কথা—
"ওঠ আমার যত কন্যা!
তোরা সব করিলে পণ মায়ের ধন
বিদেশে উড়ে যাবে না।

আমি যে অভাগিনী—কাঙ্গালিনী,
দুই বেলা অন্ন জোটে না;
কি ছিলাম, কি হইলাম, কোথা এলাম—
মা যে তোরা ভাবিলি না।"

বরিশালে অশ্বিনীকুমার দত্তের নেতৃত্বে দেশের লোক এমনভাবে বিদেশী পণ্য বর্জ্জন করিল—এমনভাবে স্বাবলম্বী হইল যে, গভর্ণমেণ্ট বলিলেন, সরকারের শক্তি স্তম্ভিত হইয়াছে। বাজারে বিলাতী কাপড়, বিলাতী লবণ, বিদেশী চুড়ী আর বিক্রয় হয় না দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বুলার নূতন বাজার বসাইলেন। সে বাজারে নহবৎখানা নির্ম্মিত হইল, কিন্তু নহবৎ বাজাইবার বাজন্দার পাওয়া গেল না। একমাত্র দোকানী—হৃদয়—পুরাতন কাপড়ের একখানা দোকান খুলিয়া বাজারে বসিয়া বুলারকে বিদ্রূপ করিয়া গান গাহিতে লাগিল,—'এ বাজারে আমি একা দোকানদার ভাই।' জিলার কর্ত্তারা প্রমাদ গণিয়া অশ্বিনী কুমারকে

নির্ব্বাসিত করিবার প্রস্তাব করিলেন। বড়লাট লর্ড মিণ্টো গোখলেকে অশ্বিনীবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, তাঁহার বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়া বলিলেন, "এমন লোককে নির্ব্বাসিত করা সঙ্গত নহে—তুষ্ট করাই কর্ত্তব্য।" অশ্বিনী বাবু সে যাত্রায় নিস্তার পাইলেন বটে, কিন্তু শেষে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে অশ্বিনীকুমারকে ও আরও ৮ জনের সহিত নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল। সুবোধ মল্লিক, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সতীশ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ তন্মধ্যে ছিলেন।

মুসলমান জনসাধারণকে স্বদেশী পণ্য ব্যবহারে প্রবৃত্ত করিবার জন্য ময়মনসিংহ সুহৃদ্ সমিতির 'মোমিন' গান রচনা করিলেন। সেই সময় পূর্ব্ববঙ্গে দারুণ অন্নকষ্ট ও তৎসহ জলপ্লাবন হইয়াছিল, লোকেব কষ্টেব অবধি ছিলনা।

পেটের দায়ে জ্বইলে গো মইলাম উপায় কি করি ?
ওরে কি দারুণ অকাল পইড়াছে রে ধান টাকায় হইল দুই পুসুরী।

আড়াই কুড়ি টাকা গো দেনা,
কর্জ্জ হাওলাদ পাওয়া যায় না,
মহাজনে কুরুক দিছে জমি আর বাড়ী ;
আবার চৌকীদারী টেক্স গো, নিল থালি লোটা নিলাম করি।

পাটের টাকায় দিলাম কিন্যা,
বিবিরে জার্ম্মনীর গয়না
বিলাতী ফুকো মতির দানা
আর হাওয়ার চুড়ী।

ওবে জার্ম্মাণীর গয়না কেউ বন্ধক নেয়না রে—
ভাইরে ভাইঙ্গা গেছে ঠুইন্‌কা চুড়ী।

মনের দুস্কু কইবো রে কারে,
ছাইলা মাইয়া কাইন্দা গো মরে,
পরিবার হায় ভাত বেগোরে
হইছে পাট খড়ি।

হায়রে ছাতি ফাইটা যায়রে দেইখ্যা,
ওরে আমি কেন না মরি ?

মোমিন বলে, কবি গো মানা,
ভাতের দুস্কু আর রবে না ;
বিলাতী চিজ আর কিন্‌বোনা
কও কশম করি।

তবে দেশের টাকা রইবো যে দেশে,
লক্ষ্মী ঘরে আসবে যে ফিরি।'

এই গান তখন পূর্ব্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে গীত হইত, লোককে বুঝাইবার উপায় হইয়াছিল। একদিকে এই সব গানে ও মুকুন্দ দাসের যাত্রায়—আর একদিকে সংবাদপত্রে ও বক্তৃতায় দেশে জাতীয়ভাব ও স্বদেশী ভাব প্রচারিত হইতে লাগিল।

কলিকাতায় জনসাধারণের সহিত পুলিশের সঙ্ঘর্ষ

কলিকাতায়ও এই স্বদেশী বর্জ্জনের স্রোত পরিপূর্ণভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল। জনসাধারণ বিলাতী পণ্য এমনভাবে বর্জ্জন করে যে, পূজার সময় 'লাকি ডে' তে বিলাতী কাপড়ের সওদা হয় নাই। 'এম্পায়ার' ইহার অর্থ করেন, লোকে আর কুসংস্কারপন্ন নাই যে, বৎসরের মধ্যে একটা দিনই শুভ বলিয়া মনে করিবে। অথচ এদিকে পুলিসে লোক বাড়াইবার ব্যবস্থা করা হয় এবং কলিকাতার কনেষ্টবলদিগকে লাঠি দেওয়া হয়। পুলিস নাকি কলিকাতা হইতে এই মত প্রকাশ করে যে, সভা বন্ধ করিতে না পারিলে পূজার বাজারে বিলাতী বর্জ্জনের নিবারণ সম্ভব হইবে না। ২রা অক্টোবর কলিকাতায় পুলিসের সহিত সহরবাসীর প্রবল সঙ্ঘর্ষ হয়। যাঁহারা পুলিস কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রতি সম্মান প্রকাশার্থ বিডন বাগানে সভা হইতেছিল। প্রায় দুইশত কনেষ্টবল লইয়া একজন পুলিস ইন্‌স্পেক্টর আসিয়া সভা ভঙ্গ করিতে বলে। বাগানের দ্বারগুলি তখন বন্ধ হইয়াছে। তখন দুই পক্ষে মারামারি আরম্ভ হয়। সে দিনের সঙ্ঘর্ষে

পুলিসের জয় হয় নাই। রাস্তার আলো নিভাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। বারাঙ্গনারাও লোককে আশ্রয় দিয়াছিল এবং পুলিসের উপর বোতল, ইষ্টক, এমনকি উনান পর্য্যন্ত নিক্ষিপ্ত হয়। অনেক দোকান লুঠ হয়, এবং বহু লোক আহত এবং কয়জন নিহত হয়। পরদিন এই ব্যাপারেব পুনরাভিনয় হয় এবং সমস্ত রাত্রি লুঠ ও মারামারি চলে। পূর্ব্ব বৎসর এই সময় ছেলেধরার হাঙ্গামা হইয়াছিল। এবার তেমনই ব্যাপার ঘটিল। ইহার পরদিনও সহরের স্থানে স্থানে অশান্তি আত্মপ্রকাশ করে, এবং রাত্রিকালে কয়জন দেশীয় ও ইউরোপীয় কনেষ্টবল আহত হয়। ওয়াল্টার্স নামক একজন ইউরোপীয় কনেষ্টবলের হাত মনিবন্ধ হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। লোক পুলিসকেই দোষ দিয়াছিল।

১৯০৭ সালে স্থরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন এবং দক্ষযজ্ঞের সমাপ্তি

সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব্ব ভাবে ভাবতীয় কংগ্রেসেব অধিবেশন স্থরাট সহরে বসিল। অধিবেশনের স্থান পূর্ব্বাহ্ণে নাগপুরে স্থিবিকৃত হওয়া সত্ত্বেও ষড়যন্ত্রকারিগণের চক্রান্তে স্থবাটে পরিবর্ত্তিত হয়। বোম্বাই প্রদেশের কংগ্রেস নেতাগণের মতে নাগপুরে অধিবেশন হওয়া নাকি যুক্তিযুক্ত বোধ হয় নাই। কিন্তু আসল ব্যাধি ছিল এই স্থানেই।

স্থরেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"আমি যেমন বক্তৃতা দিতে উঠিলাম অমনি সভামণ্ডপের ভিতর হইতে বাধা প্রদানের চিহ্ন দেখা দিল। কংগ্রেসের বিগত সভাপতি হিসাবে আমার কর্ত্তব্য ছিল, সার রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতিরূপে মনোনয়নের প্রস্তাব করা। পূর্ব্ব সময়ে আমি এই প্রকারের কর্ত্তব্যগুলি কংগ্রেসে সর্ব্ববাদিসম্মত ও অনুমোদনে সম্পাদন করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এইবার সেরূপ হইবার আশা ছিল না। আমি বক্তৃতা দিতে যাইয়া বারংবার বাধা প্রাপ্ত হইতে লাগিলাম। মেদিনীপুরের সভার ঘটনা আমার বিশেষভাবে স্মরণ ছিল; আমি নিজে তাহার একজন দ্রষ্টা ছিলাম। বক্তৃতা দিবার উদ্দেশ্যে আমার দণ্ডায়মান

হইবার পরই মণ্ডপে পূর্ণ শান্তি বিরাজিত হওয়াই উচিত। কিন্তু এই প্রকারের ঘটনা আমার অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ নূতন।

সভায় আর একটি শক্তিশালী দল উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা মিঃ তিলককে সভাপতিরূপে মনোনীত করিতে ইচ্ছুক। স্যার রাসবিহারী ঘোষকে কংগ্রেসের সভাপতিরূপে গ্রহণ করিতে তাঁহার মোটেই স্বীকৃত ছিলেন না। বরঞ্চ কংগ্রেসের অধিবেশন ভাঙ্গিয়া যাউক,—তথাপি রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি হইতে দিব না—ইহাই ছিল সেই দলের অভিমত এবং শেষ পর্য্যন্ত অধিবেশন প্রকৃতই ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার পর—চেয়ার, জুতা, চটি প্রভৃতি নেতাগণেব উদ্দেশে বর্ষিত হইতে লাগিল। আক্রমণের উদ্দেশ্যে অনেকে মঞ্চের অভিমুখে ছুটিয়া আসিতে চাহিতে-ছিলেন। আমি সভা মঞ্চের উপর জনকয়েক বন্ধু বেষ্টিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, তাঁহারা আমাকে রক্ষার্থে ঘিরিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সার ফিরোজ সা মেহেতা ও আরও কতিপয় ব্যক্তিগণের সমভিব্যাহারে আমরা তাঁবুর পশ্চাদভাগে বাহির হইয়া আসিলাম। অবশেষে পুলিস আসিয়া সভা-মণ্ডপটী জনশূন্য করিয়া দিল। এইভাবে কংগ্রেসের ইতিহাসের এক স্মরণীয় অধ্যায় সমাপ্ত হইল।”

বাঙলাদেশের প্রতিনিধিগণ, সুরেন্দ্রনাথের প্রতি এই প্রকার হীন অপমানজনক ব্যবহার হওয়ার জন্য—বিশেষ ব্যথিত ও অবমানিত বোধ করিলেন। নিজেদের মত বিশেষ বা মনোনীত ব্যক্তির নির্ব্বাচনের উদ্দেশ্যে জাতীয় মহাসভায় এই প্রকারেব গুণ্ডামী ও হিংসাপূর্ণ অত্যাচার করা যে বিশেব হীনতা ও অভদ্রতার পরিচয় তাহাতে সন্দেহ নাই। সুরাট কংগ্রেসের এই কীর্ত্তি-কাহিনী তথনকার দিনে বহু জাতীয় সংবাদ-পত্রে তীব্র সমালোচিত হইয়াছিল।

যাহাহউক, বাঙলাদেশের প্রতিনিধিগণ একঘণ্টার মধ্যেই একটি সভা করিলেন এবং সুরেন্দ্রনাথের প্রতি আস্থাজ্ঞাপক এক প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। নিখিল ভারত প্রতিনিধিগণও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁহারাও অনতিবিলম্বে একটি সভা কবিলেন। বহু তর্ক বিতর্কের পর গঠনমূলক এক খসড়া প্রস্তুত হয় এবং এই খসড়ারই প্রথম অধ্যায় ভবিষ্যতে

কংগ্রেসের বিধি (Creed of Congress) বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। ইহাতে উল্লেখ ছিল যে,—"ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বায়ত্ত-শাসন সম্পন্ন দেশগুলির ন্যায় শাসন-প্রণালী লাভ এবং সাম্রাজ্যশাসনে তাহাদের ন্যায় অধিকার ও দায়িত্ব-সম্ভোগের উদ্দেশ্যেই এই জাতীয় মহাসভা গঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান শাসন-প্রণালী ধীর অথচ অপ্রতিহতভাবে সংস্কার করিয়া আইন সঙ্গত উপায়ে উদ্দেশ্যসাধন করিতে হইবে। জাতীয় একতাবৃদ্ধি, জাতীয় ভাবের উদ্বোধন এবং দেশের মানসিক, নৈতিক, আর্থিক ও বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় উন্নতিসাধন করাও এই মহাসমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য।" কংগ্রেসের সভ্য হইতে হইলে এই অঙ্গীকার-পত্রে অবশ্যই প্রত্যেককে স্বাক্ষর করিতে হইত। বহুদিন পর্য্যন্ত অনেকে এই অঙ্গীকার-পত্রে স্বাক্ষরে স্বীকৃত না হওয়ায় কংগ্রেস হইতে তাঁহারা পৃথক হইয়া যান।

বিচ্ছিন্ন কংগ্রেসের ভিন্ন ভিন্ন দলের পুনর্মিলন

বহুদিন পরে, নিখিল ভারত কংগ্রেসে অনেকগুলি বিচক্ষণ উপদেষ্টা যোগদান করেন। তাঁহাদের প্রাণপণ প্রয়াস ও যত্নে ১৯১৬ সালে লক্ষ্মৌ সহরে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, এবং সেই সভায় কংগ্রেসের যাবতীয় শাখা প্রশাখা ও দল পুনর্বার মিলিত হইয়া এক হইয়া যান। শুধু তাহাই নহে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি প্যাক্টের রচনা করা হয়। হিন্দু ও মুসলমান সমাজের নেতাগণের সম্মিলিত এক সভার অনুষ্ঠান হয়। তথায় গঠন প্রণালীর উপর স্থাপিত এক খসড়া রচিত ও গৃহিত হয়। এই মিলন সভার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন—সুরেন্দ্রনাথ।

শ্রীমতী বেশান্তের কংগ্রেসে যোগদান

থিয়োজফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাত্রী এবং হিন্দুগণের শিক্ষা বিষয়ক আন্দোলনের নেত্রীরূপে সর্ব্বজন পরিচিতা শ্রীমতী অ্যানি বেশান্ত ১৯১৪ সালের মাদ্রাজ কংগ্রেসে যোগদান করিলেন। তাঁহার বাগ্মিতা, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, তাঁহার অক্লান্ত কার্য্যের ধারা এবং তাঁহার অদ্ভুত

প্রচারের ক্ষমতা অতুলনীয়-অভাবনীয়। অল্পদিনের মধ্যেই কংগ্রেসে তাঁহার যোগদানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইল। কংগ্রেসের বিভিন্ন দলগুলিকে একসূত্রে বদ্ধ করা সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট হাত ছিল। তিনি ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়া ভারতের বিভিন্ন নেতাগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, এবং অনেকের সঙ্গে বিশেষভাবে আলাপও করেন।

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের পর কংগ্রেসের বিভিন্ন দলগুলি একত্র হইয়া গেল। তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত মুসলমানগণও কংগ্রেসের ছত্রতলে হিন্দুগণের সহিত হাতে হাত মিলাইয়া দাড়াইলেন। একতাবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিলে সিদ্ধিলাভ যে অবশ্যম্ভাবী তাহাতে ভুল নাই। কিন্তু মানবের স্বভাব, অতীতের অমিল, কার্য্যের ধারা এবং তাহার সঙ্গে ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষের স্পৃহা একদিনে নিশ্চিহ্ন করা অসম্ভব নহে। অদূর ভবিষ্যতে অল্প দিনের মধ্যেই কংগ্রেসের কার্য্যে উহা ফুটিয়া উঠিতে ত্রুটি করিল না।

হোমরুল লীগ

১৯১৫ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করিবার জন্য নিখিল-ভারতের প্রতিনিধিগণ বোম্বাই সহরে সমাগত হইলেন। শ্রীমতী বেশান্ত সেই সময় তথায় একটি সভা আহুত করেন। সভায় তিনি স্বরাজ-সভা গঠনের জন্য একটি প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। স্বরাজ সভা অর্থাৎ হোমরুল লীগের উদ্দেশ্য ছিল, স্বায়ত্বশাসন সম্পর্কীয় ব্যাপারের অনুকূলে বিরাটভাবে প্রচার কার্য্য চালান। কিন্তু সাধারণের মত হোমরুল গঠনের অনুকূলে ছিল না। তাঁহাদের ধারণায় ইহার গঠনের ফলে কংগ্রেস দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। সুরেন্দ্রনাথের অভিমতও উহাই ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে হোমরুল লীগ গঠনের উদ্দেশ্যে আহুত সভার অধিবেশনগুলির সভাপতিত্ব তিনিই করিয়াছিলেন। শ্রীমতী বেশান্তের প্রস্তাব সেইবার কার্য্যকরী হয় নাই। কিন্তু তিনি ইহার পরিকল্পনা একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই; ফলে উত্তরকালে উহা সফল হইয়াছিল।

সুরেন্দ্রনাথ হোমরুল লীগ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "কংগ্রেসের ছত্রতল পুনর্গঠিত হইবার পর, পুনরায় প্রথম বিচ্ছিন্ন করিতে যে এই লীগই সাহায্য করিয়াছিল, ইহা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি।"

সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং এই লীগে যোগদান করেন নাই; এবং তাঁহার ন্যায় কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতিগণের মধ্যে অনেকেই যোগদান করেন নাই। কিন্তু হোমরুল লীগে যোগদান না করার জন্য তাঁহাকে জনসাধারণের নিকট অল্প-বিস্তর অপ্রিয় ভাজন হইতে হইয়াছিল। তিনি তাহার জন্য ঈষৎ ভ্রূক্ষেপও করেন নাই। তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা ও বহুদর্শী পুরুষ। তাঁহার ধারণায় যাহা অন্যায় ও হানিকারক বলিয়া বিবেচিত হইত, জনসাধারণের প্রীতার্থে উহা গ্রহণ করিবার মত দুর্ব্বলতা কোন দিনই তিনি হৃদয়ে পোষণ করেন নাই। তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল—স্বদেশের সেবা। এবং সেই সেবায় সফলতা লাভ করিতে হইলে যে কাঁটার মুকুট পরিতে হয় ইহা তিনি বুঝিতেন; তাহাতে তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন না।

সুবেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবন স্মৃতিতে উল্লেখ করিয়াছেন,—

দেশ সেবার কার্য্যে অপ্রিয়ভাজনতা ক্ষণিকের জন্য। আমি এই দায়িত্বটির সম্মুখীন হইতে কোন দিনই ভীত ছিলাম না। সহকর্ম্মীদের সহিত একযোগে কার্য্য করিবার কালে দেশের জন্য যাহা মঙ্গল বিবেচনা করিতাম উহা কবিতে কোন দিনই পশ্চাদপদ হই নাই। কংগ্রেসকে গঠিত করিতে আমি সাহায্য করিয়াছিলাম; ইহাকে আমি—আমার জীবনের কার্য্যগুলিব অন্যতম অংশ বলিয়া মনে করি; ইহা আমার গর্ব্ব, ইহা আমার আকাঙ্খা। আমার ধারণায়, যে কার্য্যের দ্বারা দেশের ভিতর বিস্তৃত দৃঢ় ভাবটি ক্ষুণ্ণ হইতে পাবে, তাহা সমর্থন করা আমি কোন দিনই উচিত বলিয়া বিবেচনা করি নাই।"

শ্রীমতী বেশান্তের প্রতি অন্তরীণের আদেশ

এই সময়ে সহসা শ্রীমতী বেশান্তের প্রতি অন্তরীণের আদেশ হইল। কারণ তিনি ১৯১৭ সালের কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

আমাদের মাতৃভূমির সেবার জন্য আত্মোৎসর্গপরায়ণা, এইরূপ একজন সদাশয়া মহিলাকে অন্তরীণে আবদ্ধ করায় দেশব্যাপী তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। জনসাধারণের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইল যে, শ্রীমতী বেশান্তকে আটক-বন্দী করিবার আসল উদ্দেশ্য হইল স্বরাজ আন্দোলনেব মস্তকে কঠিন আঘাত করা। কারণ তিনি ইহার স্বপক্ষে বিশেভাবে লড়িতেছিলেন।'

স্থরেন্দ্রনাথ তাঁহাব জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন,—"আমাদের প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণের মধ্যে একটি অপূর্ব্ব সাম্যতা দেখিতে পাওয়া যায়, উহা তাঁহাদের বাক্যে অবজ্ঞার ভাব। ইহার ফলে স্বায়ত্ত শাসনের উচ্চ আশার প্রতি জনমত গভীরতর হইয়া দেখা দিল এবং জনসাধারণের চিত্ত এই আন্দোলনের অনুকূলে বিশেষভাবে মাতিয়া উঠিল। যে আবেগ উদগ্র হইয়া শ্রীমতী বেশান্তকে কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্ব্বাচিত করিয়াছিল, তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়া সেই আবেগকে সরকার অধিকতর উস্কাইয়া দিলেন। সাম্রাজ্যবাদীগণের কার্য্যের ধারাই এইরূপ! তাহারা জনসাধারণের সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকিতে ভালবাসেন এবং নিজেদের একটি গণ্ডীব ভিতর আবদ্ধ করিয়া রাখেন। জন-সাধারণের শক্তি সামর্থের কোন তথ্য লওয়াই প্রয়োজন বোধ করেন না; তাহার ফলে পরিশেষে কার্য্যকালে সেই জনশক্তির দ্বারাই অভিভূত হইয়া পড়েন।"

শ্রীমতী বেশান্তের অন্তরীণে দেশব্যাপী প্রতিবাদ এবং টাউনহলে প্রতিবাদসভা সরকার কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ

হোমরুল লীগে যোগদানে স্থরেন্দ্রনাথের আপত্তি থাকিলেও তিনি কিন্তু শ্রীমতী বেশান্তের দেশসেবা কার্য্যকে চিরদিন শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন। বেশান্তের প্রতি অন্তরীণের আদেশ প্রদত্ত হওয়ায় সে শ্রদ্ধার ভাব বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বরঞ্চ তিনি গভীর আন্তরিকতার সহিত এই অন্যায় আদেশের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। অন্তরীণের প্রতিবাদ কল্পে আহুত দুইটি সভায় স্থরেন্দ্রনাথ সভাপতির আসন গ্রহণ

করেন। এই দুইটি সভার মধ্যে একটি হইয়াছিল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন গৃহে এবং অপরটি টাউনহলে। শেষের সভাটি অধিবেশন হইবার প্রাক্কালে বাঙ্গালার ছোটলাট কর্ত্তৃক সহসা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হয়। এই সময় কেবলমাত্র সুরেন্দ্রনাথের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও উপস্থিত বুদ্ধিবলে সেই আদেশ প্রত্যাহৃত হয়। উভয় সভাতেই সুরেন্দ্রনাথ তীব্রভাবে এই অন্তরীণের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

টাউনহলের প্রতিবাদ সভা নিষিদ্ধ হওয়ায় বিক্ষোভ

শ্রীমতী বেশান্তের অন্তরীণের প্রতিবাদকল্পে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন গৃহে যে সভা হয় উহা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি আহুত হওয়ায় মফঃস্বলের প্রতিনিধিগণকে আমন্ত্রিত করিতে পারা যায় নাই। সেইজন্য স্থির হয় যে অল্পদিনের মধ্যেই টাউনহলে একটি সাধারণ সভা আহুত করা যাইবে, যাহাতে মফঃস্বলের প্রতিনিধিগণকে আমন্ত্রিত করিয়া সম্মেলনের অংশ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইবে। স্যার রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হইল এবং সভার দিন পর্য্যন্ত স্থির হইয়া গেল।

এমন সময় অকস্মাৎ জনসাধারণ শ্রবণ করিলেন যে, সরকার এই সভার অধিবেশন নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সভার উদ্যোক্তাগণের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে মাননীয় মিঃ কামিং আহ্বান করিয়া সরকার বাহাদুরের আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। সভাকে নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণার যে যুক্তি দেখান হইল তাহা অভূতপূর্ব্ব! ভিন্ন প্রদেশের সরকারের কার্য্যের সমালোচনা অন্য প্রদেশের অধিবাসীদের করিতে দেওয়া হইবে না;—কি চমৎকার যুক্তি! সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন,—"প্রাদেশিক সরকারদের এই প্রকারের মত, ইতিপূর্ব্বে কেহ কখন শোনে নাই! সকলেই ইহাতে হাসিলেন। জনসাধারণের বুঝিতে অসুবিধা হইল না যে—প্রদর্শিত কারণই আসল নহে। ইহা যে একটি বাজে অজুহাত মাত্র তাহা পরিষ্কাররূপে দেখা যাইতেছে। সংবাদপত্রে ইহার যে কারণ বর্ণিত হইল তাহা আরও হাস্যকর। ফলে অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হইল না। জনসাধারণের অসন্তোষের মাত্রা আরও অধিকতর বাড়িয়া গেল।"

নিষিদ্ধ সভা সম্পর্কে কর্ত্তব্য নির্ণয়

সুরেন্দ্রনাথ সে সময়ে বোম্বাই সহরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির একটি সভায় যোগদান কবিতে গিয়াছিলেন। তিনি সেখান হইতে তার-যোগে জানাইলেন,—"তাঁহাদের প্রত্যাবর্ত্তনের পর যেন একটি সভা আহ্বানের আয়োজন করা হয়।" তাঁহারা অতি সত্বরই কলিকাতায় ফিরিলেন।

সুবেন্দ্রনাথের প্রত্যাবর্ত্তনেব পরদিবস সভা বসিল। বহুব্যক্তি এই সভায় যোগদান করিলেন। ইহার দুইদিন আগে সুবেন্দ্রনাথেব অকৃত্রিম বন্ধু ও সহকর্ম্মী মিঃ এ, বসুল সহসা পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহাব সহকর্ম্মীগণের অনেকেই এজন্য শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ে সভায় যোগদান করিতে আসিলেন। সভাপতিব আসন সর্ব্ব-সম্মতিতে সুবেন্দ্রনাথকেই গ্রহণ কবিতে হইল। এই সভাব মূল আলোচ্য বিষয় ছিল—টাউনহলের প্রতিবাদ সভা সরকার কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হইয়াছে, এখন সরকারের আদেশ অমান্য করিয়া এই সভা করা উচিত কি অনুচিত? সরকারের এই অন্যায় আদেশেব ফলে জনসাধারণের চিত্ত বিক্ষোভে পূর্ণ ছিল। দর্শকগণ যাঁহারা এই সভায় যোগদান করিতে আসিলেন প্রত্যেকের অন্তরই উত্তেজনায় পূর্ণ! বক্তাগণ একেব পর এক উঠিয়া তাঁহাদের বক্তৃতায় উত্তেজনাব স্রোত বহাইতে লাগিলেন; প্রত্যেকেই প্রতিজ্ঞা কবিয়া কহিলেন, যদি সবকারেব এই অন্যায় আদেশ অমান্যের ফলে কারাবরণ করিতে হয়,—তাহাতেও তাঁহারা পশ্চাদপদ নহেন। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল, যদি টাউনহলে সভার অধিবেশন করা হয় তাহা হইলে জনসাধারণ এবং সবকারের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য্য।

অবশেষে বহু তর্কবিতর্ক এবং আলোচনার পর স্থির হইল,—সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ছয়জন ব্যক্তি মিলিত হইয়া যে কর্ম্ম-পন্থা নির্দ্ধারণ করিবেন, তাহা বিনা প্রতিবাদে এই সভায় গ্রহণ করা হইবে। যে ছয়জন ব্যক্তির উপর এই দায়িত্বপূর্ণ ভার অর্পিত হয় তাঁহারা সকলেই সেই সভাব মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। স্যার রাসবিহারী ঘোষ, বাবু মতিলাল ঘোষ,

বাবু ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, বাবু চিত্তরঞ্জন দাশ, মিঃ ফজলুল হক্ এবং সুরেন্দ্রনাথ, এই সম্মানের অধিকারী হন।

এই সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন,—

আমরা পার্শ্বের একটি ঘরে সকলে মিলিয়া পরামর্শের পর এই সিদ্ধান্ত উপনীত হইলাম যে, 'বর্ত্তমানে আমাদের কর্ত্তব্য হইল ঢাকায় গমনপূর্ব্বক বাঙলার লাট লর্ড রোনাল্ডসে বাহাদুরের সকাশে উপস্থিত হইয়া সকল ব্যাপার বিশদ্‌ভাবে বুঝাইয়া বলা এবং যাহাতে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়, তজ্জন্য তাঁহাকে বিনীত অনুরোধ করা।' বাঙলার লাট তখন ঢাকায় ছিলেন। আমরা তখন ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলাম যে, সরকারকে এইরূপ একটি অবাঞ্ছনীয় ব্যবস্থা প্রত্যাহারের সুযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি আমরা ইহাতে অকৃতকার্য্য হই তাহা হইলে তাহার প্রতিবিধানার্থে তৎক্ষণাৎ 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' গ্রহণ এবং টাউনহলে যথা-রীতি সভা করিয়া সরকারের আদেশ অমান্য করা অনায়াসেই চলিবে। ইহা স্থির করিয়া আমরা সকলে পুনরায় সভাস্থলে ফিরিয়া আসিলাম। মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীর উপর এই প্রস্তাবটি ব্যাখ্যা করিবার ভার দেওয়া হইল। তিনি একজন ঝানু প্রাচীন উকিল; উপযুক্ত যুক্তির সহিত বিষয়টি বুঝাইয়া দিতে ত্রুটি করিলেন না। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়! যখন দর্শকগণের চিত্ত উত্তেজনায় পূর্ণ থাকে তখন নরমপন্থীগণের বাক্য তাহাদের মনে কোন ছাপই আঁকিতে সক্ষম হয় না। যুক্তি শুনিয়া তাহারা আমাদের যেন ছিঁড়িয়া খাইবার উপক্রম করিল।

অবশেষে কোন প্রকারের নিষ্পত্তি না হইয়াই সভা ভাঙ্গিয়া গেল।

লাট সকাশে প্রতিনিধি-সঙ্ঘের গমন এবং নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত

পূর্ব্বোক্ত সভায় সম্মতি পাওয়া না যাইলেও সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ জননেতাগণ লাট সকাশে প্রতিনিধিবৃন্দ প্রেরণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন,—

"আমি সঙ্গে সঙ্গে লাট সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ গুরলের সহিত পত্রব্যবহার আরম্ভ করিয়া দিলাম। সাক্ষাৎকারের দিন পর্য্যন্ত স্থির হইয়া গেল। এই নির্দ্ধারিত দিবসের পূর্ব্বদিনে ঢাকায় ব্যবস্থাপক সভার এক অধিবেশন হইবার তারিখ ছিল। ব্যবস্থাপক সভার বহু ভারতীয় সভ্য আমাদের এই প্রতিনিধি দলে যোগদানে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু আমাদের প্রতিনিধির সংখ্যা আমরা ইচ্ছা করিয়াই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলাম—ছয়জন। আমার মতে এই অল্প সংখ্যক প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করা বিবেচনার কার্য্য হইয়াছিল। কারণ লাটসাহেবের সহিত যে কথাবার্ত্তা হইবে তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং গোপনীয়; সুতরাং অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি থাকিলে এই সকল বিষয়ে অসুবিধা ঘটা বিচিত্র নহে।"

ইতিমধ্যে দেশের আবহাওয়ায় টাউনহলে সভা নিষিদ্ধ হওয়ার প্রতিবাদকল্পে নানাবিধ উদ্ভট যুক্তির অবতারণা হইতে লাগিল। এই সকল যুক্তির মধ্যে অন্যতম ছিল,—'ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে ভারতীয় সভ্যগণের যোগদান নিষেধ।' এই বিষয়টি লইয়া ঢাকার পথে ষ্টীমার কক্ষে তুমুল আলোচনা চলে। সেই জাহাজে ব্যবস্থাপক সভার বহু প্রতিনিধি এবং সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্যক্তিগণ ঢাকায় গমন করিতেছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বলেন, —যখন লাট সকাশে প্রতিনিধিসঙ্ঘ এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে যাইতেছেন, সেই সময় ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন করা অবিবেচনার কার্য্য হইবে।'

যাহা হউক ঢাকার লাট-প্রাসাদে প্রতিনিধিগণ বিলক্ষণ সৌজন্যতা ও ভদ্রতার সহিত লর্ড রোনাল্ডসের সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। প্রতিনিধিসঙ্ঘের মধ্যে ছিলেন—বাবু চিত্তরঞ্জন দাশ, মিঃ ফজলুল হক, ডাঃ নীলরতন সরকার, বাবু ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, বাবু সুরেন্দ্রনাথ রায় এবং সুরেন্দ্রনাথ। সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

"লর্ড রোনাল্ডসে প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন যে,—কে আমাদের মধ্যে মুখপাত্র হইয়া কথাবার্ত্তা কহিবেন। মিঃ চক্রবর্ত্তী আমার নাম উল্লেখ করিলেন। লাট সাহেব তখন এই সম্পর্কীয় যাবতীয় সরকারি কাগজপত্র লইয়া প্রস্তুত

হইলেন। অতঃপর আমাদের কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। অল্পক্ষণের মধ্যেই স্পষ্ট বোঝা গেল—প্রাদেশিকতার প্রশ্ন, অর্থাৎ একপ্রদেশের অধিবাসিগণ ভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্ত্তার কার্য্যের সমালোচনার অনধিকারী বলিয়া যে মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তাহা একেবারেই অন্তঃসার শূন্য। সভা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিবার প্রকৃত কারণগুলি অবশেষে তিনি ব্যক্ত করিলেন। তবে এই কারণগুলিই যে পর্য্যাপ্ত তাহা বলা চলে না। কিন্তু উহার বহুলাংশ যে সত্য তাহাতে আর ভুল ছিল না। যে জন্য নিষেধের আদেশ প্রদত্ত হয় তাহা এই,—হোমরুল লীগের একটি সভায় (লাট বাহাদুর আমাকে নির্দ্দেশ করিয়া কহেন, আপনি অবশ্য এই সভায় উপস্থিত ছিলেন না) বক্তৃতাকালীন যে ভাষা প্রযুক্ত হয়, সরকার উহাকে অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। টাউন হলে যে সভার আয়োজন হইয়াছে তাহার বক্তাগণ অধিকাংশই সেই সকল ব্যক্তি। সুতরাং খুব সম্ভব আরও অধিক সংখ্যক যুবক-দর্শকগণের সম্মুখে হয়ত সেই প্রকারের তীব্র ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করা হইবে। তাহার ফল অত্যন্ত ক্ষতিকারক হইবে ইহাই সরকারের ধারণা। লর্ড রোনাল্ডসে বাহাদুর, অর্থপূর্ণভাবে কহিলেন, 'আমি ঠিক নিষেধ করি নাই। জনসভায় ছাত্রগণের উপস্থিতির ফলে অন্যান্য প্রদেশেও এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।'

অতঃপর লাট বাহাদুর গোয়েন্দা বিভাগের পদস্থ কর্ম্মচারিগণের প্রেরিত বিবরণের মুখ্যাংশগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা হোমরুল লীগের পূর্ব্বোক্ত সভায় উপস্থিত থাকিয়া এই বিবরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য সেই সভার কার্য্যাবলী বলিয়া যাহা বিবৃত হইয়াছিল উহা অপ্রমাদপূর্ণ কিনা তাহা বলা শক্ত; কিন্তু যদি প্রেরিত বিবরণের কতকাংশও যথাযথ হয়, তাহা হইলে ইহা অবশ্যই বলিতে হইতে হইবে যে বক্তৃতাকল্পে প্রযুক্ত ভাষা অত্যন্ত অন্যায়জনক। একজন বক্তা, তিনি সভায় প্রস্তাব উপস্থিত করিতে বিশেষ পটু, যুবকগণের উদ্দেশ্যে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বলেন, যেন তাহারা 'অনুশীলন সমিতির পন্থা অনুসরণ করেন।' এই 'অনুশীলন সমিতি' হিংসাপূর্ণ

নীতির সমর্থক থাকায় সরকার দমন করিয়াছিলেন। রিপোর্টে প্রকাশ, এই বক্তা মহোদয় আরও বলেন যে, আমাদের দেশে ইংরাজগণের সংখ্যা যেখানে মুষ্টিমেয়—সেখানে আমাদের মাতৃভূমির সন্তান লক্ষ লক্ষ। তথাপি এই কতিপয় সংখ্যক বিদেশী আজও আমাদের প্রভু! এই প্রকারের ইঙ্গিত অথবা ভাষা প্রয়োগ যে গভীর পরিতাপের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। আর একটি বক্তা হোমরুল লীগের সভায় বলেন যে, তিনি ইংরাজিতে বক্তৃতা দিবেন, যেহেতু তিনি সি, আই, ডিদের গৃহীত অনুবাদ করা রিপোর্টকে বিশ্বাস করেন না। এই বক্তার উল্লিখিত কথার প্রসঙ্গে লাট বাহাদুরকে জানাইলাম যে, এই কথাটী যে নির্দ্দোষ তাহা আমি জানি; একবার ইহাঁরই প্রদত্ত এক বক্তৃতার রিপোর্ট সি, আই, ডি, প্রমাদপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করায় অনুযোগ করিতে হইয়াছিল।' ইহার উত্তরে লাট বাহাদুর কহিলেন, কিন্তু বক্তৃতায় ঐভাবের উক্তির উদ্দেশ্যে হইতেছে সি, আই, ডি বিভাগের প্রতি নিন্দা আরোপিত করা। সি, আই, ডি বিভাগ সরকারের সহিত নিয়ত সংশ্রব রাখিতে বাধ্য। আজকাল তজ্জন্য প্রায়ই বিপ্লবীদল প্রতিশোধ গ্রহণার্থ সি, আই, ডি কর্ম্মচারিগণকে বাছিয়া বাছিয়া বাহির করিতেছে।"

আমি কথা প্রসঙ্গে বলিলাম, যেখানে স্যার রাস বিহারী ঘোষের ন্যায় ব্যক্তি সভাপতি নির্ব্বাচিত, সে সভার কার্য্যাবলী যে বিশেষ বিবেচনা ও সংযতভাবে পরিচালিত হইবে, তাহা দৃঢ়তার সহিত বলা চলে। লাট বাহাদুর এ সংবাদ জানিতেন। আমি বলিলাম 'এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।' মাননীয় রোনাল্ডসে প্রথমাবধিই আমাদের সহিত খোলাখুলিভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন; তিনি বলিলেন, যদি এইরূপ লিখিত প্রতিশ্রুতি পত্র দেওয়া হয় যে, সভার কার্য্য সংযতভাবে পরিচালিত হইবে, কোন প্রকার উত্তেজনাপূর্ণ ভাষা প্রয়োগ করা হইবে না তাহা হইলে প্রদত্ত আদেশ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে পারেন। প্রত্যুত্তরে আমরা কহিলাম যে, এই প্রকারের কোন নির্দ্দিষ্ট সর্ত্তাধীন হইতে আমরা অক্ষম; তবে লাট বাহাদুরের অভিলাষ

পূরণে আমরা যথাসাধ্য প্রয়াস পাইব। আমরা আরও কহিলাম, কোন একটি জনসভা আহুত করার সঙ্গে সঙ্গে উদ্যোগ কর্ত্তাগণ এই দায়িত্ব লইয়াই অবতরণ করেন যে, সভার কার্য্য ন্যায় সঙ্গত এবং যথাযথভাবে পরিচালিত করিতে হইবে। মোটকথা আমাদের এই আশ্বাসবাণীর উপর নির্ভর করিয়া টাউন হলের সভার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হইল।"

বিজয়েব আনন্দে পুলকিত হইয়া প্রতিনিধি-সঙ্ঘ কলিকাতায় ফিরিলেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথেব চিত্তে একটি চিন্তা জাগিয়া রহিল। না জানি দেশের জনসাধারণের নিকট এই কার্য্যের জন্য কি প্রকারের অভ্যর্থনা লাভ করিব! তিনি জানিতেন বিশেষ করিয়া বাঙলাদেশে বিশেষ সাহসিকতার সহিত কোন কঠিন কার্য্যে সফলতা লাভ করিয়া আসিলেই যে উহা সব সময় জনমতের অনুকূল হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। ভবিষ্যতে যখন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ পরিবর্ত্তিত করিয়া পূর্ণাঙ্গ করা হইয়াছিল, যখন সর্ব্ববাদী সম্মতভাবে স্থির হয় যে, জনসাধারণের অসন্তোষ বহ্নি একযোগে নির্ব্বাপিত করা হউক, তখন কোন কোন ব্যক্তি বিহার প্রদেশকে স্বতন্ত্র করায় বিক্ষোভ ও ব্যথিত ভাব প্রকাশ করিতে দ্বিধা কবেন নাই এবং বহুজনের চিত্তে কলিকাতা হইতে ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হওয়ায় একটি প্রচণ্ড আঘাত বাজিয়াছিল। সুতরাং সুরেন্দ্রনাথকে সকল প্রকার সমালোচনার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইল। বিশেষ করিয়া অমীমাংসিত ভাবে যে সভাটি ভাঙ্গিয়া যায় তাহার উদ্গত ধূম বুঝি তাঁহাকে আরও সচেতন করিয়া দিল।

পুনরায় পরামর্শ সভা আহুত করার প্রস্তাব এবং সুরেন্দ্রনাথের আপত্তি

নিষেধের আজ্ঞা প্রত্যাহৃত হওয়ায় একটি অমূল্য উপকার সাধিত হইল। কখন কখন দেখা যায যে জনসাধারণ কোন বিশেষ ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া, উহাতে অনুপ্রাণিত হইয়া—উত্তেজিত হইয়া

পড়েন। অল্প সময়ের জন্য হয়ত তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি কোন অপকর্ম্মের প্রতিও ধাবিত হইতে পারে। কিন্তু যেমন সেই আক্ষেপিক ভাব (fit) বিদূরিত হইয়া যায়, তখনই বিবেক এবং সাধারণ জ্ঞান আবার যথাস্থানে ফিরিয়া আসে।

প্রস্তাব হইল একটি জনসভা আহুত করিয়া উহাতে প্রতিনিধি সঙ্ঘের কৃতকার্য্যগুলির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হউক। সুরেন্দ্রনাথ ইহাতে আপত্য করিলেন। তিনি বলিলেন, ইহার ফলে সভায় পুনরায় একটি গণ্ডগোলের সৃষ্টি করা হইবে। তাহা অপেক্ষা টাউন হলের যে সভা স্থগিত ছিল উহারই আয়োজন করা হউক। তিনি বুঝিয়াছিলেন এই সভা বিশালতার দিক দিয়া,—প্রচার কার্য্যের ব্যাপকতায় এবং প্রতিনিধি আমন্ত্রণে এক বিবাট অনবদ্য সামগ্রী হইবে। তাহার ফলে ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার বাতিক—এমন কি দলাদলির সংস্কার পর্য্যন্ত ইহার দ্বারায় বিলুপ্ত হইতে পারে। দূরদর্শী নেতার এই ধারণা যথার্থ ছিল, তাহাতে ভুল নাই।

টাউন হলে জনসভা

অবশেষে টাউন হলে যথারীতি সভার অধিবেশন হইল। ইহা সেই পূর্ব্ব নিষিদ্ধ সভা। সরকারী কর্ম্মচারিগণের সকল আপত্তির অগ্নি-পরীক্ষা দিয়া এতদিনে সফলতা লাভ করিল। স্যার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্ব করিবার স্থির ছিল; কিন্তু অনিবার্য্য কারণে তিনি যোগদানে অপারগ হওয়ায় সুবেন্দ্রনাথকে সভাপতির আসন গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হইল। তিনি সানন্দে স্বীকৃত হইলেন। প্রথমে সুবেন্দ্রনাথই বক্তৃতা দিতে উঠিলেন, এবং সেই দিনের সেই সভায় উহাই একমাত্র বক্তৃতা। এই সূত্রে সুরেন্দ্রনাথ মাননীয় লাট বাহাদুরের সকাশে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য প্রতিনিসঙ্ঘ প্রেরণেব ইতিবৃত্ত বিবৃত করিলেন। টাউন হলের সেই সভায় উপস্থিত সকল শ্রেণীর দর্শকগণের নিকট হইতে সর্ব্ববাদীসম্মতভাবে এই কার্য্যেব জন্য সহানুভূতি লাভ করিলেন। যে দুশ্চিন্তা সুবেন্দ্রনাথকে পীড়িত করিতেছিল তাহা নিঃশেষে কাটিয়া গেল।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তৃতায় বলেন,—"আমি এবং আমার বন্ধুবর শ্রীমতিলাল ঘোষ যখন বোম্বাই সহরে, তখন সেখানে আমাদের নিকট সংবাদ গেল যে সভাটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হইয়াছে। এ সংবাদ পাইতেই আমরা যথাসত্বর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম! একটি কমিটি করিয়া আমরা স্থির করি যে লাট বাহাদুরের সকাশে একটি প্রতিনিধি সঙ্ঘ প্রেরণ করা প্রয়োজন। অবশ্য এই কার্য্যের জন্য আমরা কোন সমিতি অথবা জনসাধারণের নিকট হইতে কোন অধিকার পাই নাই; কিম্বা তাঁহাদের নিকট হইতে কোন প্রকারের আদেশ লই নাই। কিন্তু দেশের দুর্দ্দিনে যাঁহারা অম্লান বদনে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন,—যাঁহারা দেশের সেবার জন্য তাবৎ দুঃখ বরণ করিয়াছেন—সেই সকল স্বদেশ-প্রতিনিধিরূপী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে অনুপ্রেরণা লাভে আমরা সৌভাগ্যবান হইয়াছিলাম। জনহিতকর কার্য্যে আমাদের সেবা কতটুকু সততাপূর্ণ তাহা জানিতে দেশবাসীর বাকি নাই। কিন্তু সবার উপরে আমাদের দৃঢ় ধারণা যে আমরা দেশবাসীর বিশ্বাস পূর্ণমাত্রার অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইযাছি। সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষত্ব এই যে মাননীয় লাট বাহাদুরের সকাশে সাক্ষাৎকারের সময় আমরা কোন প্রকার সর্ত্তাধীন হই নাই, এবং সর্ত্তে আবদ্ধ হইবার জন্য কাহাকেও অনুরোধ করা হয় নাই। শুধু এই মাত্র বলিয়াছিলাম যে, আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করিব যাহাতে সভার কার্য্য ন্যায় সঙ্গতভাবে পরি-চালিত হয়। যদি এই বাক্যটিকে আপনারা আশ্বাস প্রদান বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন, তাহাতে আপত্তি নাই; কেননা এই প্রকারের আশ্বাস প্রদান আমাদের সকল জনসভায়ই দিতে হয়। আইনানুসারে ইহা দেওয়া প্রয়োজন। আমাদের তরফ হইতে যে কোন প্রকারের বাক্‌চাতুরী প্রকাশ, অথবা কোনরূপ অধিকার সমর্পণের বিনিময়ে এই নিষেধাজ্ঞা রহিত হইয়াছে তাহা নহে। আমরা সততাপূর্ণ ভাবে দৃঢ়তা ও সম্মানের সহিত এই কার্য্য করিয়াছি, ইহাতে দেশের গঠন প্রণালীর প্রতি স্থির লক্ষ্য রাখা হইয়াছিল। মাননীয় লর্ড বোনাল্ডসে আমাদের মনোভাবের উপযুক্ত আদান প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি

আমাদিগকে স্নেহপূর্ণভাবে এমন কি সৌজন্যতার সহিত গ্রহণ করেন। আমাদের সহিত যে ব্যবহার করেন তাহা শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিতে। এক প্রদেশের অধিবাসীগণ কর্ত্তৃক ভিন্ন প্রদেশের কর্ত্তৃপক্ষের শাসনকার্য্যের সমালোচনা করিবার নিষেধাজ্ঞা বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। ইহাই আমাদের ঢাকার কার্য্যবিবরণী। আমরা ইহার জন্য অনুতপ্ত ত নহি—বরঞ্চ আমাদের এই কার্য্যকে সমর্থন করি।"

এইভাবে যে ভীতি দেখা দিয়াছিল এবং যাহা বাঙ্গালাদেশের জনসেবা আন্দোলনের ইতিহাসে সঙ্কটসঙ্কুল অবস্থা বলিয়া বর্ণিত হইবার দাবী রাখে, তাহা সম্পূর্ণ নিবাকরণ হইয়া গেল।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাব জীবন স্মৃতিতে লিখিয়াছেন,—"আমি সরকারের সহিত লড়িতে কোনদিনই পশ্চাদপদ হই নাই। অবশ্য যদি লড়িবার কারণটি ন্যায়সঙ্গত হইত ও উহাব অনুকূলে জনমতের প্রাবল্য লক্ষ্য করিতাম। তবে ইহা নিশ্চয় যে, সেই আন্দোলন দমনের উদ্দেশে যে শক্তি প্রয়োগিত হওয়া সম্ভব তাহার মাত্রার দিকে নজর রাখিতে হইবে। যেন উহা আমাদের সহ্য-সীমার অতিরিক্ত কিম্বা উহার ফলে জনসেবার আগ্রহ বাধা প্রাপ্ত না হয়। বাঙ্গলাদেশে বিপ্লব আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে যে শক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছে উহার পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। ইহার দ্বারায় আমাদের দেশের জনসেবার উৎসাহ প্রচণ্ডরূপে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। দমননীতির উদ্দেশ্যে প্রয়োগিত শক্তি আমাদের সহনের পক্ষে অতিরিক্ত। পুলিশের হস্তে সর্ব্বময় ক্ষমতা প্রদানের ফলে জনসাধারণ নিপীড়িত, আমাদের স্বদেশের বহু যুবক দীর্ঘকালের জন্য অন্তরীণে আবদ্ধ এবং দেশের অনেকগুলি স্বদেশী সমিতির কণ্ঠরোধ হইয়াছে। আমাদের জাতীয় জীবনের উপর ইহার প্রভাব পূর্ণমাত্রায় পড়িয়াছে এবং ক্রমশঃ তাহা দুর্দ্দশার নিম্ন সোপানে অবতরণ করিতেছে।"

হোমরুল লীগে যোগদানের জন্য সুরেন্দ্রনাথকে প্রলোভিত করিবার প্রয়াস

শ্রীমতী বেশান্তেব অন্তরীণের অল্পদিন পরেই সুরেন্দ্রনাথের উপর

এমনভাবে নানাদিক দিয়া চাপ দেওয়ার চেষ্টা চলে, যাহাতে তিনি হোমরুল লীগে যোগদান করিতে বাধ্য হন। সুরেন্দ্রনাথ তখন ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে সভ্যপদপ্রার্থীরূপে দণ্ডায়মান। সেই সময় তাঁহার এক ভোট-দাতা বন্ধু সুরেন্দ্রনাথকে লিখিলেন যে, যদি তিনি হোমরুল লীগে যোগদান না করেন তাহা হইলে তাঁহাকে ভোট প্রদান করিবেন না। সুরেন্দ্রনাথ এই ভীতি-প্রদর্শন পত্রটীকে উপেক্ষাভরে ফেলিয়া দিলেন। হোমরুল লীগের সেক্রেটারী সুরেন্দ্রনাথকে জ্ঞাপন করিলেন,—'যদি তিনি হোমরুল লীগে যোগদান করেন তাহা হইলে তাঁহাকে হোমরুল লীগের কলিকাতার শাখা হইতে মনোনয়ন করা হইবে; এবং তাহাব ফলে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে সুরেন্দ্রনাথের নির্ব্বাচন অপ্রতিবাদে গৃহীত হইবে। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন পুরুষসিংহ! জীবনে কাহারও ভ্রূকুটী তাহাকে বিচলিত করিতে অথবা কোন শক্তিশালীর সদয়হাস্যের রেখা তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে কোন দিন সক্ষম হয় নাই। উভয় প্রলোভনই উপেক্ষিত হইল।

শ্রীমতী বেশান্তের মুক্তিলাভ

মিঃ মণ্টেগু ভারত-সচিবরূপে নিযুক্ত হওয়ার ফলে শ্রীমতী বেশান্ত মুক্তিলাভ করিলেন। বহুদিন পরে বিলাতের ইণ্ডিয়া আফিসে আবার একটু অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হইল; এবং সেই সঙ্গে ভারতে জনমতের আর একবার বিজয় ঘোষিত হইল।

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের সৃষ্টি

শ্রীমতী অ্যানি বেশান্তের অন্তরীণের ফলে 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' নামক একটি কার্য্যপ্রণালী জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হয়।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ—

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পরিকল্পনা প্রথমে কাহার মস্তিষ্কে আবির্ভাব হয় তাহা বলা শক্ত। সম্ভবতঃ মিঃ গান্ধীই ইহার প্রবর্ত্তক। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য কলিকাতায় আসিয়া বন্ধুবান্ধবদের লইয়া এক ঘরোয়া বৈঠক করেন, তাহাতে এই নব আন্দোলনটিকে কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ

সম্বন্ধে আলোচনা হয়। আমি তখন বায়ু-পরিবর্ত্তনার্থে রাঁচিতে অবস্থান করিতেছিলাম। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধটিকে একটি রাজনৈতিক অস্ত্ররূপে বর্ত্তমান সময়ে ব্যবহারে বাঙলাদেশের অধিকাংশ নেতাগণ মোটেই স্বীকৃত ছিলেন না। ইহা আমি জানিতাম। ইহার অল্পদিন পরে বোম্বাই সহরে নিখিলভারত কংগ্রেসের এক অধিবেশন হইল। এই সভায় নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সম্বন্ধে আলোচনা চলে। কংগ্রেসের একজন ভূতপূর্ব্ব প্রবীণ সভাপতি হিসাবে আমাকেই সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে হয়। সেখানে একটি শক্তিশালী দল নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ গ্রহণের সপক্ষে উপস্থিত রহিয়াছেন দেখা গেল। আমাদের বাঙালী সহকর্ম্মাগণ অধিকাংশই অন্ততঃ ইহার বিপক্ষে দাঁড়াইলেন। সে এক সঙ্কট সঙ্কুল অবস্থা! আমরা ইতিপূর্ব্বে এক গোপন বৈঠকে আমাদের পন্থা স্থির করিয়া লইয়াছিলাম। আমি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া দেখিয়াছি, যখনই আমাকে কোন প্রকার সঙ্কট-সঙ্কুল অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, তখন—মন্থর গতি অবলম্বন করায় অবস্থার পুনরুদ্ধার সম্ভবপর হইয়াছে। আমি যুক্তি দিলাম—এই প্রশ্নের আলোচনা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া,—বিষয়টি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীগুলিকে জ্ঞাপন করিবার জন্য এই সভায় এক প্রস্তাব করা যাউক। আমার মূল উদ্দেশ্য, এইভাবে কিছু সময় লাভ করা। তাহার ফলে বর্ত্তমান উত্তেজনার প্রবাহ অনেকটা প্রশমিত হইয়া যাইবে, তখন জনসাধারণের চিত্তে সাধারণ জ্ঞান-বিবেক ও বিচার-বুদ্ধি পুনর্বায় ফিরিয়া আসিবে। আমার এই যুক্তি সর্ব্বতোভাবে গ্রহণীয় বলিয়া বিবেচিত হইল।

যেদিন সভায় এই বিষয়টি আলোচনার জন্য উপস্থিত করা হইল, সেদিন দর্শকগণের মনোভাব দারুণ উত্তেজনায় পূর্ণ। আমি তর্ক বিতর্কের জন্য বক্তাগণকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিলাম। সেদিন সময় অল্প থাকায়—সভা পরদিনের জন্য মুলতুবী রহিল। পরদিন আমি যাহা আশা করিয়াছিলাম ঠিক তাহাই হইল। সকালবেলা সভারম্ভের পূর্ব্বে দেখা গেল দর্শকগণের সে উত্তেজনা বহুলাংশে প্রশমিত হইয়া গিয়াছে। বক্তার পর বক্তা উঠিয়া বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। শেষপর্য্যন্ত মিঃ তিলক

প্রস্তাব করিলেন যে এই বিষয়টি সম্বন্ধে বিচার করিবার জন্য একটি কমিটী নিয়োগ করা হউক। আমার পূর্ব্বাহ্নে স্থিরীকৃত খসড়ার প্রতি মিঃ প্রভাসচন্দ্র মিত্রের (পরে স্যার) সম্পূর্ণ আস্থা ছিল। এইবার তাঁহার কথা বলিবার উপযুক্ত অবসর মিলিল। তিনি আমার রচিত খসড়ার প্রস্তাবটি সভায় উপস্থিত করিলেন এবং উপযোগীতার দিক দিয়া এ সম্বন্ধে প্রাদেশিক কমিটীগুলির মন্তব্য দাখিল করিবার নির্দ্দেশ দিলেন। একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই বিবরণ দাখিল করা নির্দ্ধারিত হইল। স্থির হয় যে অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে মন্তব্য সম্বলিত বিবরণগুলি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীতে দাখিল করিতে হইবে। এই প্রস্তাবটি একপ্রকার অপ্রতিবাদে গৃহীত হইল। এইভাবে একটি সঙ্কট সঙ্কুল অবস্থা আমরা নির্ব্বিঘ্নে পার হইয়া গেলাম।

এইরূপে প্রত্যেকটি বিষয় যেন দর্শাইতে লাগিল যে, 'অনতিবিলম্বে সরকারের মুখ হইতে স্বায়ত্তশাসন ঘোষিত হউক।' এবং যদি অক্টোবর মাসের নিখিল ভারত কংগ্রেস মহাসভার অধিবেশনের পূর্ব্বে এই স্বায়ত্ত-শাসন ঘোষিত হইত, তাহা হইলে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মূলে যে উত্তেজনা ও বিক্ষোভের অগ্নি ধূমায়িত হইতেছিল, হয়ত উহা নির্ব্বাপিত হইয়া যাইত।"

নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সাফল্য সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথের সন্দেহের হেতু

সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

"যাঁহারা বঙ্গবিচ্ছেদের ও স্বদেশী আন্দোলনের অগ্নিপরীক্ষার সহিত সংযুক্ত ছিলেন তাঁহারা ইহা ভালভাবেই জানিতেন যে—এই অনলের গণ্ডী উত্তীর্ণ হইতে হইলে কি ভাবের পারিপার্শ্বিক অসুবিধা ও কর্ত্তৃপক্ষের বাধার সম্মুখীন হইতে হয়। অবশ্য সরকারী উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণের আদেশেই যে এই সকল বাধা প্রদান হইয়া থাকে, তাহাতে ভুল নাই; এবং উহা বৈধ কি অবৈধ তাহা বিচার করিবার পূর্ব্বে, ইহা বলা চলে যে দমনের উদ্দেশ্যে প্রয়োগিত শক্তির মাত্রা কিন্তু বহুস্থানে সীমা ছাড়াইয়া

গিয়াছিল। বরিশাল সম্মেলনের ঘটনা (যেখানে আমরা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ অবলম্বন করিয়াছিলাম), সিরাজগঞ্জের অধিবাসীগণের প্রতি অকথ্য অত্যাচার, বনারীপাড়া এবং অন্যান্য স্থানে স্বদেশী কর্ম্মীগণের প্রতি নির্য্যাতনের ইতিহাস আমাদের হৃদয়ে তখনও পূর্ণভাবে জাগরূক ছিল। সেই জন্যই আমরা স্থির বুঝিয়াছিলাম যে,—যাবৎ জনসাধারণ হৃদয়ের আবেগে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকে গ্রহণ না করিবেন, অথবা ইহার জন্য সকলপ্রকার দুঃখ ঝঞ্ঝাকে হাসিমুখে বরণ করিতে—বহুসংখ্যক ব্যক্তি অগ্রসর না হইবেন, তাবৎ ইহার দ্বারায় কোন প্রকারের ফললাভের আশা বৃথা। তথাকথিত অবস্থা যে বর্ত্তমান সময় পাওয়া সম্ভব হইবে এবিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। সুতরাং নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভায় এই প্রস্তাব স্থগিত হওয়ায় আমরা যথেষ্ট আনন্দিত হইয়াছিলাম। ইহার ফলে আমরা এসম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণা করিবার অবসর পাইব। আমাদের ইহাও আশা হইয়াছিল যে, হয়ত অদূর ভবিষ্যতে সময়ের পরিস্থিতি ও উন্নতির ফলে, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নিস্প্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছনীয় হইয়া যাইবে।”

বিপ্লবী দলের প্রথম হত্যা

মেদিনীপুরের জিলা সম্মেলনের ঘটনা এবং উহার অব্যবহিত পরে সুরাট কংগ্রেসের কীর্ত্তি কাহিনী অর্থাৎ সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশন পণ্ড করিবার জন্য অনুষ্ঠিত হিংসাপূর্ণ ঘটনা সমূহ, যাহা অরাজকতার নামান্তর, আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতির পথে কিরূপ পরিপন্থী হইয়াছিল, তাহা যে কোন অপক্ষপাত দর্শকের লিখিত আগাগোড়া বিবরণ পাঠ করিলেই সম্যক বুঝিতে পারা যায়।

অল্প দিনের মধ্যেই আর একটি কুলক্ষণ পরিদৃশ্যমান হইল; এবং ইহার পরিণতি বিশদভাবে অনুভূত হইতে অধিক দিন বিলম্ব লাগিল না।

১৯০৮ সালের ১লা মে সমগ্র কলিকাতাবাসী স্তব্ধ হইয়া শ্রবণ করিলেন যে, বিগত সন্ধ্যায় মজঃফরপুর সহরে বোমার দ্বারায় এক ভীষণ আক্রমণ সংঘটিত হইয়াছে এবং এই নিদারুণ অনাচারে নিহত হইয়াছেন—তথাকার

খ্যাতনামা উকিল মিঃ প্রিংগেল কেনেডির সহধর্ম্মিনী এবং তাঁহার ষোড়শ-বর্ষীয়া তরুণী কন্যা !

দুর্ভাগ্যের পরিহাস আরও যে, কংগ্রেস আন্দোলনের প্রতি যে কয়জন মুষ্টিমেয় ইউরোপীয় ব্যক্তি সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন, মিঃ কেনেডি তাঁহাদের অন্যতম। এমনকি একবার তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতিত্বও করিয়াছিলেন।

বোমা নিক্ষেপকারিদের আসল লক্ষ্য কিন্তু ছিলেন—মিঃ কিংসফোর্ড, মজঃফরপুরের জেলা জজ। তিনি কিছুদিন কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে কার্য্য করেন। সেই সময় স্বদেশী কর্ম্মীগণের প্রতি তিনি কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করিতেন; ইহার ফলে তিনি জনসাধারণের বিশেষ অপ্রিয়ভাজন হইয়া পড়েন। এই অসন্তোষের মাত্রা চরমে উঠে যখন তিনি অনেকগুলি ভদ্রযুবকের প্রতি শারীরিক শাস্তির বিধান দেন। জনসাধারণের ধারণায়—তাঁহার প্রদত্ত এই সকল কারাদণ্ডের আদেশগুলি বিধি বহির্ভূত ছিল। তদুপরি শারীরিক শাস্তির প্রয়োগে লাঞ্ছিত ব্যক্তিগণকে আরও হেয় ও অপমানিত করা হইয়াছিল। এই ব্যবস্থার ফলে কতকগুলি স্বদেশী কর্ম্মীদের অন্তরে দারুণ আঘাত লাগে; তাহারা ইহার প্রতিশোধ গ্রহণে কৃতসঙ্কল্পিত হয়।

ক্ষুদিরাম বোস ও প্রফুল্ল চাকি নামক দুইটি যুবককে এই অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়; বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসির আদেশ হয় এবং প্রফুল্ল চাকি ধরা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে গুলি করিয়া আত্মহত্যা করে।

সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

"ইহা সজ্ঞানকৃত এক বীভৎস শোকাবহ ব্যাপার। এই প্রকারের কার্য্যাবলী যে সম্পূর্ণ অসাব তাহাতে ভুল নাই।"

মিঃ কিংসফোর্ডের এই শারীরিক শাস্তির দণ্ডাদেশ—প্রথম প্রয়োগিত হয় সুশীল নামে ১৪ বৎসর বয়সের একটি বালকের উপর। কিছুদিন আগে 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় লিখিত রাজদ্রোহ সূচক প্রবন্ধের জন্য অরবিন্দ বাবু অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিপিন পাল মহাশয়কে ঐ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করা হয়, কিন্তু তিনি সাক্ষ্য দিতে অস্বীকৃত হওয়ায়

তাঁহাকেও অভিযুক্ত হইতে হয়। তাঁর বিচারের দিন লালবাজার পুলিশ কোর্টের সম্মুখে লোকের ভিড়ের উপর একজন য়ুরোপীয় ইন্‌স্‌পেক্টার বেত চালাইতে থাকে। সুশীল এই অন্যায়ের প্রতিবাদস্বরূপ উক্ত ইন্‌স্‌পেক্টারের মুখের উপর ঘুসি চালাইবার অপরাধে সেই দিনই উক্ত মিঃ কিংসফোর্ডের বিচারে শাস্তিস্বরূপ ১৫ ঘা বেত্রদণ্ড লাভ করে। এই সুশীল ছিল, বাঙলাদেশের বৈপ্লবিক দলভুক্ত একজন তরুণ কর্ম্মী। সুতরাং ইহার প্রতিবিধানার্থে বিপ্লবীদল কর্তৃক মিঃ কিংসফোর্ডের জীবন-নাশের সঙ্কল্প হইল, এবং পন্থাও স্থির করিয়া ফেলিল।

মজঃফরপুরে মিঃ কিংসফোর্ডের জীবননাশের জন্য এই প্রচেষ্টাই যে প্রথম তাহা নহে; ইহার পূর্ব্বেও তাঁহাকে হত্যার জন্য আর একটি প্রচেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তিনি সে প্রচেষ্টার হাত এড়াইয়া যাইতে পারিয়াছিলেন।

এসম্বন্ধে বাঙ্গলার বিপ্লব কাহিনী প্রবন্ধে উল্লেখ আছে,—

"মিঃ কিংসফোর্ডের জন্য প্রথমে যে বোমাটা তয়ের হয়েছিল সেটা হচ্ছে—একখানা বড় বইয়ের মাঝখানে নাকি যায়গা করে বোমাটা এমন ভাবে রাখা হয়েছিল যে, বইখানা খুললেই বোমা ফেটে যেত। বইখানা একটা ফিতে দিয়ে বাঁধা ছিল। একখানা লম্বা খামের খানিকটা বইয়ের ভিতর থেকে একদিকে এমনভাবে বেরিয়েছিল যে, ফিতে না খুলে টানলে বেরিয়ে নাকি আসত না।

জানা গেছল, মিঃ কিংসফোর্ড মিসেস মঙ্কের গ্রাণ্ড হোটেলে থাকতেন এবং সাড়ে নটার পর নিজের অফিসযানে কোর্টে যেতেন। গাড়ীতে ওঠবার সময় ঐ খানা দিতে গিয়ে জেনে এসেছিল, তিনি ঠিক তার আগের দিন টালিগঞ্জে একটা বাড়ীতে উঠে গেছেন। তারপর টালিগঞ্জের বাড়ী খোঁজ করে আর একদিন সন্ধ্যেবেলা বইখানা তাঁর হাতে দিয়ে এল। কিন্তু এমনি তাঁর জোর বরাত বইখানা না খুলেই আল্‌মারিতে রেখে দিয়েছিলেন। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় উক্ত লেফাফা খানাতে কি চিঠি ছিল, তা পড়বার প্রবৃত্তিও তাঁর হয়নি।"

এ সম্বন্ধে রাউলাট কমিশন রিপোর্টে যা লিখিত আছে, তা নীচে উদ্ধৃত হইল।

* * * "The police had received information 10 days before that the murder of Mr. Kingsford intended, and during the next year a well-known revolutionary, when in custody, said that before this outrage a bomb had been sent to Mr. Kingsford in a parcel. Upon search being made, a parcel was found which Mr. Kingsford had received but not opened, thinking it contained a book brrowed from him. The parcel did contain a book ; but the middle portion of the leaves had been cut away and the volume was thus effect a box and in the hollow was contained a bomb with a spring to cause its explosion if the book was opened.

* * * Fifteen were ultimately found guilty of conspiracy to wage war against the King-Emperor, including Barindra Kumar Ghosh * * * Hemchandra Das * * * and another who made the statement already alluded to and so strikingly confirmed as to the sending of a bomb in a parcel to Mr. Kingsford." (Sedition Commitee 1918 Report. Page 32, Para 37 and 38.)

মুরারীপুকুর ষড়যন্ত্র ধৃত

ইহার সঙ্গে সঙ্গে মুরারী পুকুরের ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে এবং দলপতিগণের প্রতি কঠিন শাস্তি প্রদান করা হয়। অধিকাংশকেই দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল।

এই সম্বন্ধে মুরারীপুকুর ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী দ্বীপান্তর প্রত্যাগত শ্রীহেমচন্দ্র কানুনগো, যে কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন, তাহা এইস্থলে উদ্ধৃত হইল।—

১৯০৮ সালের—মে মাস

৩০শে এপ্রিল মজঃফরপুরে খুদিরাম মিঃ কিংসফোর্ডের পরিবর্ত্তে মিসেস ও মিস কেনেডিকে বোমা দ্বারায় হত্যা করে। তার সপ্তাহ খানেক আগে তারা কল্‌কাতা থেকে রওনা হয়েছিল। পূর্ব্বেই বলেছি সন্ধ্যার পর গোয়েন্দা পুলিসের ছুটি হয়ে যেত। সন্ধ্যার পর ওরা যাত্রা করেছিল বলে পুলিস তাই ওদের পেছন নিতে পারেনি।

ওদের দুইজনই আমাদের গুপ্ত সমিতির পুরাণো সভ্য ছিল এবং অন্যের তুলনায় সবচেয়ে চতুর, কর্ম্মক্ষম আর উপদেশ পালন সম্বন্ধে বাঙ্গালার ক্যাসেবিয়াঙ্কা বলেই বিবেচিত হত! দু'তিন বৎসর যাবৎ তথাকথিত অনেক honest attempt করেছিল। খুদিরাম একবার ফৌজদারী সোপর্দ্দও হয়েছিল। তবু কিন্তু কাযের বেলায় সবই উল্টো করেছিল। কথা ছিল, বোমা ফেলতে যাওয়ার সময় তাদের বেশভূষা অন্য প্রদেশবাসীর অনুকরণে বদল করে বোমা ফেলা হয়ে গেলে পর তারা আবার সাধারণ বাঙ্গালীর বেশ ধরবে! তখন যা শুনেছিলাম, তাতে মনে হয়, ঠিক উপদেশ মত কাজ তারা করেনি। তার কারণ বোধহয় এই ছিল যে উপদেশ মত চলা গুপ্ত সমিতির প্রধান কর্ত্তব্য জেনেও তার আবশ্যকতা হয় ত উপলব্ধি করতে পারে নি, অথবা যে Suggestion phobia বাঙ্গালী চরিত্রের একটা বিশেষত্ব, সেই দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধি তাদেরও চরিত্রে ছিল। যে সকল কারণে বাঙ্গালীরা সৈন্য কাজে বিমুখ বা অক্ষম এই Suggestion phobia সেই সকল কারণের অন্যতম। এই থেকে মনে হয়, এদেশে বিপ্লব চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

বোমা ফাটলে রিভলবার ফেলে দেবার কথা ছিল, তাও দেয়নি।

উভয়ের, বিশেষ করে খুদিরামের ঐ জিনিষটার উপর একটা অত্যধিক অনুরাগ ছিল। একটা রিভলবার পাওয়ার জন্য সে বহুবার বহু সাধ্য সাধনা করেছিল; পাছে অপব্যবহার করে, এই ভয়ে তা দেওয়া হয়নি। মজঃফরপুরে যাওয়ার দিন দু'জনেই দুটো নিয়ে ছিল। অধিকন্তু আর একটা সে না বলে হস্তগত করেছিল। যেখানে রিভলবার রাখা হোত তা সে জানত। দুটো রিভলবার পাতলা জামার দু'পকেটে ঝুলছে আর দুহাতে খাবার খাচ্ছে, এহেন অবস্থায় বোমা ফাটার পরদিন রেল ষ্টেশনে সে ধরা পড়ল। আর রেলগাড়ীর একটা কামরায় সেই দিন সবইন্‌স্পেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জ্জী প্রফুল্লের বিকৃত চেহারা দেখে সন্দেহ করেন। তার পরের ষ্টেশনে তিনি পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষকে টেলিগ্রাম দ্বারা প্রফুল্লের কথা জানান। মোকামায় প্রফুল্লের সঙ্গে নন্দলালও নামলেন। আগে হ'তে প্রস্তুত পুলিশ তাকে ধরতে গেলে রিভলবার দ্বারা সে আত্মহত্যা করে।

ধরা প'ড়লে যা বলবার কথা ছিল তা বলেনি। বিশেষ ক'রে উকীলের সঙ্গে পরামর্শ না করে একটি কথাও যাতে না বলে, তা বিশেষ করে শিখান হয়েছিল। প্রফুল্লের ধরা পড়বার পর কথা বলবার অবসর হয় নি যদিও, কিন্তু ধরা পড়বার পূর্ব্বে কথা বলেই যত গোল বাঁধিয়েছিল। খুদিরাম প্রথমে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে একরকম স্বীকারোক্তি দিয়ে সেসন কোর্টে নাকি তা সংশোধন করে অন্য রকম দিয়েছিল। তার কারণ বোধহয় এই ছিল যে, দু'জনের মধ্যে কে এই কীর্ত্তি করেছে, স্বীকারোক্তি না দিলে সাধারণের নিকট পাছে অজানিত থেকে যায় বা প্রফুল্ল করেছে বলে পাছে লোকে ধরে নেয়, এই সন্দেহে স্বীকারোক্তি দেওয়ার লোভ খুদিরাম সংবরণ করতে পারেনি। তার স্বীকারোক্তিতে প্রফুল্ল ছাড়া আর কারও নাম প্রকাশ করেনি, বা গুপ্ত সমিতির সম্বন্ধেও কিছুই বলেনি।

প্রফুল্লের প্রকৃত নাম খুদিরাম জানত না। তাই তাকে দীনেশ বলে উল্লেখ করেছে। প্রফুল্ল বোধহয় এই নামেই তার কাছে পরিচিত ছিল। প্রথম উক্তিতে বলেছিল, দীনেশের সঙ্গে নাকি তার প্রথম দেখা হাওড়া

ষ্টেশনে। স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে আলাপের পর খুদিরাম 'সাহেব' হত্যার সঙ্কল্প প্রকাশ করে। তদনুযায়ী দীনেশ তাকে বোমা আদি দেয়, এবং মজঃফরপুব পর্য্যন্ত সঙ্গে থেকে সাহায্য করে। বোমা ছোঁড়বার আগের দিন পর্য্যন্ত যে রকম গাড়ীঘোড়া চড়ে যে সময় মিঃ কিংসফোর্ড ক্লাব থেকে বাঙ্গলায় আসতেন, ঠিক সেই সময় ঠিক সেই রকম ঘোড়া-গাড়ীতে মিস্ আর মিসেস কেনেডি উক্ত কিংসফোর্ডের বাঙ্গলায় গিছলেন। তাই নাকি তাদের ভুল হয়েছিল।

দ্বিতীয় উক্তিতে সে অনেকটা দোষ প্রফুল্লের ঘাড়ে চাপিয়েছিল। তখন সে জেনেছিল, প্রফুল্ল আত্মহত্যা করেছে। কাজেই তার ঘাড়ে অপরাধের গুরুত্ব চাপিয়ে দিলে হয়ত ভেবেছিল নিজের দণ্ড লঘু হতে পারে। এই প্রাণের মায়াটা বিশেষ করে বাঙ্গলা দেশে যে কি রকম স্বতঃস্ফুর্ত্ত, তা পূর্ব্বেই বিশেষ করে বলেছি। তা সত্ত্বেও একথাটা যে সে নিছক প্রাণের মায়াতেই করেছিল, তা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। কারণ, আমবা শুনেছি খুদিরামের পক্ষের উকীল বাবুরা অনেক চেষ্টায় তাকে এবকম স্বীকারোক্তি সংশোধনে রাজি করেছিলেন। এটা যে তাদের অকারণ চেষ্টা, আর তার ফাঁসীটা যে নিশ্চয় তা জেনেও উকীল বাবুদের অনুরোধেই নাকি স্বীকারোক্তি-সংশোধনে রাজি হচ্ছে বলে সে বলেছিল। খুদিরামের পক্ষ সমর্থনের জন্য মেদিনীপুর, কলকাতা বা পশ্চিম বাঙ্গালা থেকে কোন উকীল যাননি। গিয়েছিলেন রংপুর থেকে। বাঙ্গালী চরিত্রেব এ-ও একটি মহিমা।

যাই হোক, ঐ মজঃফরপুরের বোমাটা পিক্রিক এসিডে তৈয়ারী বলে সরকারী বোমা সম্বন্ধীয় বিশেষজ্ঞেরা যে মত প্রকাশ করেছিলেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

কলিকাতায় খানাতল্লাসী ধরপাকড়

৩০শে এপ্রিল সেই বোমা বিভ্রাট ঘটে। ১লা মে কলকাতায় পুলিশের পরামর্শ মজলিসে, বারীণের সংস্পর্শে যারা তখন এসেছিল তাদের যে যেখানে ছিল, সকলকে একসময়ে পাকড়াও করা স্থিরীকৃত

হয়। ২রা মে প্রত্যুষে সাড়ে তিন কি চারটের সময় নিম্নলিখিত স্থান সকল খানাতল্লাসী আর নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হয়।

১। মাণিকতলা মুরারীপুকুর গার্ডেন—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, বিভূতিভূষণ সরকার, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দুভূষণ রায়, উল্লাস কর দত্ত, নলিনীকান্ত গুপ্ত, পরেশ মৌলিক, বিজয় নাগ, শচীন সেন, শিশির ঘোষ, নরেন বক্সী, কুঞ্জলাল সাহা, পূর্ণ সেন, হেমেন্দ্র ঘোষ এই চৌদ্দজন। এছাড়া ঐ পাড়ার অন্য বাগানের এক মালী ও ভদ্রলোকের দুটি ছেলেকেও পুলিশে ধরে এনেছিল। দুদিন পরে তারা ছাড়া পায়।

২। ১৫ নং গোপীমোহন দত্তের লেনে—কানাইলাল দত্ত ও নিরাপদ —ওরফে নির্ম্মল রায়।

৩। ১৩৪ নং হ্যারিসন রোডে, কবিরাজ দুইভাই নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ধরণী গুপ্ত ও অশোক নন্দী। এছাড়া যে দু'জন ধৃত হয়েছিল তারা কয়েকদিন পরে ছাড়া পায়।

৪। ৮নং গ্রে ষ্ট্রীটে—শ্রীযুক্ত অরবিন্দ বাবু, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য ও শৈলেন্দ্র বোস এই তিনজন।

৫। ৩৮।৪ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে—হেমচন্দ্র দাস (ওরফে হেমচন্দ্র কানুনগো)

৬। মেদিনীপুরে—সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

মাণিকতলা বাগানে ধৃত বারীণ প্রভৃতির উল্লেখ অনুযায়ী ও সেখানে প্রাপ্ত খাতাপত্রে লিখিত নামের তালিকায় তাদের কাছ থেকে জেনে পরে যাদের ধরা হয়েছিল, তারা হচ্ছে শ্রীরামপুরের—নরেন্দ্র গোঁসাই, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল, খুলনার—সুধীর সরকার, যশোরের—বীরেন্দ্র ঘোষ, মালদহের—কৃষ্ণজীবন সান্ন্যাল, সিলেটের—তিন ভাই হেমচন্দ্র সেন, জীবেন্দ্রচন্দ্র সেন ও সুশীলকুমার সেন। নাগপুরের বালকৃষ্ণ হরি কাণে।

আমাদের মধ্যে থেকে সন্ধান পেয়ে এবং পরবর্ত্তী তদন্তের কালে কয়েক সপ্তাহ পরে ধৃত হয়ে এসেছিলেন—দেবব্রত বসু, ইন্দ্রনাথ নন্দী,

যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাসচন্দ্র ওরফে মাণিক দেব, বিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, নিখিলেশ্বর রায়, আর চন্দননগরের ডুপ্লে কলেজের প্রফেসার চারুচন্দ্র রায়।

এ ছাড়া দু'তিন মাসের মধ্যে আরও অনেক নির্দ্দোষীকে দিন কয়েকের জন্য ধরে জেলে পোরা হয়েছিল। তার মধ্যে ছিলেন স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন।

যে কয় যায়গায় খানাতল্লাসী হয়েছিল তার মধ্যে দুটি স্থান ব্যতীত আর কোথাও দুএক খানা চিঠিপত্র ছাড়া, বিপ্লব সংক্রান্ত আর কিছুই পাওয়া যায়নি। উক্ত মুরারীপুকুর বাগানে পেয়েছিল বোমার সেল ঢালাই করবার যন্ত্রপাতি ;—রিভলবার, বন্দুক, রাইফেল (সর্ব্বসমেত ছ, সাতটা), Noble's dynamite কতকগুলি ; ইলেকট্রিক ব্যাটারী, ফিউজ, ইত্যাদি ; আর Mining Engineerদের পাঠ্য explosive শিখবার ইংরাজী বই দুখানা ; বৈপ্লবিক বোমা তৈয়ারী ও ব্যবহার শিখবার লিথোতে বৃহৎ পাণ্ডুলিপি একখানা, বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি গঠন প্রণালীর খাতাদি অন্যান্য আরও কতকগুলো বই, নোটবুক, কাগজপত্র ইত্যাদি।

হ্যারিসন রোডে কবিরাজ বাড়ীতে কয়েক বাক্স বোমা আর explosive তৈয়ারীর যন্ত্রপাতি ও মসলা পাওয়া গিয়াছিল।

নিরীহ কবিরাজ দুটির বাড়ীতে বোমার মালমসলা পাবার ইতিহাস এই ;—খুদিরাম ও প্রফুল্লের মজঃফরপুর যাত্রার পূর্ব্বে এই রকম বন্দোবস্ত ছিল যে, সেখানে (মজঃফরপুরে) অনুষ্ঠান সব ঠিক হয়ে গেলে, কাজ হাসিল করবার পূর্ব্বে সাঙ্কেতিক প্রথায় আমাদের খবর দেবে। তখন আমরা নিজেদের বাড়ী ছেড়ে অন্য কোথাও গাঢাকা দিয়ে থাকব। আমরা প্রস্তুত হতে লেগে গেলাম ; কথা স্থির হল সকলে নিজ নিজ বাড়ী বা আড্ডা থেকে বিদ্রোহসূচক জিনিষ সরিয়ে ফেলবে। যন্ত্রপাতি ও সন্দেহজনক সমস্ত জিনিষ পাঁচ ছটা বাক্সে পুরে ফেলা হয়েছিল। উল্লাস ভায়াকে এই ভার দেওয়া হয়েছিল যে, সন্ধ্যার পর ঐ সব মাল সমেত নিয়ে

কয়লাঘাটে একখানা নৌকা পৃথকভাবে ভাড়া করে শিবপুর ইঞ্জিনিয়াবিং কলেজে তার বাবার ল্যাবোরেটারিতে পাড়ী দেবে। উক্ত বাক্স গুলোর দুটোতে এমন অনেক যন্ত্রপাতি ছিল, যা যে কোন ল্যবরেটারিতে থাকলে সন্দেহের কোন কারণ হোত না। সেই বাক্স দুটো ছাড়া আর সব মাঝ গঙ্গায় ডুবিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। কার্য্যতঃ কিন্তু তা হোলনা। সেই সব চার পাঁচটা বাক্স দিনের বেলা ঘোড়ার গাড়ী করে হ্যারিসন রোডে উল্লাসের এক নিরীহ আত্মীয় কবিরাজের বাড়ীতে রাস্তার ধারে বসবার ঘরে রেখে গেল। পুলিসও সঙ্গে সঙ্গে সেইদিন থেকে সেখানে গুপ্ত পাহারায় রইল।

২রা মের বিভিন্ন স্থানের ধৃত ব্যক্তিদিগকে লাল বাজার পুলিস হাজতে ভিন্ন ভিন্ন ঘরে পৃথকভাবে রাখা হয়েছিল। বিকেলবেলা পুলিস কোর্টের উঠানে সকলকে বের করা হ'ল। তখন আমরা সকলে সকলকে দেখে হতভম্ব হয়ে গেলাম। কারণ, প্রত্যেক দলই মনে করছিল, কেবল তারাই ধরা পড়েছে। তখন দেখলে, গুপ্ত সমিতির বংশে বাতি দিতে আর বাকী প্রায় কেউ নাই। সকলেরই মুখ অত্যন্ত ভীষণভাবে বিকৃত হয়ে গেছল। আমার বেশ মনে আছে, তখন কারও মুখে নির্ভিকতার চিহ্নমাত্র না দেখতে পেয়ে বড়ই অশুভ লক্ষণ বলে বুঝেছিলাম।

সকালে ছেকড়া গাড়ী বোঝাই হয়ে আগে পিছে এক ঝাঁক গোরা কালা পুলিসের পাহারায় কিড্ ষ্ট্রীটের সি, আই, ডি, অফিসে খুব জাঁক জমকের সঙ্গে নীত হয়েছিলাম। পথে এমন একটাও চেনা লোক কিন্তু চোখে পড়লনা যে, ভারতের এই অভূতপূর্ব্ব বীরদের দর্শন করে ধন্য হয়ে যেতে পারে। রাস্তায় দু'সারি লোকদের মুখের ভাবে তখন বুঝেছিলাম, আমরা যে কি ভীষণ কীর্ত্তিমান পুরুষ তা তারা জানতে পারেনি, আর তাদের জানবার তেমন প্রবৃত্তিও যেন ছিল না। দশবারো ঘণ্টার মধ্যে এমন একটা ভীষণ ব্যাপারের খবর সমস্ত কোলকাতাময় রাষ্ট্র হয় নি ! এই রকম কোন দুঃখ বা অভিমানের ছায়া যে আমাদের মধ্যে কারোর মনে পড়েনি, একথা কেউ মাথার দিব্বি করে বল্লেও তখন বিশ্বাস করতে পারিনি। এখন বুঝছি তখনকার কলিকাতাবাসীরা

ব্যাপারটার বিশেষ কোন কিছু না। বুঝেও ঐরকম স্থলে নিরাপদ ভাবের উদ্বেল উচ্ছাস কি করে হঠাৎ দল বেঁধে প্রকট করতে হয় তাতে তালিম পান নি।

তখনও আশা ছিল যে, আমরা যে রকম আগে থেকে সাবধান হয়েছি, তাতে খুব জোর একবৎসরের বেশী শ্রীঘর বাস হবে না। এতে বরং আমাদের জেল থেকে বেরিয়ে এসে কায করবার পক্ষে, বিশেষ করে টাকার সাহায্য পাবার পক্ষে খুব সুবিধাই হবে। কারণ কোন গুণ না থাকলেও শুধু জেলে গেছলাম এই সার্টিফিকেট তথা কথিত দেশের কায করতে গিয়ে, লোকের কাছে আদর কাড়াবার আর আর্থিক, নৈতিক আদি সর্ব্ববিধ সহানুভূতি ও সাহায্য পাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট মূল্যবান হবে বলে সেকালেও ধরে নিতে পেরেছিলেম। তখনও জানতাম না যে মুরারিপুকুরে ও হ্যারিসন রোডে কি কি মাল ধরা পড়েছে, আর বারীন কি রকম 'clean breast' দেখিয়েছে বা পরে সে কি করবে। এই clean breast কথাটা সকল পুলিশ অফিসারের মুখে তখন লেগেই ছিল।

তারপর আমাদের প্রত্যেককে সি, আই, ডি, অফিসে পৃথক পৃথক বাসায় পুলিশের এক এক জন ধুরন্দর এক এক দলের একরার করাবার ভার নিয়েছিলেন। বারীন, উপেন, প্রভৃতি মুরারীপুকুরের দল ডেপুটী সুপারিন্টেন্ডেন্ট রায় রামসদয় মুখার্জ্জী বাহাদুরের হাতে পড়েছিল। আমার ঘাড়ে চেপেছিলেন মৌলভী সামশুল আলম। তিনি তখন সাবইনস্পেক্টর ছিলেন। আমাদের মোকর্দ্দমা শেষ হতে না হতেই তিনি ডেপুটী সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং খাঁ বাহাদুর ইত্যাদি হয়ে ছিলেন। অন্য দলের ভাগ্যে কে কে জুটেছিলেন, মনে নেই। একরার করাবার বিষম চেষ্টা খানিক রাত্রি পর্য্যন্ত চলেছিল। তারপর কোথায় কাকে রেখেছিল, জানতে পারিনি। শুনেছিলাম, বারীন সেই আফিসেই সম্মানীত অতিথিরূপে ভোজন বিশেষ করে শয়নের যথেষ্ট আনন্দ নাকি উপভোগ করেছিল। অরবিন্দ বাবুর ভাগ্যেও বোধ হয় তা জোটেনি। আমায় রেখেছিল লালবাজার পুলিসকোর্টে হাজতে, মুরারিপুকুরে ধৃত

পূর্ব্বোক্ত মালীর সঙ্গে। ভোজনের জন্য পেয়েছিলাম মুড়ী, আর শয়নের জন্য কম্বল, তাও অত্যন্ত ময়লা। একেই বলে এক যাত্রায় পৃথক ফল।

ধৃত আসামীদের একরার করবার জন্য পুলিসের দ্বারা কি কি violent উপায় অবলম্বিত হয়, আগে হ'তে তা খোঁজ করে জেনেছিলাম। কিন্তু violent কোন উপায়ই আমাদের ওপর প্রয়োগ করা হয় নি। আমাদের ওপর যে কয়টি কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছিল, তা নেহাৎ মামুলী ও non-violent.

প্রথমে স্নান আহার বন্ধ করে দেওয়া, তারপর রাত্রিতে ঘুমোতে না দিয়ে ক্রমাগত প্রশ্নের উপর প্রশ্নের দ্বারা তিতিবিরক্ত করে সহজ বিচার-বুদ্ধিকে একেবারে গুলিয়ে দেওয়া, এইগুলি হচ্ছে আসামীকে একরার করাবার পুলিশের প্রচলিত প্রথা।

আমাদের মধ্যে বারীন ছাড়া প্রায় সকলের প্রতি এই রকমই বিধি ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বারীনের জন্য এর কতকটা উল্টো ব্যবস্থাই ফলপ্রদ হবে বলে বোধ হয় রায় বাহাদুর রামসদযবাবু বুঝে ফেলেছিলেন।

আমায় সেদিন সকালবেলা একজন গোরা ওয়ার্ডার খানিকটা দুধশূন্য চা আর রুটি বোধ হয় এই জন্যেই দিয়েছিল। সে এসে প্রথমে আমায় বল্‌লে, আমার কাছে যদি টাকা কড়ি এবং মূল্যবান জিনিষ থাকে তা তাকে দিতে হবে। সেগুলি যথারীতি আমার নামে সরকারে গচ্ছিত থাকবে। আমি ভালছেলের মত সোনার বোতাম, আংটী, দু'তিন খানা পাথর (আমি তখন jewellery business এর ভাণ করতাম) ও কয়েকটি টাকা সমেত ব্যাগ তার হাতে দিলাম। সেই সঙ্গে আমার breakfast এর উল্লেখ করেছিলাম। তৎক্ষণাৎ রুটী-চা নিয়ে এসে অনেক কিছু বলে আমায় সুখী করে দিয়ে ছিল। সব মনে নেই। একটা মাত্র কথা মনে আছে সে বলেছিল, কোনদেশে বিপ্লবের আগুন একবার জ্বললে কখনও একেবারে নিভে যায় না। আর তার ফল কখনও মন্দ হয় না। তার এত কৃপার কারণ, দেড়বছর পরে পোর্ট ব্লেয়ারে যাওয়ার সময় আমার গচ্ছিত ধনের বদলে পেতলের বোতাম আর আংটীটি মাত্র ফেরৎ পেয়ে বুঝেছিলাম।

যাই হোক সে দিন রাত্রিতে দুটি মুড়ী সেই বিপদের সঙ্গী উড়ে মালীর সঙ্গে বসে খেয়েছিলাম। বেচারী কি কান্নাই না কেঁদেছিল।

মনে হচ্ছে প্রথম রাত্রিতে খুব বেশীক্ষণ জাগিয়ে রাখবার চেষ্টা হয়নি অথবা কর্ত্তাদের নিজেদেরই নিদ্রার প্রয়োজন হয়েছিল। কারণ, তার আগের দুদিন সমস্ত রাত্রি জাগতে হয়ে ছিল।

সেই দিন প্রথমে মৌলভী সাহেব আমার কাছে প্রেম নিবেদন করে বলেছিলেন, তাঁর মত বন্ধুর কথা মেনে চল্‌লে আমার দোষ খণ্ডে যাবে। তিনি মেদিনীপুরের কোর্ট সাবইনস্‌পেক্টার ছিলেন। এমন মিষ্টভাষী মিশুক পুলিশের লোকের মধ্যে দেখিনি! মেদিনীপুরের কোর্টে আমায় প্রায়ই যেতে হোত, গেলে তাঁর অফিসে আড্ডা দিতাম, সেইসূত্রে বন্ধুত্বের দাবী ও প্রেম নিবেদন!

না খেয়ে না ঘুমিয়ে দিনের পর দিন ক্রমাগত আঁতের কথা নিয়ে পুলিশ নামক জীবের সঙ্গে নিয়ত বক্ বক্ কর্‌লে পেসাদার আসামী ব্যতীত খুব কম লোকই মাথা ঠিক রাখতে পারে। এই রকম ক'রে কিছু না কিছু অপরাধ প্রকাশ করে ফেলতে আসামীরা বাধ্য হয়ে থাকে। একবার কোন গতিকে একটু প্রকাশ করে ফেললে আর চেপে রাখা বড়ই শক্ত।

এ ছাড়া রামসদয় বাহাদুর বারীন প্রভৃতির ওপর কিন্তু আর একটা অভিনব কৌশল প্রয়োগ করে ছিলেন। তার নামকরণ কি যে করব খুঁজে পেলাম না। তাই বারীন উপেনের কাছে পরে যা শুনেছিলাম তার সার মর্ম্ম এখানে প্রকাশ করে বলি।

প্রথম দর্শনেই উক্ত রায় বাহাদুর বারীন উপেন প্রভৃতিকে বহু-দিনের অভিন্ন হৃদয় বন্ধুর মত প্রগল্‌ভ আদরে অভ্যর্থনা কর্‌লেন। তাঁর অগাধ হৃৎপিণ্ডে দেশহিতৈষণা আর বিপ্লববাদ হুগলীনদীর চোরা-বালীর মত নিয়ত প্রচ্ছন্নভাবে যে বিদ্যমান, তা নাটকীয় অঙ্গভঙ্গী সহকারে চুপি চুপি বলেছিলেন, যেহেতু ওটা তাঁর অন্তরের কথা; পুলিশের চাকরীটা বাইরের; প্রমাণস্বরূপ বলেছিলেন, তাঁর সহধর্ম্মিণী

(যিনি কোন দেশীয় স্বাধীন রাজার নিকট সম্পর্কীয়া) বেদ-পুরাণে যার তুলনা নাই, এমন উৎসর্গীকৃত প্রাণ এতগুলি দেশভক্তের গ্রেপ্তারের সমাচার পেয়ে অবধি আহার নিদ্রা ত্যাগ করে কেবলই কাঁদছেন আর তাদের দেখবার জন্যে অস্থির হয়েছেন। তাই তাঁর সহধর্ম্মী রায়বাহাদুর বারীন প্রভৃতিকে পরদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য নিতান্ত বিনয়ের সহিত তাঁহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করলেন। আরও কতরকম ঢং করে তাদের বিশ্বাস করিয়ে দিলেন যে, তাঁর মত তাদের প্রকৃত হিতৈষী বন্ধু আর এ ভূ-ভারতে নেই, এ হেন বন্ধুর একমাত্র উপদেশ এই যে, গুপ্ত সমিতি সম্বন্ধে তারা বীরপুরুষের মত মুরারিপুকুর বাগানে যা স্বীকার করেছে তাতে বিশেষ কিছু সুফল ফলবে না ; যেহেতু তা সম্পূর্ণ নয়, সেই হেতু ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সব কথা সম্পূর্ণ করে বলতে হবে ; তা হলেই তাদের বে-কসুর খালাস সম্ভব।

রায় বাহাদুরের শুভ ইচ্ছায় অকৃত্রিমতা এবং তাদের খালাস সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবার জন্য সকল মুস্কিল আসানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অমোঘ উপায় যে লক্ষ ব্রাহ্মণের (কি কমলাকান্তের ঠিক মনে নেই) পদধূলি, তা তাঁর হাতের মাদুলীর মধ্যে বিদ্যমান, এই বলে খানিকটা জলে মাদুলী ধুয়ে বারীন প্রভৃতিকে খেতে দিলেন। তারাও খেল। তারপর বাছাদের চাঁদমুখ মলিন হয়ে গেছে বলে ব্যথা জানিয়ে ভাল ভাল খাবার আর কেওড়া বরফ দেওয়া জল আনতে বরাত করলেন। ইতোমধ্যে গোলাপজলে তাদের মাথাগুলি ঠাণ্ডা করে দিলেন। তখন বারীন, উপেন, উল্লাস অন্যের নাম ধাম ও দোষ উল্লেখ করবে বলে পরামর্শ করে স্বীকারোক্তি দিয়েছিল। এর আগে বাগানে অনুসন্ধানের সময় পুলিশের প্রশ্নের উত্তরেও অনেক কিছু বলেছিল, এই সব পরদিন রবিবার খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল।

৩রা মে রবিবার

সকাল থেকে আবার রাত বারোটা কি একটা অবধি অবিশ্রাম কথা বলাবার চেষ্টা হয়েছিল। একজন অফিসার থেমে গেলে

আর একজন এসে গোড়া থেকে গাওয়াতে সুরু করলেন। সেদিন কারো ভাগ্যে দু'টী খিচুড়ী, কারো দু'টী মুড়ি আর অনেকের ভাগ্যে কিছুই জোটে নি। যে মাসের গরমে স্নান, আহার, এমন কি মুখ না ধুয়ে বা মুখে একটু জলও না দিয়ে, নিয়ত বকবক ক'রে মাথা ঠিক রাখা যে কি মুস্কিল তা ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যের পক্ষে বোঝা শক্ত। সেদিন আমি সকাল থেকে মৌনব্রত নেব ব'লে আগের রাত্রিতেই ভেবে চিন্তে ঠিক করেছিলাম। সেইমত অনেকক্ষণ কারো কথার উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে থাকবার পর, মৌলভী সাহেব বারীন, উপেন প্রভৃতির confession বেরিয়েছে বলে, একখানা "Statesman" আমার দেখতে দিলে, পড়বার লোভ সংবরণ করিতে পারিনি। পড়ে যা দেখলাম তার মধ্যে যা তখন একটু লেগেছিল ভাল, তা হচ্ছে ছাপার অক্ষরে নিজের নামটা। ঐ রকম কোন ভাব আমার মুখে লক্ষ্য করবার জন্য অনেকগুলি চোখ যে তাক করেছিল তা বেশ বুঝেছিলাম। কাগজখানা ফিরিয়ে দিয়ে আবার মৌনী হয়ে রইলাম। আমার নাম আর অপরাধ প্রকাশ হয়ে গেছে দেখলে, আমারও confession দেওয়ার প্রবৃত্তি জেগে উঠতে পারে, এই আশায় বোধ হয় কাগজখানা আমায় দেখতে দেওয়া হয়ে ছিল।

'Statesman'এ লিখিত সুদীর্ঘ স্বীকারোক্তির সকল কথা মনে নাই। কিন্তু তিনটি বিশেষ কথা মনে আছে।—

বারীনের স্বীকারোক্তিতে এই রকম ভাবের কথা ছিল যে, বারীনই বাঙ্গালাদেশে বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির একমাত্র প্রবর্ত্তক নেতা, আর উপেন, উল্লাস প্রভৃতি তার সহকারী মাত্র ছিল। কিন্তু উপেন ও উল্লাস বলেছিল তিন জনেই নেতা। তারা পৃথক্ পৃথক্ বিভাগের উপর কর্ত্তৃত্ব করত। নেতা বলে জাহির হওয়ার প্রবৃত্তিটা কত মজ্জাগত, তা এতে একটু বোঝা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, মুজঃফরপুর হত্যা অপরাধের সঙ্গে এই তিন জনের প্রত্যেকেই সম্পর্ক অস্বীকার করতে চেষ্টা করেছে।

তৃতীয়তঃ, তখনও গ্রেপ্তার হয়নি এমন অনেক লোকের নামও উল্লেখ করেছিল—যাদের সন্ধান পাওয়া পুলিসের পক্ষে সম্ভব হোত না। এদের মধ্যে নরেন গোঁসাইও ছিল। এই নামকরণের ফলে যারা ধৃত হয়েছিল, তাদের নাম পূর্ব্বে লিখেছি।

আন্দাজ চারটার সময় এলেন শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী, তখন তিনি ইন্‌স্পেক্টর। তারপর নাকি তিনি অনেক কিছু হয়েছেন। আমরা ধরা পড়বার আগে পর্য্যন্ত ঐ মানুষটিকে সি, আই, ডি, বিভাগের যত নষ্টের গোড়া বলে জানতাম। তাই তাঁর নাড়ী নক্ষত্র জানবার জন্য কত চেষ্টাই না করেছিলাম। সে জন্য তাঁর সঙ্গে একটু রসিকতা করবার প্রবৃত্তি জেগে উঠেছিল। তখন বলে ফেললাম, তিনি যদি বরফ দেওয়া জল এক গেলাস খাওয়াতে পারেন, তবে তাঁর কথার উত্তর দেব। তাঁর হুকুমমত তৎক্ষণাৎ তাঁর খাসমহল হ'তে মুর্গী ডিম, ইত্যাদি আধা সাহেবী আধা বাঙ্গালী কায়দায় তৈয়ারী এমন সব খাবার এসেছিল, আর তা দুদিনের অনাহারের পর এমন উপাদেয় লেগেছিল যে, আজও ভুলতে পারি নি। যাই হোক, লাহিড়ী মশায় একরার করাবার কুমতলবে কোন কথাই বলেন নি মনে আছে।

গত রাত্রির মত প্রত্যেক দলকে পৃথক পৃথক রাখা হয়েছিল। ফিনিয়বাজার থানার ক্ষুদ্র হাজতের একধারে ন্যক্কারজনক হরেক রকম গন্ধের মধ্যে একটা ছেঁড়া দুর্গন্ধ কম্বলের উপর স্থান পেয়েছিলাম। আমি, আমাদের অবিনাশ আর সঙ্গী ছিল নেশাতে অর্দ্ধমৃত দু'টি গোশকট চালক; তার পাশেই ছিল সুবৃহৎ শৌচের গামলা। কলকাতার মধ্যস্থলে এমন বীভৎসকাণ্ড সেদিন যেমনটি সেখানে দেখেছিলাম, তেমনটি আর কোথাও দেখি নি। ঐ ঘরের মধ্যস্থলে একটা তক্তপোষ barricade রূপে খাড়া করে করে রাখা; অন্যধারে বেচারী নির্দ্দোষ নগেন কবরেজও আতঙ্কে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় বসে; তার সামনে একজন সশস্ত্র সিপাই দাঁড়িয়ে নিশা যাপন করছিল। মাঝে একবার সেই থানার ইন্‌স্পেক্টরের মেম সাহেব আর মেয়েরা এসে ভীতিবিহ্বলনেত্রে দেখে গেছলেন নগেনকে; আমাদের নয়।

৪ঠা মে সোমবার

সেদিনও আমাদের না নাইয়ে না খাইয়ে দশটার সময় পুলিশকোর্টে হাজির করেছিল। সেখানে কমিশনারের কাছে, কেউ একরার কেউ এজাহার দেওয়ার, আর অনেকে কিছু না দেওয়ার পর আলিপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্লির এজলাসে আমাদের সকলকে হাজির করা হয়েছিল। আমাদের অধিকাংশই আবার কিছু না কিছু স্বীকারোক্তি দিয়েছিল। যারা দেয়নি, তাদের মধ্যে অরবিন্দ বাবু না কি বলেছিলেন, তাঁর বক্তব্য কোন উকীলের মারফত জজকে আবশ্যক হলে জানাতে পারেন। আর একজন বলেছিল, সে গুপ্ত সমিতি আদি সম্বন্ধে কিছুই জানে না; এছাড়া আপাততঃ আর এমন কি নিজের নাম ধাম ইত্যাদি বলাও সে উচিত মনে করে নাই। আর কয়েকজন কিছুই জানে না বলেছিল। উপেন, বারীন উল্লাস প্রভৃতি আবার বিশেষ করে স্বীকারোক্তি দিয়েছিল।

আলিপুর জেলে

তারপর সকলকে ক্রমে ক্রমে আলিপুরের জেলে (এখন তার নাম হয়েছে প্রেসিডেন্সী জেল) পাঠান হয়েছিল।

বে-একরারকারীদের এযাবৎ সম্পূর্ণ পৃথকভাবে রাখা হয়েছিল। সেই রকম পৃথকভাবেই জেলে পাঠান হ'ল। অরবিন্দ বাবুকে আবার তা থেকে পৃথক করে রাখা হয়েছিল। জেল ফাটকের বাইরে নতুন আগন্তুক কয়েদীদের শুদ্ধ করে নেওয়ার জন্য স্নানের ব্যবস্থা ছিল। আমরাও অনেকদিন পরে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে জেলে ঢুকলাম।

জেলখানার ভীষণতা সম্বন্ধে পূর্ব্বে হতেই একটা ভারী খারাপ ধারণা ছিল। তার ওপর তিনদিন হাজতে যে দুর্দ্দশা ভোগ করেছিলাম, তাতে সে ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়েছিল। কিন্তু জেলে ঢুকেই একটা লোহার থালে অর্থাৎ ডাবাতে রেঙ্গুন চালের গরম ভাত, মসলা আর প্রচুর তেল দিয়ে হিন্দুস্থানী কয়েদী পাচকের দ্বারা প্রস্তুত অড়হর দাল, মাছ, আর শাক-পাতড়া দিয়ে রাঁধা ভোজপুরী ঘণ্ট, সমস্তদিন উপোসের

পর সন্ধ্যাবেলা এত ভাল লেগেছিল যে, সারাজীবন জেলখানাতে কাটিয়ে দিতে পারব বলে তখন আশা হয়েছিল। সে রাত্রিতে একটা বড় রকম কুঠরীতে—নিরাপদ, কানাই, অবিনাশ, শৈলেন ও আমি ছিলাম। এমন একটা দুর্ঘটনার পর এতগুলি সহযাত্রীর সঙ্গে প্রাণ খুলে সুখ দুঃখের কথা কয়ে খানিকটা দুঃখের লাঘব হয়েছিল, আর ধরা পড়া ব্যাপারের অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম। অকারণ ধরা পড়ার অনুশোচনায় সকলেই ম্রিয়মান হয়েছিল। বাকী সকলের প্রত্যেক তিনজনকে এক একটা সেলে রেখেছিল। দু'জনকে একসঙ্গে রাখা জেল-নিয়মে নিষিদ্ধ।

নরেন গোঁসাইয়ের এপ্রুভার হওয়া

আমাদের গ্রেপ্তারের প্রায় তিন সপ্তাহ পরে একদিন শুনা গেল, নরেন গোঁসাইর সঙ্গে প্রতিদিন তিন চার ঘণ্টা ধরে সপার্ষদ পুলিশ সাহেবের আর তার (নরেনের) বাবার দরোজা বন্ধ করে গোপনে কি পরামর্শ চলেছে। তখন আর আমাদের বুঝতে বাকী রইল না যে, নরেন আমাদের বিরুদ্ধে রাজার সাক্ষী অর্থাৎ approver হতে যাচ্ছে। আমাদের যত রাগ, দ্বেষ, ঘৃণা সবই গিয়ে পড়ল—নরেন, তার বড়লোক বাবা, আর গুরু গোঁসাইদের ওপর।

নরেন কেন এমন কুকাজ করলে, এর কারণ অনুসন্ধানের জন্য গবেষণা প্রবৃত্তি, আমাদের মধ্যে ছোটবড় সকলের মনে জেগেছিল বটে, কিন্তু আসল কথাটাই তখন আমাদের কারও মনে আসেনি, অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতকতা বা স্বপক্ষদ্রোহিতা আমাদের জাতীয় চরিত্রের—জাতীয়তার পরিপন্থী অনেক বৈশিষ্টের মধ্যে যে বিশেষ একটা, সে জ্ঞান আমাদের ত ছিলনা, নেতারা কতকটা জেনেও তা স্বীকার করতেন না। (এখনও করেন না)।

জেলের মধ্যে নিষিদ্ধ বস্তুর সংগ্রহ

একটা কথা আছে 'বজ্র আঁটুনির ফস্কা গিরে।' শুধু জেলখানা নয়, যে কোন ব্যাপারে সতর্কতার যত বাড়াবাড়ি হোক না কেন, চেষ্টার

মত চেষ্টা করতে পারলে সে সতর্কতার বিরুদ্ধে অনেক কিছু কাজ করা যে যায়, এ সত্য জগতে অনেকবার প্রমাণিত হয়েছে। এত কড়াকড়ি পাহারা সত্ত্বেও আমরা কাগজ পেন্সিল পেতাম। জেলখানার ভিতর এবং বাইরে আমাদের আবশ্যকমত যে কোন লোকের সঙ্গে দরকার হলে চিঠির আদান প্রদান করতে পারতুম। পুরস্কারের প্রত্যাশা না করে অনেক কয়েদী বিপজ্জনকবিশেষ দণ্ডনীয় কাজ করা জনিত বাহাদুরীর গৌরব অনুভব করত। একজন বাতি ওয়ালা বলছিল—"কাগজ পেন্সিল চাই—কত ?

"আপাততঃ এক তা, আর পেন্সিলের সিস একটু।"

"আচ্ছা বাবু এনে দেবো, একটু সাবধানে রেখ।"

"অমুককে চিঠি দিতে পারবে ?"

"দিন সন্ধ্যাবেলা, না হয় কাল উত্তর পাবেন।"

পুরস্কার স্বরূপ কিছু দিলে নিত, না দিলে চাইত না। এইরূপে আমরা ক্রমেই জেলের ভিতর বাইরে খবর পেতে ও দিতে সুরু করলাম। আমাদের দু তিন রকম কোড্ ছিল।

এই সময় সত্যেন্দ্রকুমার বসু. মেদিনী পুরের আদালতে, বিনা-পাশে তার দাদার বন্দুক ব্যবহার করার অপরাধে দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে, আমাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের মোকর্দ্দমায় লিপ্ত থাকার অপরাধে, বিচার জন্য, আলিপুর জেলে আনীত হয়েছিল। কখনও dysentry কখনও হাঁপানি রোগে পীড়িত বলে প্রথম থেকেই হাঁসপাতালে স্থান পেয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে তখন বিশেষ কোন রোগের লক্ষণ তার ছিল না। জেলখানায় দু চার পয়সা দিলেই অনেক রোগের প্রমাণ সংগ্রহ করা যেত।

সত্যেন আলিপুর জেলে গিয়ে নরেনের ব্যাপার জেনে, জেলের অন্যত্র রক্ষিত একজন বৈপ্লবিককে সাক্ষাতের সুযোগ হওয়ার আগেই যে তিনখানি চিঠি লিখেছিল, যতদূর মনে পড়ে, তার আসল মর্ম্ম এই ছিল যে,—সে জানতে চেয়েছিল, আমাদের মধ্যে নরেনের মত আর

কেউ ছিল কিনা; আর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারা যায় এমন কে কে ছিল। নরেন যে সকল খবর পুলিশকে দিচ্ছে, তা বাইরে আমাদের লোককে জানিয়ে সাবধান করা নিতান্ত আবশ্যক। খবর জানবার অন্য উপায় না থাকলে নরেনের জুড়ীদার approver অর্থাৎ corroborator হওয়ার ভাণ করে নরেনের সঙ্গে ভাব করা উচিত কিনা; আর নরেনকে হত্যার উপায় কি হতে পারে।

অনেক গবেষণার পর প্রথমে স্থির হয়েছিল, নরেনকে হত্যার ভার বাইরে যে কয়দল আমাদের বৈপ্লবিক বন্ধু ছিল, তাদের উপর দেওয়া হবে। আমাদের মধ্য থেকেও বারীন ঐ ব্যবস্থাই করেছিল। চার পাঁচ দল পৃথকভাবে চেষ্টা করলে যে নিশ্চয় কৃতকার্য্য হবে, সে আশা তখনও ছিল। জেলে আমাদের মধ্যে নরেনের মত দুর্ব্বল প্রকৃতির কেউ ছিল বলে তখন তারা বিশ্বাস করতে পারেনি। আর সম্পূর্ণ বিশ্বাসী বলে যে কয়জনকে মনে করেছিল, তাদের অধিকাংশই তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন ছেলে ছোকরা, বাকি নেহাৎ ভালমানুষ বল্লে যা বুঝায়, তাই।

খুব বিশ্বাসী, কৌশলী, অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতি এবং স্মরণ শক্তি সম্পন্ন অন্য ব্যক্তির অভাবে সত্যেনই গোঁসাইর corroborator এর পালা অভিনয়ের ভার নিয়েছিল। তার যে অসাধারণ স্মরণ শক্তি ছিল, তা পূর্ব্বেই বলেছি। এই দুরূহ কাজ করতে গেলে যে শেষ অবধি তার মহৎ উদ্দেশ্য লোক অজানিত থেকে যেতে পারে, আর নরেনের মত সে-ও স্বপক্ষদ্রোহী বলে চিরদিন লোকমতে ঘৃণিত হয়ে থাকবে, তা বুঝে সুঝেই অকুণ্ঠিতভাবে এতে রাজী হয়েছিল। তাকেই যে নরেনের ঘাতুক হতে হবে, তা সে তখনও ভাবেনি।

সত্যেনের সঙ্গে যার এই পরামর্শ স্থির হয়েছিল, সে নিজে কিন্তু সব বাজে কাজের ভার নিয়েছিল। যেমন জনকতক চতুর বিশ্বাসী ছেলে ছোকরার দ্বারা একটা গোয়েন্দা বিভাগ গড়ে, কার মতি-গতি কি হচ্ছে না হচ্ছে খোঁজ রাখা, এবং সত্যেনকে তা জানান। আর সকলের মনে দেশের জন্য আত্মোৎসর্গের ভাব জাগিয়ে রাখা।

নরেনকে কেউ মেরে ফেলুক, অরবিন্দ বাবু দেবব্রতবাবু প্রভৃতি কয়েকজন ছাড়া প্রায় অধিকাংশের মনে এই ইচ্ছা জেগেছিল। তখন বাঙ্গালাদেশে যে ক'টি গুপ্তদল ছিল, বারীনের প্রস্তাব অনুযায়ী তার প্রায় সকল দলের ওপর নরেনকে হত্যার ভার দেওয়া হ'ল। তিন চারিটি দল প্রায় একই ধরণের উত্তর দিয়েছিল। তার মধ্যে মেদিনীপুরের দলও ছিল। তার মর্ম্মটা ছিল,—'গোঁসাইকে হত্যার চাইতে তাদের হাতে বিস্তর গুরুতর কাজ ছিল। গোঁসাইএর ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে।' অর্থাৎ তাবা দল ভেঙ্গে দিয়ে দুর্গানাম জপ করছিল। বাকী যে দু'একটি দল কোন উত্তর দেয়নি তারা চেষ্টা করলেও করতে পারে আশা করে, কোথায় কিভাবে চেষ্টা করবে, তার একটা লম্বা প্ল্যানও দেওয়া হয়েছিল।

ইতোমধ্যে হঠাৎ একদিন জেলে আমাদের যে যেখানে ছিল, সকলকে নিয়ে ছ'ডিগ্রী নামক একটা সঙ্কীর্ণ যায়গায় রাখা হ'ল। উদ্দেশ্য—একসঙ্গে থাকলে, নরেন আমাদের মধ্যে যার কাছে যত গুপ্ত তথ্য আছে তা সংগ্রহ করে পুলিশকে দিতে পারবে। নরেন তখন জানত না যে আমরা তাকে চিনে ফেলেছি। কিন্তু কয়েক দিন পরেই তা বুঝেছিল। কাজেই পুলিশের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছিল। আর নরেনকে আমরা মেরে ফেলতেও পারি, এ সন্দেহও সম্ভবতঃ হয়েছিল।

আমাদের মধ্যে দু' একজন বালক, বিশেষ করে সুশীল তাকে গলা টিপে কিম্বা যে ইটদিয়ে আমাদের অস্থায়ী পায়খানা তৈরী হয়েছিল, তার একখানা তাব মাথায় ঠুকে মেরে ফেলবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। নির্দ্দোষ অরবিন্দবাবুকে তাতে জড়িয়ে ফেলবার ভয়ে বারীন আদি বয়োবৃদ্ধেরা তাতে অসম্মতি জানান। তাদের একজন প্রাণ খুলেও বলেছিল,—'চোখের ওপর একটা জ্যান্ত মানুষ খুন হবে ওরে বাবারে, দেখব কেমন করে।' দুষ্ট ছেলেরা কিন্তু নরেনের প্রতি এমন একটা বিদ্বেষভাব পোষণ করত যে, নিষেধ সত্ত্বেও সামান্য ঝগড়ার মুখে তাকে মেরে ফেলতেও পারত বলে তখন মনে হয়েছিল। বালক কৃষ্ণজীবন কি নিয়ে ঝগড়া বাধিয়ে তাকে লাথিও মেরেছিল। এর দু'এক দিন

পরেই হাঁসপাতালের কাছে ডুজন ইউরেশীয়ান কয়েদীকে নরেনের শরীররক্ষক করে তাকে পৃথকভাবে আরামে রাখা হয়েছিল। আর আমাদের বাকী সকলকে ২৩নং ওয়ার্ডে একসঙ্গে রাখা হোল। এটা একটা প্রকাণ্ড ঘর ছিল।

আগেই বলেছি, সত্যেন হাঁসপাতালে থাকত, নরেনকে নিকটে পেয়ে তার সঙ্গে পূর্ব্ব পরামর্শমত আলাপ সুরু দিয়েছিল। ক্রমেই আমাদের মধ্যে প্রচার হ'ল, সত্যেন নরেনের corroborator হতে যাচ্ছে। এ খবর কোর্টে উকীল বাবুদের মারফতে বাইরেও প্রচারিত হয়েছিল।

এ দিকে সত্যেন যেন ভীষণ দণ্ডের ভয়ে অস্থির হয়ে একটা গতি করে দেওয়ার জন্য কেঁদে কেটে নরেনকে ধরেছিল। নরেন সে কথা পুলিশের কর্ত্তাকে জানালে। তিনি অনেকদিন ধরে সত্যেনকে নাড়া-চাড়া দিয়ে, অবশেষে খুসী হয়ে সত্যেনের প্রার্থনা গ্রাহ্য করলেন; আর তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়ার জন্য নরেনকে উপদেশ দিলেন। সত্যেন নরেনের প্রদত্ত খবর যথাস্থানে পাঠাতে লাগল। তিন মাস এইভাবে চলেছিল।

এদিকে আমরা ২৩নং ওয়ার্ডে ৩৫ কি ৩৬ জন মিলে নরক গুলজার করে তুলেছিলাম। সকলের মন স্ফূর্ত্তিতে রাখবার জন্য নিত্য নতুন রকম আমোদ আহ্লাদের ব্যাপার উদ্ভাবিত হতে লাগল। দিনরাত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ডু'তিন ঘণ্টার বেশী ঘুমোবার উপায় ছিলনা।

জেলের মধ্যে রিভলবার সংগ্রহ

জেলের ভিতর বাইরে থেকে রিভলবার আনা তখন খুবই সহজ ছিল। কারণ, তখন এখানকার মত কড়াকড়ি একেবারে ছিল না। এত সোজা ব্যাপার ছিল বলেই কি করে রিভলবারটা এসেছিল, তা জানবার প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে অনেকের হয়নি; আমারও হয়নি। ইতিপূর্ব্বে জেলভেঙ্গে পালাবার উদ্দেশ্যে বাইরের বিপ্লবী দলগুলিকে পনেরোটা রিভলভার আমাদের পাঠাবার জন্য ফরমাইজ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তখন বাইরের বৈপ্লবিক দলের পক্ষে পনেরটা রিভলবার যোগাড়

করা মুস্কিল ছিল, তাই প্রথমে সেকেলে মরচেধরা প্রকাণ্ড বড় একটা মাত্র এসে পড়ল। সেটা সাবধানে রাখবার ভার পড়ল সত্যেনের পূর্ব্বোক্ত বন্ধুটির ওপর। আমাদের মধ্যে সেটার অস্তিত্ব যখন সকলে ক্রমে ভুলে গেছল, তখন সে একদিন সকলের অজ্ঞাতে হাঁসপাতালে সেটা নিয়ে গিয়ে সত্যেনকে দিয়েছিল। তার 'টিগারটা' এত শক্ত ছিল যে, তার পক্ষে ও রিভলবার ব্যবহার সহজ হবেনা বলে বুঝেছিল। অগত্যা আর একটা না আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

মেদিনীপুরে সত্যেনের সন্ধানে যে সকল রিভলবার ছিল, তা আনাবার চেষ্টা করে জেনেছিল, সেখানকার সমস্ত বিপ্লবী কূর্ম্ম অবতারে পরিণত হয়েছে।

এদিকে প্রায় প্রতিদিনই হাঁসপাতালে এসে সত্যেনের সঙ্গে নরেন দেখা করত।

নরেন গোঁসাইকে হত্যা

দেবব্রত বাবু, ইন্দ্রনাথবাবু, যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি আমাদের পরে ধৃত আট জনের তখনও বার্লি সাহেবের কোর্টে মোকদ্দমা চলছিল, আমরা এর আগেই সেসন সোপর্দ্দ হয়ে গিয়েছিলাম।

১লা সেপ্টেম্বর সোমবার উক্ত আটজনের বিরুদ্ধে নরেন গোঁসাইর জবানবন্দী সুরু হবার কথা ছিল, সত্যেন জেনেছিল। এই জবানবন্দীতে অনেকের নাম নূতন করে প্রকাশ হবে, তারফলে আবার অনেকে ধৃত হবে, বিশেষ করে প্রায় বিশ জন বিশেষ বিশেষ গণ্যমান্য ব্যক্তির গ্রেপ্তারের কথা ছিল। তাই সত্যেনের চেষ্টা হয়েছিল, উক্ত সোমবার সকালেই নরেনকে মারতে হবে; তার বন্ধুকে এই খবর পাঠালে। বিকেল পাঁচটার সময় খাওয়া হয়, তার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কখনও কখনও নরেন হাঁসপাতালে থাকে। কাযেই ৫টার পরে উক্ত বন্ধু নিজে যেতে না পেরে আমাদের ওয়ার্ড থেকে কানাইকে দিয়ে এমনভাবে ন্যাকড়া জড়িয়ে পাঠিয়েছিল, রিভলবার বলে কানাই বুঝতে পারে নি।

পেটব্যাথার ভাণ করে কানাই হাঁসপাতালে গিয়ে সত্যেনকে সেটা দিতে রাজী হয়েছিল। সত্যেন সেটা পেয়ে যখন তার বদলে তাকে বড় রিভলবারটা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলেছিল, তখন কানাই সেটা রিভলবার বলে বুঝতে পেরে সত্যেনকে জিজ্ঞেস ক'রে নাকি ব্যাপারটা সবই জেনেছিল। তাই সেও বড় রিভলবারটা নিয়ে সত্যেনকে সাহায্য করতে চাইলে। সত্যেন নাকি প্রথমে তার বন্ধুর বিনা মতে কানাইএর প্রস্তাবে রাজী হয়নি। তাই উক্ত বন্ধুর মতের জন্য একখানা অনেক যুক্তি তর্কপূর্ণ পত্র হাঁসপাতালের একজন কয়েদী খিদমদ্গারকে দিয়ে পাঠিয়ে দেয়। অগত্যা সত্যেনের বন্ধু নাকি মত দিয়ে পাঠিয়েছিল। মত পেয়ে তারা স্থির করেছিল, আগে সত্যেন চেষ্টা করবে। যদি ফসকে যায় তবে কানাই আক্রমণ করবে। কানাই না থাকলে কিন্তু গোঁসাই বেচারা যে বেঁচে যেত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পরদিন ১লা সেপ্টেম্বর সোমবার সকালে নরেন অন্য দিনের মত তার শরীররক্ষক দু'জন ইউরেশিয়ান কয়েদী ওয়ার্ডার সঙ্গে করে হাঁসপাতালের দোতলার ওপর সিঁড়ির পাশে ডিস্‌পেন্সারীতে গিয়ে সত্যেনের সামনে বসেছিল। রিভলবারটা সহজে কেউ কেড়ে নিতে না পারে সে জন্য নাকি সত্যেনের কোমরে দড়ি দিয়ে সেটা বাঁধা ছিল। সত্যেন জামার ভিতর থেকেই নাকি নরেনকে তাক করে মারে। খট্ করে শব্দ হ'ল, কিন্তু কার্ত্তুস আগুন নিলে না। সত্যেন পরমুহূর্ত্তে জামার ভেতর থেকে রিভলবার বের করে আবার নরেনকে তাক করে। তখন 'হিগেনবোথান' নামক পূর্ব্বোক্ত একজন ইউরেশিয়ান ওয়ার্ডার রিভলবার ধরে টানাটানি করতে আওয়াজ হয়ে তার হাতের কব্জি ভেঙ্গে যায়, কাজেই রিভলবার ছেড়ে দেয়। ইত্যবসরে গোঁসাই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তেই কানাই গুলী চালায়। কানাই দাঁতমাজার ভাণ করে ডিস্‌পেন্সারীর পাশে সিঁড়ির সামনে পায়চারি করছিল। যাই হোক গুলী সামান্য ভাবে পায়ের কোনস্থানে লেগেছিল। তাই কষ্টে সিঁড়ি নেবে হাঁসপাতালের ফটক পার হয়ে—দু পাশে দেওয়াল এমন একটা লম্বা সরু গলির ভেতর গিয়ে পড়েছিল। কানাইও পেছনে তাড়া করেছিল।

সত্যেন ডিস্‌পেন্সারী থেকে বেরিয়ে সামনে একজন কয়েদী দেখে তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, নরেন কোথায় গেল। আঙ্গুল দিয়ে ইসারায় সে দেখিয়ে দিলে সত্যেন ছুটে গিয়ে কানাইয়ের সঙ্গে যোগ দেয়। দুজনেই গুলী চালাতে থাকে। নরেন নাকি দু'একবার পড়ে গিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। সে খুব বলিষ্ঠ জোয়ান ছিল।

তারপর যথারীতি পাগলাঘণ্টি, ভোম্বা, কর্ম্মচারীদের হুটোহুটি, দৌড়াদৌড়ি, সত্যেন ও কানাইকে গ্রেপ্তার, সব ওয়ার্ডে তালাবন্ধ, খানাতল্লাসী ইত্যাদি যথারীতি সবই হয়েছিল।

খুনের তদন্ত বিচার দণ্ড ইত্যাদিও কায়দা-মাফিক হয়ে গেল। কানাই স্বীকারোক্তি দিয়েছিল, কারও নাম করে নি। আর পিস্তল কোথা থেকে পেয়েছিল, তাও বলেনি। সত্যেন সমস্তই অস্বীকার কবেছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কোর্টে অতিরিক্ত দেরী হচ্ছে বলে নরেনকে এজাহারের পর জেরা করতে হাকিম দেন নি। তাতে আমাদের পক্ষের একজন উকিল অনেক সাধ্যসাধনায় এই মর্ম্মে একখানি দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছিলেন যে, যেহেতু সাক্ষীকে জেরা করতে দেওয়া হল না, সেই হেতু তার উক্তি তাবৎ প্রমাণ বলে গ্রাহ্য হবে না, যাবৎ সে আবার না যথারীতি সেসন আদালতে সাক্ষ্য দেয় ও জেরা হয়। এই মঞ্জুরীটি না দিলে গোঁসাইকে মারা প্রায় বৃথা হত, আর অরবিন্দ বাবুর মুক্তিও অসম্ভব হত। তখন বার্লী সাহেবের কোর্টে কোন উকীলই এর আবশ্যকতা বা উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন নি। এ ফন্দিও সত্যেনের উদ্ভাবিত ও তারই চেষ্টায় হয়েছিল।

কানাই ও সত্যেনের মৃত্যু-দণ্ড

যাই হোক দুজনেরই ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। কানাই আপীল করতে রাজী ছিল না। তাই আগে কানাইয়ের ফাঁসি হল। (১০ই নভেম্বর)।

সত্যেনও জানত আপীলের ফল কিছুই হবে না, তার মা বিশেষ করে

বলা সত্ত্বেও প্রথমে রাজী হয় নি, তারপর আমিই তাকে বৈপ্লবিক নিয়ম-রক্ষার দোহাই দিয়ে রাজী করিয়েছিলাম। প্রিভি-কাউন্সিলে আপীল করিবার জন্য বাবু প্রেমতোষ বসুর উদ্যোগে ও শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও আনন্দমোহন পাল মহাশয়ের সহায়তায় পোস্তার বাজারে প্রায় ৪ শত টাকা সংগৃহিত হইয়াছিল। 'আপীল চলিলে আরও দিব' এইরূপ প্রতি-শ্রুতিও যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছিল। আপীল কিন্তু চলিল না। ভারতের ভাগ্য বিধাতা মহা দার্শনিক ও রচয়িতা লর্ড মর্লে তারযোগে জানাইলেন যে, আপীলের জন্য ফাঁসী স্থগিত থাকিতে পারে না।

কানাইয়ের ফাঁসির পর বিপুল সমারোহে তার দেহ সৎকার করা হয়েছিল। কলকাতা সহরময় একটা তুমুল আন্দোলন উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। সেই জন্য সত্যেনের ফাঁসির ধার্য্য দিন (২৩শে নভেম্বর) সাধারণকে জানতে দেওয়া হয় নি। নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি আত্মীয় স্বজনকে ফাঁসির সময় উপস্থিত থাকবার ও তার মৃতদেহের সৎকার সেইখানেই করবার হুকুম দেওয়া হয়েছিল।

নরেন গোঁসাই নিহত হওয়ার প্রায় একসপ্তাহ পরে আলিপুর জেলের এক নির্জ্জন প্রদেশে আমাদের সকলকে রাখা হয়েছিল। সারি সারি ৪৪টা কুঠরী আছে বলে যায়গাটার নাম ৪৪ ডিগ্রী। কুঠরীগুলো প্রায় দশ ফুট লম্বা আট ফুট চওড়া। সম্মুখে লোহার গরাদে দেওয়া একটা মাত্র দরোজা। প্রত্যেক কুঠরীর সামনে প্রায় আট ফুট দূরে আট ফুট উঁচু প্রাচীর। প্রত্যেক দুটো কুঠরীর মাঝ থেকে ঐ প্রাচীর অবধি আবার দেওয়াল অর্থাৎ প্রত্যেক কুঠরীর সামনে আট ফুট লম্বা আট ফুট চওড়া একটু খানি উঠান। তার সামনের দিকে দরোজায় মোটা কাঠের একখানা কপাট, তার মাঝে প্রহরীদের উঁকি মেরে দেখবার জন্য একটা ছোট ফুটো। এই দরজাগুলোর সামনে চৌদ্দ পনের ফুট দূরে আবার চৌদ্দ ফুট উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা খুব লম্বা উঠান। এ যেন চিড়িয়া খানার মধ্যে খাঁচা। আলিপুর জেলের (এখন নাম হয়েছে প্রেসিডেন্সী জেল) কয়েদীরা এই চুয়াল্লিশ ডিগ্রীর নামে ভয়ে কাঁপে।

চুয়াল্লিশ ডিগ্রীর একটা ঐতিহাসিক গৌরব আছে। মণিপুরের স্বাধীন হিন্দুরাজা টিকেন্দ্রজিৎ, তার মন্ত্রী, সেনাপতি আদি, ফাঁসি ও আন্দামানের আসামী হয়ে এই চুয়াল্লিশ ডিগ্রীতে বন্দী দশায় ছিলেন। আর ঐখানেই ঐভাবে ছিলেন নাকি চীনা সম্রাটের ক্যান্টনস্থিত ভাইস্‌রয় 'ইয়ে' (প্রায় ১৮৫৮ খৃঃ)। আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিও নাকি একে পবিত্র করে গেছেন।

জেলে ডিসিপ্লিন যে কি বিভৎস ব্যাপার তা তখন মালুম হয়েছিল। এর আগে তিন মাস যাবৎ যে হরেক রকম খাবার আসত তা স্বপ্ন বলেই মনে হত। সব চেয়ে অসহ্য হয়েছিল কথা বলতে না পাওয়া। পরস্পরের আলাপ ত দূরের কথা চোখোচোখী হলেও গালাগালি আর ধম্‌কানীর অন্ত থাকত না। দিনের পর দিন, সব সময় শুয়ে বসে কেবলই চিন্তা আর চিন্তা আর চিন্তা। তাও আবার দুশ্চিন্তা। সে কি ভীষণ!

একদিন তদানীন্তন বাঙ্গালার মাননীয় লাট সার এডোয়ার্ড বেকার ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের বোধ হয় জানুয়ারীতে আমাদের মধ্যে চারজনকে পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। তার মধ্যে ছিলেন অরবিন্দবাবু, ইন্দ্রনাথ নন্দী (লেফটেনেণ্ট কর্ণেল এন নন্দীর সন্তান) আর বালকৃষ্ণ হরিকানে। পাত্র মিত্রের সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের দূরে রেখে, লাটসাহেব সটান সামনেকার উঠোন পেরিয়ে গিয়েছিলেন। কুঠরীর গরাদে ধরে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করে যা বলেছিলেন, তার মর্ম্ম যতটুকু মনে আছে, তা হচ্ছে—আমরা যখন উচ্চ শিক্ষিত, বিশেষ করে য়ুরোপীয় শিক্ষা যখন পেয়েছি, আর উচ্চবংশজাত, তখন আমাদের বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্টের আনীত ঐ মোকদ্দমায় গভর্ণমেণ্টকে আমাদের সাহায্য করা উচিত। সকলের সঙ্গে ঠিক এরকম আলাপ হয়ত হয়নি। সকলের সঙ্গে ভূমিকাটা এই রকমই ছিল।

আমরা প্রথমে সেসন আদালতে গিয়ে দেখলাম, পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় দলের আটজনের মধ্যে ছয়জন সেসন সোপর্দ্দ হয়ে আমাদেরই দলভুক্ত হয়েছিলেন। বাকী দু'জনের একজন চন্দননগরের দুপ্লে কলেজের

প্রফেসার শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়,—ফরাসী রিপাব্লিকের অধিকার ভূক্ত স্থানের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের অপরাধে তাঁর গ্রেপ্তার ইণ্টার ন্যাসেন্যাল আইন বিরুদ্ধ বলে, স্বনামধন্য ব্যারিষ্টার মিঃ ব্যোমকেশ তাঁর মুক্তির দাবী করাতে জজ সাহেব মিঃ বিচক্রফ্‌ট সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বিদায় দিয়েছিলেন। পরে না কি এই আইন অমান্য করার জন্য ফরাসী সরকার খেসারত আদায় করেছিলেন। অন্য একজন যিনি বেকসুর খালাস হয়েছিলেন, তিনি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই দলের মধ্যে দু'জন ছাড়া বাকী সকলেই অল্পাধিক না কি বৈপ্লাবিক নেতা বলে ধৃত হয়েছিলেন। সর্ব্বসমেত আমরা ছত্রিশজন আসামী তখন রইলাম। একখানা কয়েদী যান (Prison van) গাড়ীতে আঠার জন করে দু'বারে আদালতে নিয়ে যেত। অবশ্য প্রত্যেকের হাতে হাতকড়া থাকত। হাতকড়াগুলো আবার একটা লম্বা শেকলে গেঁথে গাড়ীর সঙ্গে তালা দিয়ে আটকান থাকত।

দ্বিতীয় দিন গিয়ে দেখি আদালত গৃহের এককোণে জজ সাহেবের সুমুখের দিকে প্রায় ৬×১০ফুট স্থান আমাদের বসবার জন্য লোহার জাল দিয়ে ঘেরা হয়েছে। তার মধ্যে আমাদের পূরে দিয়ে তালা বন্ধ করা হত। এই জালের তার কেটে নিয়ে চাবি তৈরী করে মুহূর্ত্ত মধ্যে হাতকড়া খুলে ফেলা যেত। পুলিশ হায়রাণ হয়ে অগত্যা ঐ খাঁচার মধ্যে থাকতে আর হাতকড়া দিত না।

সেসন কোর্টের বিচার শেষ ও রায় প্রকাশ

যাই হোক, এই ভাবে দু'পক্ষের বিচার অবিচারে সেসন্স আদালতে পালা সাঙ্গ হল ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে। আমাদের মধ্যে ১৮জনের বেকসুর খালাস হল। বাকী ১৯জনের মধ্যে বারীন ও উল্লাসের হয়েছিল ফাঁসির হুকুম। উপেন, হৃষীকেশ, বীরেন সেন, ইন্দ্রনাথ, বিভূতি, সুধীর, ইন্দু, (পোর্ট ব্লেয়ারে আত্মহত্যা করে), অবিনাশ, শৈলেন ও আমার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস, অধিকন্তু সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত। নিরাপদ (পরে মৃত), শিশির, পরেশ দশবছর দ্বীপান্তর। সুশীল

(পরে মৃত), বালকৃষ্ণ (পরে মৃত), সাত বছর দ্বীপান্তর আর কৃষ্ণজীবন (পরে মৃত) এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করেছিল। অশোক নন্দী থাইসিস রোগে বিচার শেষ হওয়ার আগেই মারা যায়।

যে সকল আসামীর পক্ষ সমর্থনের জন্য অর্থাভাবে উকীল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করা সম্ভব হয়নি, তাদের মধ্যে সম্পূর্ণ নিরপরাধ দুই ভাই নগেন ও ধীরেন কবিরাজ, তাদের দোকানে উল্লাস বোমা তৈরীর মাল মসলাপূর্ণ কয়েকটি বাক্স রেখে এসেছিল। ঐ বাক্সগুলিতে কি ছিল, বেচারা কবিরাজেরা কিছুই জানত না। এই দায়ে গ্রেপ্তার হয়ে অস্ত্র আইনের মামলায় হাইকোর্টের বিচারে একদফা সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড তারা লাভ করেছিল। তারপর আমাদের ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমায় লিপ্ত বলে সেসন সোপর্দ্দও হয়েছিল।

যারা ছাড়া পেল তাদের সঙ্গে সত্ত দণ্ডিতদের শেষ বিদায় পনের কি বিশ মিনিটের মধ্যে সারতে হয়েছিল। সে কি মর্ম্মন্তুদ ব্যাপার! সত্যকার চোখের জল ফেলবার লোক থাকলে অতি দুঃখও যে মধুর হয় অর্থাৎ যত বড় দুঃখই হোক আর যতকাল স্থায়ী হোক, সেই চোখের জলের স্মৃতি সেই দুঃখটাকে যে মাধুরী মণ্ডিত করে দেয়, তা সে দিন দেখে মনে হয়েছিল। অনেকেরই সে সৌভাগ্য হয়েছিল; আবার অনেকে সে অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে বঞ্চিত হয়েছিল।

তারপর চুয়াল্লিশ ডিগ্রীতে ফিরে এসে বন্দী বেশে সাজতে গিয়ে বন্দীজীবনের বাস্তবতা উপলব্ধি হয়েছিল। সাত আট পাউণ্ড ওজনের বেড়ী দ্বীপান্তরের যাত্রীদের দু'পায়ে রিভেট করে দিলে। একহাত ঝুল বিশিষ্ট জাঙ্গিয়া পরতে হল। বেড়ী পায়ে জাঙ্গিয়া পরা, সে এক সমস্যা। তারপর মাথাটি মুড়ান। গলায় একটা লোহার হাসলি পরিয়ে দিয়ে তাতে একটা কাঠের তক্তি লাগিয়ে দিলে। তাতে লেখা ছিল ১২১ ক ১২২, আর ছিল নামের বদলে একটি নম্বর। চলতে গিয়ে ঠুনঠান শব্দে প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

হাইকোর্টের আপীলের রায়

অবশেষে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের বোধহয় ডিসেম্বরের প্রথমে হাইকোর্টের রায় বেরুল। বারীন ও উল্লাসের ফাঁসী ফেঁসে গিয়ে হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। উপেন আর আমার সাবেক রায় বাহাল থাকল। হৃষিকেশ, ইন্দু, বিভূতি দশবছর আর ধীরেন, সুধীর, অবিনাশের সাত বছর দ্বীপান্তর। নিরাপদ, পরেশ, শৈলেন পাঁচ বছর কারাবাসের আদেশ পেয়েছিল।

পোর্ট ব্লেয়ারে রওয়ানা

দ্বীপান্তরের যাত্রীরা ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর আলিপুর হতে রওয়ানা হল।

এই যাবজ্জীবন কথাটার আবার ব্যাখ্যা আছে। উত্তেজনা বশে কোন অপরাধ করার জন্য যে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের ব্যবস্থা হয়, সে যাবজ্জীবন মানে ২০বছর। আগে থেকে মতলব এঁটে বা দল বেঁধে কোন অপরাধ করলে যে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয় তার মানে ২৫ বছর; পরে যদি সরকার বাহাদুরের খুসী হয় তবে ছাড়া পেতেও পারে। এরকম কয়েদী ক্বচিৎ কখনও খালাস পেলেও সকলে খালাসের আশা করতে পারে, আর সেই আশাতেই বেঁচে থাকা সম্ভব হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের বেলা যাবজ্জীবন কথাটার ব্যতিক্রম ঘটে না। মৃত্যু পর্য্যন্তই দ্বীপান্তরে শুধু থাকতে হয় না, অতি কঠিন শ্রম-ভীষণ কারাদণ্ড-ভোগ করিতে হয়। এই যাবজ্জীবনের ধারণাটাই এত ভীষণ যে, তার তুলনায় পিনালকোডের সমস্ত দণ্ড একত্র করলেও অতি তুচ্ছ।" *

ইহাই হইল বাঙ্গালাদেশের তথাকথিত বিপ্লবাদের প্রথম অভ্যুদয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

বিপ্লববাদের প্রতিক্রিয়া

আমলাতন্ত্র নিজেদের ভুলের ফসল দেখিয়া সচকিত ও আসন্ন বিপদাশঙ্কায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। দেশের শান্তি শৃঙ্খলা এবং

---

* মাসিক বসুমতী—১৩৩৪ সাল; বাঙ্গালার বিপ্লব কাহিনী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

শাসন বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে প্রচুরভাবে দমননীতি একের পর এক প্রয়োগ করিয়া চলিলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হইল, রাজনীতিক জনসভা করা নিষিদ্ধ হইল। তাহার ফলে দেশের জন-হিতকর কার্য্যাবলী নানাভাবে বাধা প্রাপ্ত হইয়া উহার মূল পর্য্যন্ত উৎপাটিত হইবার উপক্রম হইল। একটি বহুপুরান আইন, সরকার এই সময় দমননীতির অস্ত্র হিসাবে গ্রহণ করিলেন। উহা ১৮১৮সালের ৩নং রেগুলেশন। ইহার বলে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের বিনা বিচারে আটক রাখা চলিত।

সুরেন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"বহু পুরাতন মরিচাধরা একটি অস্ত্র, যাহা গভর্ণমেণ্টের অস্ত্রাগারে দীর্ঘকাল যাবৎ অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল,—উহাকে স্বদেশসেবক মুখ্য মুখ্য কর্ম্মীগণের উদ্দেশে ব্যবহার্থে নিষ্কাষিত করা হইল। ইহার দ্বারায় দেশের সম্মানীয় তথা স্বদেশী আন্দোলনের উৎসস্বরূপ বহু ব্যক্তিকে আটক রাখিবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল।"

রেগুলেশন বলে জননেতাগণ ধৃত ও আটক

এই সময় একদিন প্রাতঃকালে জনসাধারণ শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন যে, বরিশালের প্রসিদ্ধ নেতা ও ব্রজমোহন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত, কলিকাতার আদি ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট সভ্য ও জনসাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র এবং বিশিষ্ট স্বদেশী কর্ম্মী শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ও তৎসহ দানবীর স্বদেশীভক্ত সুবোধ মল্লিক ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন বলে বন্দী হইয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথের প্রতি রেগুলেশন আইন প্রয়োগের জনরব

শোনা যায় সুরেন্দ্রনাথকেও ঐ আইন বলে বন্দী করিবার উদ্দেশ্যে আদেশ-পত্র নাকি প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উহা বাতিল হয়। সার এডোয়ার্ড বেকার ছিলেন তদানীন্তন ছোটলাট। তিনি সুরেন্দ্রনাথের

সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন, এবং সম্ভবতঃ তাঁহারই হস্তক্ষেপের ফলে সেই আদেশ রহিত হইয়া যায়।

সুরেন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে তাঁহার জীবন স্মৃতিতে লিখিয়াছেন,—

১৯০৮ সালে ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে একদিন রাত্রে—সবে আহারে বসিতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি এমন সময় আমার এক বিশেষ বন্ধু মৌলভী আবুল হোসেন শশব্যস্ত হইয়া আমার বারাকপুরস্থিত আবাস ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আমায় সংবাদ দিলেন যে, একজন সি, আই, ডি অফিসার আমাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিতেছেন; সুতরাং অবিলম্বে আমার তজ্জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকা প্রয়োজন। আমি বলিলাম,—উত্তম কথা; তাহা হইলে আমার আহারটি সমাধা করিয়া লই এবং আপনিও যোগদান করুন। তিনি সানন্দে স্বীকৃত হইলেন। আমরা আহার সমাধা করিয়া পুলিশের প্রতীক্ষায় দুই ঘণ্টারও অধিক কাল অপেক্ষা করিলাম। কিন্তু পুলিশের দর্শন মিলিল না। অবশেষে আমার বন্ধুবর অনেকটা নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং আমিও শয়নের উদ্দেশ্যে গমন করিলাম। আমার অনেকগুলি সহকর্ম্মী ও বন্ধুগণকে এই সময় আটক রাখা হইয়াছিল; কিন্তু আমাকে আটক রাখা হয় নাই। আমায় আটক বন্দীরূপে রাখিবার বিষয় কোন দিন কল্পিত হইয়াছিল কি না তাহাও আমি বলিতে পারি না। বাঙলা সরকারের সেরেস্তাখানার কর্ত্তৃপক্ষ এ সম্পর্কের গোপন তথ্য, ইচ্ছা করিলে কোন দিন হয়ত আবিষ্কার করিতে পারেন। আমি যখন সরকারের একজন সদস্য হইয়াছিলাম, তখন এসম্বন্ধে অনায়াসে সকল সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিতাম; কিন্তু সে স্পৃহা আমার কোন দিন হয় নাই। যাহা হউক, সেদিনের সেই সংবাদটির উপর বন্ধুবর মৌলভী সাহেবের আস্থা স্থাপনের কিন্তু কিঞ্চিৎ হেতু ছিল। তিনি যেদিন ঐ সংবাদ লইয়া আসেন ঠিক সেই দিন বারাকপুরে বহু সংখ্যক পুলিশ ও গোরা সৈন্যের আবির্ভাব হয়। অবশ্য সরকার

হইতে ইহাদের আগমনের কারণ ব্যক্ত হয় যে, বড়লাট লর্ড মিণ্টো বারাকপুরে ঘোড় দৌড় দেখিতে আসিয়াছেন, তজ্জন্য এই আয়োজন। কিন্তু বারাকপুরে পূর্ব্বেও বহুবার বড়লাট ঘোড়দৌড়ে আসিয়াছেন, তৎকালে ত এই প্রকারের ব্যবস্থা কোন বারেই অনুষ্ঠিত হয় নাই, অথবা প্রয়োজন পড়ে নাই।"

বিনা বিচারে আটকবন্দী সম্পর্কে লর্ড মর্লের মনোভাব

লর্ড মর্লের স্বলিখিত স্মৃতি-কথা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তিনি বিনা বিচারে আটক রাখা নীতির আন্তরিক বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তদানীন্তন সময়ে ঘটনার সঙ্কুলতায় তাঁহাকে এই নীতি সমর্থনে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। অধিকন্তু অকুস্থলের কর্ত্তৃপক্ষগণ সর্ব্বদাই দাবী করিতেন যে, ঘটনাস্থল সম্পর্কে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা যথেষ্ট অধিক এবং লর্ড মর্লে এই ধারণা বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত কিছু করিতে না পারিয়া, কতকটা যেন তাঁহাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া, অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই আইন প্রয়োগে সম্মতি দান করেন। এরূপ প্রকাশ, বড়লাটের শাসন পরিষদের কয়েকজন ব্যক্তির উপর অতি মাত্রায় বিরক্ত হইয়া লর্ড মিণ্টো লিখিয়াছিলেন, "এই প্রসঙ্গে একটি কথা,—এবার ত আমাদের হাতে ১৮১৮ সালের মরিচাধরা তলোয়ারটি আসিয়াছে, এখন আমি আশা করি আপনি ওমুক এবং ওমুককে (দুইজন পদস্থ কর্ম্মচারীর নাম) ইহার বলে নির্ব্বাসিত করিবেন। আপনার কি মত? আমি পরম আগ্রহের সহিত ইহা সমর্থন করিব।'

জীবনস্মৃতির আলোচনাসূত্রে লর্ড মর্লের এই বিদ্রূপাত্মক মর্ম্মবাণী হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, তিনি এই নীতির প্রতি কতদূর সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন! সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন,—"সেই দুইজন সরকারি কর্ম্মচারী কাহারা ছিলেন তাহা জানিতে পারা সাধারণের পক্ষে কোন দিনই সম্ভবপর হইবে না। কিন্তু এই শ্রেণীর সরকারী কর্ম্মচারিগণের কার্য্যাবলী কোন

দিনই ক্রটীশূন্য হইবার অবকাশ পাইবে না, যাবৎ তাঁহাদের পরিস্থিতি জনসাধারণের ইচ্ছাবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইবে। সকল দেশে সকল অবস্থায় দেখা গিয়াছে সরকারী কর্ম্মচারিগণের স্বেচ্ছাচারিতার সমাপ্তির স্থানে জনসাধারণের সহযোগিতা। লর্ড মর্লের সততাপূর্ণ বিবেক প্রায়শঃই তাঁহাকে রক্ষা কবচ রচনায় প্ররোচিত করিত। কিন্তু উহা যথাযথ পালন করা হইত কিনা তাহা বলা সম্ভব নহে। তিনি ১৯০৮ সালে ৪ঠা ডিসেম্বর লর্ড মিণ্টোকে লিখিয়াছিলেন, আমি "একটি বিষয় সম্পর্কে আপনাকে অনুরোধ করিতেছি। অভিযুক্তের অসাক্ষাতে কোন প্রকারের অনুসন্ধান অথবা বিচার করা রহিত করুন। হয়ত ইহার স্বপক্ষে আমরা যথেষ্ট যুক্তি দেখাইয়া বলিতে পারি যে উক্ত ব্যবস্থা বিশেষ অন্যায় বা অবৈধ নয়। কিন্তু তথাপি উহাতে যেন অষ্ট্রিয়া অথবা রুসদেশীয় শাসনের বিভৎসতার ছাপ লাগিয়া থাকে।" সুরেন্দ্র নাথ আরও লিখিয়াছেন,—ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের ১৯০৮ সালের ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে এক অধিবেশন হয়। তাহাতে একটি পরামর্শ সভা নিয়োগের প্রস্তাব উথাপন প্রসঙ্গে, আমি ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিবকে লর্ড মর্লের লিখিত জীবনস্মৃতি হইতে উপরোক্ত বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়া কহিয়াছিলাম, যদি লর্ড মর্লের এই উপদেশটি ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন বলে ধৃত বন্দিগণের তদন্তকালে প্রয়োগিত হইত!' তিনি ইহার কোন উত্তর দেন নাই। সুতরাং ইহার দ্বারা সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত করা যায় যে, এইরূপ একটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় রক্ষাপত্র প্রতিপালিত হয় নাই। লর্ড মর্লে নির্ব্বাসন দণ্ড প্রয়োগের যে একটি সীমা নিদ্ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা আর একটি দৃষ্টান্ত হইতে জানা যায়। ২৩শে আগষ্ট ১৯১৮ সালে তিনি লিখেন, 'আমি তাঁহাকে (একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পদস্থ কর্ম্মচারী) বিশেষ করিয়া যাহা বলিয়াছি, তিনি নিশ্চয় সে কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্মরণ রাখা উচিত, সন্দেহভাজন ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষেই যে হিংসামূলক কার্য্যে ব্রতী হইয়াছে, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত, তাহার নির্ব্বাসন প্রস্তাবের অনুমোদন করিতে আমি প্রস্তুত নহি।'

ইহার দ্বারা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে লর্ড মর্লের উপদেশ এখানেও কর্ত্তৃপক্ষ প্রতিপালন করেন নাই।

যদি তাঁহারা লর্ড মর্লের নির্দ্দেশ যথাযথ অনুসরণ করিতেন তাহা হইলে কৃষ্ণকুমার মিত্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শচীন্দ্র-প্রসাদ বসুর ন্যায় ব্যক্তিগণকে কখনই নির্ব্বাসিত করিতে পারিতেন না। তাঁহারা সকলেই গঠনমূলক ব্যবস্থার পূর্ণ সমর্থক ও সহযোগী ছিলেন। তাঁহাদের দ্বারা এমন কোন কার্য্য হওয়াই সম্ভবপর ছিল না, যাহা পরোক্ষভাবেও 'হিংসামূলক গোলযোগ' বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। সর্ব্বাপেক্ষা অসন্তোষের কালে যখন তাঁহারা পুলিশ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ সময়ও কোন প্রকার প্রতিশোধ লওয়ার কল্পনাও তাঁহারা করেন নাই; এমন কি উহাদের আক্রমণের পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়ভাবে আত্ম সমর্পন করিয়াছিলেন।"

লর্ড মর্লের শাসন সংস্কারের সঙ্কল্প

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতির এক স্থানে লিখিয়াছেন, "বর্ত্তমান যুগের বার্ত্তা বিনিময়ের সকল প্রকার সুবিধা হওয়া সত্ত্বেও, দশ হাজার মাইল ব্যবধান হইতে ভারত সচিবের কার্য্য পরিচালনায় ত্রুটি থাকা সম্ভব। সুতরাং পরিচালনা ব্যবস্থায় জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিতে হইলে ভারত সচিবের দায়িত্ব উপযুক্ত বাঁধন কষণের সহিত ভারত সরকারের হস্তে হস্তান্তরিত হওয়া প্রয়োজন; এবং হয়ত সেইদিন সমাগত কিম্বা

লর্ড মর্লে বিবেকের অনুরোধে ও নিজের দৃঢ় বিশ্বাসের প্রভাবে চণ্ড নীতির প্রতিকূল ভাবাপন্ন ছিলেন। কিন্তু অবস্থার সঙ্কুলতায় এবং সচিবের দায়িত্বে তাঁহার পক্ষে উহা যথাযথ রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। এবং এই সম্ভব না হইবার হেতুটিকে কেহ কেহ বিপ্লব আন্দোলন বলিয়া ব্যক্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে দৃঢ়তার সহিত আমরা বলিতে বাধ্য, জনসাধারণ যে কদাপি বিপ্লববাদের প্রতি অনুরক্ত নহেন, ইহা ধ্রুব সত্য। তাঁহারা এমন কোন আন্দোলনেরই পরিপোষকতা করেন না, যাহার ফলে সর্ব্বসাধারণের শান্তির ব্যাঘাত ঘটা সম্ভব। আইন

ও শৃঙ্খলার প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক আগ্রহ সকল সময়ই পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং লর্ড মর্লেও সকল ঘটনা লক্ষ্য করিয়া বুঝিয়াছিলেন, ভারতে এই প্রকারের শাসন নীতির অনুসরণ করা যুক্তি যুক্ত হয় নাই!

সুরেন্দ্রনাথ এসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

আমি স্বয়ং বিশ্বাস করি যে লর্ড মর্লে এই প্রকার দৃঢ় বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়াই গঠন মূলক সংস্কার রচনা করিবার ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল, যাহাতে ভারতের নেতাগণ এই শাসন ব্যবস্থাকে অধিকতর গ্রহনীয় ও প্রার্থনীয় বলিয়া মনে করিতে পারেন।"

মর্লে-মিণ্টো স্কীমের স্বরূপ

লর্ড মর্লের এই সংস্কার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রজগতে একটা সাড়া পড়িয়া গেল। ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড মিণ্টো অতি তৎপরতার সহিত এই শাসন-সংস্কারকে কার্য্যে পরিণত করিলেন। বড়লাটের শাসন ও প্রাদেশিক শাসন পরিষদে একজন করিয়া ভারতীয় সদস্য গ্রহণ, এবং বিলাতের ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে ভারতীয় সভ্যগণের নিয়োগ ব্যবস্থা, লর্ড মর্লের স্বরচিত। বহুকালের প্রচলিত প্রথার বিরোধী এই নব নিয়োগ ব্যবস্থায় লর্ড রিপনের ন্যায় ভারত-বন্ধুগণও প্রথমে সন্দিহান হইয়াছিলেন। এমন কি সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের ন্যায় পরম দয়ালু রাজাও এই বিস্ময়জনক পরীক্ষা-মূলক ব্যবস্থার সফলতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু লর্ড মর্লে অত্যন্ত দৃঢ়চিত্ত রাজনীতিক ছিলেন। সংস্কার সম্পর্কে তিনি যে শক্তিশালীতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা অনন্য-সাধারণ; এবং এই প্রকার দৃঢ় সঙ্কল্পের পরিচয় তিনি আর একবার দিয়াছিলেন,—লর্ড কিচেনারকে ভারতের বড়লাটরূপে নিয়োগের বিরুদ্ধে।

কিন্তু তথাপি লর্ড মর্লের এত সাধের সংস্কার ব্যবস্থা জনপ্রিয় হইবার অবকাশ পাইল না। অল্পদিনের মধ্যে ইহার নানাবিধ ক্রটী লক্ষিত হইয়াছিল। এই শাসন-সংস্কার মর্লে-মিণ্টো স্কীম নামে অভিহিত হয়। ইহার মুখ্য অবয়ব সম্ভবতঃ ইহাই ছিল যে, ব্যবস্থাপক সভায় বে-সরকারী সদস্যগণও জনসাধারণ সম্পর্কীয় প্রশ্ন উত্থাপন করিবার ক্ষমতা পাইবেন,

এবং এইভাবে সরকারের নীতির কিঞ্চিৎ সমালোচনার সুযোগ লাভ করিবেন। অবশ্য ইহার দ্বারা সরকারী-নীতি পরিবর্ত্তন অথবা নিয়ন্ত্রণ করিবার কোন অধিকার থাকিবে না।

বড়লাট সকাশে,—এই অমূল্য উপহার প্রদানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য একদল প্রতিনিধি গমন করেন। এমন কি টাউন হলে একটি সভা করিবার প্রস্তাবও হয়। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের হস্তক্ষেপের ফলে সেই সভা আর ঘটিতে পারে নাই। তিনি তদানীন্তন ছোটলাট সার এডোয়ার্ড বেকারকে বলেন যে, আমি এই সর্ত্তে সভায় যোগদান করিতে পারি ;—বঙ্গবিচ্ছেদের বিরুদ্ধে এবং উহা মকুবের প্রার্থনা করিয়া এই সভায় একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিতে দেওয়া হইবে। সরকারী পদস্থ কর্ম্মচারীগণ, যাঁহারা এই সভার অনুকূলে ছিলেন, সকলে এই সর্ত্তে সম্মত হইতে পারিলেন না ; ফলে সভার পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়।

আটক বন্দীগণের মুক্তিলাভ

১৯১০ সালে নূতন কাউন্সিল কার্য্যকরী হইল। প্রথম অধিবেশনের দিবসে মাননীয় বড়লাট লর্ড মিণ্টো ঘোষণা করিলেন, রাজনৈতিক বন্দিগণকে ১৮১৮ সালের ৩ আইন বলে আর আটক রাখিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা কোন প্রকার বৈপ্লবিক আন্দোলনের সহিত সংযুক্ত না থাকার হেতু তাঁহাদের মুক্তি প্রদান করা হইল।

বাবু কৃষ্ণ কুমার মিত্র, অশ্বিনী কুমার দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিগণকে নির্ব্বাসিত করা একটি বিষম রাজনীতিক ভূল হইয়াছিল। ইহার দ্বারায় কোন প্রকারে লাভ ত হয়ই নাই, বরঞ্চ ইহা যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হইয়াছিল। এই নীতির প্রবর্ত্তনের ফলে কাহাকেও ভীত করা সম্ভব হয় নাই ;—রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দারুণ উত্তেজনা ও অশান্তির সৃষ্টি করা হইয়াছিল। সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত ১৮১৮ সালের ৩আইন ক্রমাগত ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু সেই সময়ে যে প্রকারের অনুভূতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল সেইরূপ আর দেখা যায় নাই।

আটক বন্দীগণের মুক্তির জন্য সুরেন্দ্রনাথের বিলাতে প্রচেষ্টা

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবন স্মৃতিতে উল্লেখ করিয়াছেন, ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে যখন আমি বিলাতে ইণ্ডিয়া অফিসে লর্ড মর্লের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, তখন তাঁহাকে কৃষ্ণ কুমার মিত্র, অশ্বিনী কুমার দত্তের মুক্তির জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করি। লর্ড মর্লে মনোযোগ দিয়া আমার কথাগুলি শ্রবণ করেন, কিন্তু কোন উত্তর প্রদান করেন নাই। অবশ্য সে সময়ে এক প্রতিকুল অবস্থা সহসা উদ্ভব হইয়াছিল। সার উইলিয়ম কার্জ্জন উইলি সাহেব সম্প্রতি তখন ভারতে নিহত হইয়াছিলেন। তাহার ফলে সমগ্র ইংলণ্ডে—রাজনীতিক ষড়যন্ত্রকারি সন্দেহে ধৃতব্যক্তিগণের প্রতি দারুণ অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল। হয়ত শান্তিপূর্ণ সময়ে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলে সফলতা লাভ করা অসম্ভব হইত না। কিন্তু ১৯০৯ সালের জুলাই মাসে সে আশা বিন্দুমাত্র ছিল না।"

ব্যবস্থাপক সভায় সুরেন্দ্রনাথের প্রবেশলাভের বাধা অপসারণ

১৯০৯ সালে পার্লামেণ্টের বিধিতে এক আইন বিধিবদ্ধ করা হয় যে, কোন কর্ম্মচ্যুত সরকারী কর্ম্মচারী ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য হইতে পারিবেন না। এইভাবে সরকারি কার্য্য হইতে বরখাস্ত হওয়াকে সদস্য নির্ব্বাচিত হওয়ার অন্যতম অযোগ্যতা বলিয়া বিবেচিত হইল। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ১৮৯২ সালের আইনে এই অজুহাতে কাহাকেও অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করা হইত না। আর একবার যে এই বিধান বিধিবদ্ধ করিবার প্রয়াশ না হইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু তখন সে চেষ্টা সফল হয় নাই। যাহা হউক নূতন বিধিতে প্রাদেশিক ও ভারতীয় পরিষদে সুরেন্দ্রনাথের নির্ব্বাচন বাতিল হইয়া গেল। কিন্তু বিধিবদ্ধ আইনে এইরূপ আর একটি নির্দ্দেশ ছিল যে, সরকারের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী ইচ্ছা করিলে এই বাধা অপসারিত করিতে পারিবেন।

সার এডোয়ার্ড বেকার ছিলেন তখন বাঙ্গলার ছোটলাট। তিনি সুরেন্দ্রনাথকে উত্তমরূপে জানিতেন, এমন কি এক সময়ে কিছুকাল, উভয়ে জনহিতকর কার্য্যে সহকর্ম্মী ছিলেন। উভয়ের প্রতি উভয়ের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। সার এডোয়ার্ড বেকার সম্পূর্ণ নিজের ক্ষমতা বলে বিনা প্ররোচনায় সুরেন্দ্রনাথের নির্ব্বাচনের বাধা অপসারিত করিয়া সরকারী নির্দ্দেশ পত্র তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে তাঁহার জীবন স্মৃতিতে উল্লেখ করিয়াছেন,—

"এইবার আমায় একটু বিপদ সঙ্কুল অবস্থায় পড়িতে হইল। আমি বারবার বলিয়াছিলাম যে বঙ্গ ভঙ্গ রহিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমি কিছুতেই কাউন্সিলে দাঁড়াইব না। এমন কি আমি রিফর্ম্মড কাউন্সিল সম্বন্ধে বাঙলার জননেতাগণকে বলিয়াছিলাম,—যে পর্য্যন্ত বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত না হয় সে পর্য্যন্ত হাত গুটাইয়া থাকুন। বিলাতে ১৯০৯ সালের ২৪শে জুন তারিখে সার উলিয়াম ওয়েডবার্ণ প্রদত্ত—এক প্রীতি ভোজ উপলক্ষে,—ওয়েষ্ট মিনিষ্টার প্যালেস হোটেলে সার চার্লস ডিউক, সার হেনরি কটন, মিঃ হিউম, মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ডের উপস্থিতিতে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে আমি বলিয়াছিলাম, যদি লর্ড মর্লে তাঁহার দক্ষিণ হস্তে শাসন সংস্কারের পরিকল্পনা এবং বামহস্তে বঙ্গ-ভঙ্গ রদের প্রস্তাব লইয়া আমাদের বাঙলার অধিবাসীগণকে কহেন 'যে, তোমরা একসঙ্গে দুইটী পাইতে পারিবে না বটে, কিন্তু যে কোন একটী লইতে পার, তাহা হইলে আমার দেশবাসী আবেগের সহিত বলিতে দ্বিধা করিবে না যে, বঙ্গভঙ্গ রহিতের প্রস্তাব গ্রহণই তাহাদের স্পৃহনীয় এবং সুদিন আসিলে শাসনসংস্কার বরং অর্জ্জন করিয়া লইবে।"

সুরেন্দ্রনাথকে সরকারি সদস্যরূপে মনোনয়ন এবং সুরেন্দ্রনাথের উহা প্রত্যাখান

বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করিলেই লর্ড মর্লে সর্ব্বদাই অবজ্ঞাভরে কহিতেন যে, উহা সেটেল্ড ফ্যাক্ট অর্থাৎ অপরিবর্ত্তনীয় বিষয়। সুরেন্দ্রনাথ মনে মনে চিন্তা করিতেন এবং প্রকাশও করিতেন যে, বাঙলার জননেতাগণ যদি লর্ড মর্লের নবগঠিত ব্যবস্থাপক সভায় কোন

প্রকার অংশ গ্রহণ না করেন, তাহা হইলেই এই কথার উপযুক্ত জবাব দেওয়া হইবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও বুঝিতেন যে, এই প্রকারের আত্মসংযম করা সকলের পক্ষে হয়ত সম্ভবপর হইবে না। নিজের সম্বন্ধে যখন সুরেন্দ্রনাথ এই নীতি অনুসরণে বদ্ধ পরিকর হইলেন, ঠিক সেই সময়, সুরেন্দ্রনাথের পরম সুহৃদ বাঙলার ছোটলাট সার এডওয়ার্ড বেকার তাঁহার নিকট এক সরকারী মনোনয়ন পত্র প্রেরণ করিলেন। অবস্থা জটিল হইয়া দাঁড়াইল। একদিকে সার বেকারের ন্যায় সদাশয় বন্ধুর অনুরোধ,—অপরদিকে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ কল্পে গৃহিত প্রতিজ্ঞার প্রতিপালন! কোন্‌টি গ্রহনীয়?

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবন স্মৃতিতে লিখিয়াছেন,—

আমি এবার উভয় সঙ্কটে পড়িয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য আমার কতিপয় বিশিষ্ট বন্ধুকে আমন্ত্রণ করিলাম। তন্মধ্যে স্বর্গীয় এ রসুল, আনন্দ চন্দ্র রায়, অম্বিকা চরণ মজুমদার অন্যতম। তাঁহারা সকলেই এক-বাক্যে এই মত প্রকাশ করিলেন যে, সরকারের এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করাই বিধেয়। কারণ যদি আমি ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ গ্রহণ করি তাহা হইলে, সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গের নেতা ও জনসাধারণ,—পশ্চিম বঙ্গের নেতাদের প্রতি আস্থাহীন হইয়া পড়িবেন। পূর্ব্ব বঙ্গের নেতাগণ নব গঠিত ব্যবস্থাপক সভায় কোন প্রকার অংশ গ্রহণে বিরত ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা স্বভাবতই আশা করেন যে, পশ্চিম বঙ্গের নেতাগণও তাদৃশ পন্থা অবলম্বন করিবেন। আমি তাঁহাদের এই মূল্যবান অভিমত সাগ্রহে গ্রহণ করিলাম। আমার পক্ষে বঙ্গভঙ্গ রহিত হওয়াই ছিল সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়,—তাহার পরে জনসেবা।"

ইহা ভিন্ন আর একটি কারণে সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে ব্যবস্থাপক সভায় যোগদান অসম্ভব ছিল। নব বিধিবদ্ধ রেগুলেসন অনুসারে নরম পন্থীদলের কতিপয় বিশিষ্ট নেতা নির্ব্বাচনে অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই অযোগ্যতার বাধা অপসারিত না হওয়া পর্য্যন্ত সেই সকল সহকর্ম্মীগণকে পরিত্যাগ করিয়া সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে

একাকী ব্যবস্থাপক সভায় যোগদান করা অকর্ত্তব্য। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ—সার বেকারকে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে তাঁহার জীবন স্মৃতিতে লিখিয়াছেন "আমার এই প্রত্যাখানের ফলে আমাদের উভয়ের প্রীতিবন্ধন কিন্তু বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তাঁহার ন্যায় মহতের অকাল মৃত্যুতে আমি অত্যন্ত ব্যথিত এবং আজও তাঁহার কথা আমি স্মরণ করি।"

সুরেন্দ্রনাথের বিলাতে ইম্পিরিয়াল প্রেস কনফারেন্সে নিমন্ত্রণ

বিলাতে লণ্ডন সহরে ১৯০৯ সালে জুন মাসে ইম্পিরিয়াল প্রেস কন্‌ফারেন্স, অর্থাৎ সংবাদপত্র-সেবিগণের এক সম্মেলন হয়। ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের তাবৎ সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিগণ এই সম্মিলনে আমন্ত্রিত ও সমাবেশিত হন। ভারতীয় সংবাদ পত্রের প্রতিনিধি স্বরূপ একমাত্র সুরেন্দ্রনাথ নির্ব্বাচিত ও আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বিলাতের টাইমস্ কাগজের মিঃ লোভাট ফ্রেজার ছিলেন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন ও আমন্ত্রণ করিবার কর্ত্তা। তিনি সুরেন্দ্রনাথকে যোগ্যতম ব্যক্তি বোধে নিমন্ত্রণ করেন। বিশাল ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র সুরেন্দ্রনাথকে এই সম্মান প্রদান—শুধু তাঁহারই নহে, সমগ্র বাঙালী জাতির গৌরবের কথা।

এতবড় সম্মান লাভ করা সত্ত্বেও সুরেন্দ্রনাথ বিলাত যাওয়া সম্পর্কে একটু ইতস্ততঃ করিলেন। কারণ, কয়েকটী অন্তরায় তাঁহার যাত্রার অত্যতম বিঘ্ন স্বরূপ উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সময়, তাঁহার প্রাণ-প্রিয় রিপন কলেজের পরিচালন ব্যবস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়ের নব বিধান অনুযায়ী পুণর্গঠিত হইতেছিল। ইহারই কিছুদিন পূর্ব্বে আইন বিভাগ খুলিবার জন্য এক সঙ্কট সঙ্কুল অবস্থা রিপন কলেজকে অতিক্রম করিতে হইয়াছে। ঐ সময় বাঙলাদেশের বহু শিক্ষায়তনের আইন বিভাগ খুলিবার প্রার্থনা-পত্র নামঞ্জুর হইতেছিল। কিন্তু সুরেন্দ্র-নাথের বিশিষ্ট বন্ধু ও বাঙলার ছোটলাট সার এডোয়ার্ড বেকারের

হস্তক্ষেপের ফলে, এবং সঙ্গে সঙ্গে কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ তৎপরতার সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি যথাযথ উপস্থিত করায়, রিপন কলেজ আইন বিভাগ খুলিবার অনুমতি লাভে সক্ষম হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কর্ত্তৃপক্ষগণ সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। অন্য কাহারও পক্ষে হইলে উপরোক্ত বাধা অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই হয়ত বোধ হইত,—বিশেষ করিয়া তদৃশ সম্মানজনক আমন্ত্রণের তুলনায়! কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতুতে গঠিত ছিল। তাঁহার প্রাণস্বরূপ রিপন কলেজের বিন্দুমাত্র ক্ষতি হইবে, ইহা সহ্য করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না; বিলাতের ঐ অনন্য সাধারণ সম্মানকে তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারিতেন। তিনি এতই তাঁহার স্বহস্ত গঠিত বিদ্যায়তনটিকে ভালবাসিতেন; আর সেই প্রকার ভালবাসিতেন তাঁহার স্বদেশের ছাত্রবৃন্দকে।

এই অবস্থায় সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার পরম বন্ধু এডোয়ার্ড বেকারের পরামর্শ চাহিলেন। সার বেকার সুরেন্দ্রনাথকে এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যানে নিষেধ করিলেন। তিনি এইরূপ আশ্বাসও দিলেন যে, সুরেন্দ্রনাথের অবর্ত্তমানে রিপন কলেজের কোন প্রকার ক্ষতি তিনি ঘটিতে দিবেন না। ঠিক সম-প্রকারের আশ্বাসবাণী সুরেন্দ্রনাথ পাইলেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার, দেশবরেণ্য মনীষি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নিকট। তিনি সুরেন্দ্রনাথকে নিশ্চিন্ত চিত্তে বিলাত গমনের উপদেশ প্রদান করিলেন। এই দুই বন্ধুর উপদেশ ও আশ্বাসবাণী না পাইলে হয়ত শেষ পর্য্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ বিলাতের এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখানে দ্বিধা করিতেন না। রিপন কলেজের আইন বিভাগ সুরক্ষিত থাকিবার আশ্বাসবাণী লাভের পর তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে বিলাত যাত্রার আয়োজনে ব্যাপৃত হইলেন। স্বদেশ ছাড়িয়া বিদেশ গমনে সুরেন্দ্রনাথের বিন্দুমাত্র আগ্রহ কোন দিন ছিল না। স্বদেশের বক্ষে খেলা করিতে তিনি চিরদিন ভালবাসিতেন। স্বদেশের সেবা ছিল তাঁহার চিত্তবিনোদনের উপকরণ, তাঁহার আনন্দ—তাঁহার আকাঙ্খা।

সুরেন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি লিখিয়াছেন—

জীবনে বহুবার আমাকে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু আমি কোন দিনই ইহা ভালবাসি নাই। নিজের স্বদেশ ছাড়িয়া সুদূর যাত্রার পক্ষপাতি আমি ছিলাম না। গৃহের আবেষ্টন আমার চিত্তে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদ্রেক করে। ১৮৯৭ সালে যখন আমায় ওয়েলবী কমিশনে সাক্ষ্য দিতে বিলাত যাইতে হয়, তখন আমি কমিশনের সভাপতি লর্ড ওয়েলবীকে অনুরোধ করিয়াছিলাম, যেন আমার সাক্ষ্য যথা শীঘ্র সম্ভব গ্রহণ করিয়া আমায় নিষ্কৃতি দেওয়া হয়। তিনি আমার এ অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন; এবং সাক্ষ্যপ্রদান সমাপনের অনতিবিলম্বে আমি স্বদেশাভিমুখে রওনা হইলাম। ইহারই কয়েক সপ্তাহ পরে ভারত সম্রাজ্ঞী কুইন ভিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলীর সমারোহ উৎসব সম্পন্ন হইবার দিন ছিল। আমার বহু সহকর্ম্মী বন্ধু এই উৎসব দর্শনার্থে বিলাতে রহিয়া গেলেন। কিন্তু আমার থাকিবার স্পৃহা হইল না। জীবনে কোন দিনই কোন প্রকারের আমোদ প্রমোদ অথবা উৎসবাদি আমার চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। আমি সর্ব্বদাই নিজের গৃহে নিজের কার্য্যের মধ্যে লিপ্ত থাকিতে ভালবাসি।"

সুরেন্দ্রনাথের বিলাত গমন ও সাংবাদিক সম্মেলনে যোগদান

১৯০৯ সালে ১৫ই মে, সুরেন্দ্রনাথ ভারত পরিত্যাগ করিয়া ৩রা জুন লণ্ডনে পৌছান। ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে যখন ট্রেণখানির গতি মন্থর হইল, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। ষ্টেশনে সুরেন্দ্রনাথের বহুদিনের বন্ধু মিঃ এইচ, ই, এ, কটন মোটর লইয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। মিঃ কটন সুরেন্দ্রনাথের সহিত ওয়ালডর্ফ হোটেল পর্য্যন্ত গেলেন। এইস্থানে সম্মিলনের প্রতিনিধিগণের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তথায় সুরেন্দ্রনাথের থাকিবার সকল প্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা স্বচক্ষে না দেখা পর্য্যন্ত, মিঃ কটন হোটেল পরিত্যাগ করেন নাই। উভয়ের বন্ধুত্ব এতই প্রগাঢ় ছিল।

পরদিবস সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে যোগদানার্থে সমাগত প্রতিনিধি-গণকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য এক ভোজ সভার আয়োজন হয়। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "ডেলি টেলিগ্রাফ্ সংবাদপত্রের সত্বাধিকারী লর্ড বার্ণহাম ও বিখ্যাত বক্তা লর্ড রোজবেরি সময়োপযোগী এক বক্তৃতার দ্বারা প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থিত করিলেন। লর্ড বার্ণহামের বয়স সে সময় প্রায় আশীতিবর্ষ অতিক্রম করিয়াছিল, কিন্তু তথাপি যৌবনের উৎসাহও উদ্দীপনা তখনও যেন তাঁহার প্রতি পদক্ষেপে প্রতিভাত হইতেছিল। আমি 'ডেলি নিউজ' কাগজের প্রতিনিধি মিঃ নেভিনসন ও মিঃ গার্ড্জেনারের সহিত এক টেবিলে বসিলাম। মোটের উপর সেই দিনের উৎসবটি যে পরমানন্দদায়ক হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

সংবাদ-পত্রসেবি সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয় ৭ই জুন হইতে। প্রথম দিবসের আলোচ্য বিষয় ছিল,—'কেবলগ্রাম' প্রেরণের মূল্য হ্রাস সম্পর্কে। টেলিগ্রাফ্ সম্পর্কীয় সুবিধা এবং উহার মূল্য হ্রাস বিষয়ক প্রস্তাবটি গৃহিত হয়; এবং ইহার জন্য একটি কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়। সুরেন্দ্রনাথ এই প্রস্তাবটির স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ভারতের রাজনৈতিক অবস্থাগুলি এবং ক্রমোন্নতির ঘটনা সমূহ বিলাতের অধিবাসীদের নিকট প্রচারিত হওয়া প্রয়োজনীয়; এবং কেবল-গ্রামের মূল্য হ্রাস হইলে এই বিষয়ে মূলতঃ সাহায্য হইবে।

দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশন এবং সম্পূর্ণ অতর্কিতভাবে, ভারতের জাতীয় সংবাদপত্রগুলিকে আক্রমণ

এসম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথের তাঁহার স্মৃতি কথায় যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই,—

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে আলোচ্য বিষয় ছিল, সংবাদপত্র ও সাম্রাজ্য। নৌ-সেনাবাহিনীর প্রধান লর্ড ম্যাককেন্না সভাপতির

আসন গ্রহণ করেন। এই দিনের আলোচনা চলে প্রধানতঃ নৌ বিভাগের রক্ষণ সম্বন্ধে। সুতরাং এই আলোচনায় যোগদান করা আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন বুঝিয়া আমি উঠিয়া পড়িব মনে করিতেছিলাম। ঐ দিনই কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটির এক অধিবেশন ছিল, বরঞ্চ তাহাতে যোগদান করিতে যাইব, ইহাই ভাবিতেছি; এমন সময় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ও অপ্রাসঙ্গিকভাবে লর্ড ক্রোমার এক বিষাক্ত প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করিলেন। তিনি বলিলেন,—"ভারতীয় সংবাদপত্র সমূহে দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া ভারতের বিপ্লববাদী আন্দোলনকে পরিপুষ্ট করা হইতেছে না কি?" এই প্রশ্নটি যে আমাকে উদ্দেশ্য করিয়াই নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহাতে আর ভুল ছিল না। আমি পরম আশ্চর্য্য ও ব্যথিতভাবে এই মন্তব্যটি শ্রবণ করিলাম। কিন্তু শুধু শ্রবণ করিয়া হজম করিলে চলিবে না; ইহার উপযুক্ত উত্তর দেওয়া বিশেষ দরকার। নতুবা লর্ড ক্রোমারের এই স্পর্দ্ধিত বাক্যটিকে প্রকারান্তরে সমর্থন করাই হইবে। ভারতীয় সংবাদপত্র-সেবীগণের পক্ষ হইতে আমিই যখন একমাত্র প্রতিনিধি ঐ সভায় উপস্থিত ছিলাম, তখন এই হীন দোষারোপের প্রতিবাদ করিতে আমি ন্যায়তঃ বাধ্য। মনে মনে কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া চিন্তাপূর্ব্বক এই আক্রমণের উপযুক্ত প্রত্যুত্তরের একটি খসড়া স্থির করিয়া, সভাপতির সকাশে আমার নাম একখণ্ড কাগজে লিখিয়া প্রেরণ করিলাম। সভায় কোন বক্তৃতা করিতে হইলে এইরূপ নাম প্রেরণ করা নিয়ম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে বক্তৃতার্থে আহ্বান করা হইল। আমি সংক্ষেপেই আমার বক্তব্য শেষ করিলাম।

সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতার সারাংশ

তিনি বলেন—

সম্মেলনের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক এইরূপ একটি মন্তব্য প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছি বলিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত। লর্ড ক্রোমার আমাদের সম্মুখে এক প্রশ্ন উপস্থাপিত

করিয়াছেন, যে বাঙলাদেশে সম্প্রতি যে বিপ্লববাদ আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, উহা ভারতীয় সংবাদপত্রে অংশ বিশেষ প্রকাশিত দায়িত্বহীন মন্তব্যের পরিণতি কি না? এই প্রশ্নের আমার একমাত্র সুস্পষ্ট উত্তর হইল—"না।" (শুনুন, শুনুন ধ্বনি) আমি ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত যাবতীয় ঘটনাগুলি সমর্থনে এস্থানে দণ্ডায়মান হই নাই। আমি এইখান হইতে আমার সংবাদপত্র-সেবী বিভিন্নদেশের ভ্রাতৃগণকে জিজ্ঞাসা কি,—তাঁহারা কি তাঁহাদের সংবাদপত্রে প্রকাশিত জনসাধারণ সম্পর্কীয় যাবতীয় ঘটনাগুলির পক্ষ সমর্থনে স্বীকৃত আছেন? আমরা যে অভ্রান্ত নহি ইহা নিশ্চিত। সময় সময় আমাদের পক্ষে গুরুতর প্রমাদ করিয়া বসা অসম্ভব নহে; এবং আমরা তাহা করিয়াও থাকি। তাহা বলিয়া আমি যে, কোন কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত দায়িত্বহীন রচনাবলীর স্বপক্ষে যুক্তি দেখাইতেছি—তাহা নহে। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতে আজকাল কোন কোন সংবাদপত্রে হয়ত ঐ প্রকারের রচনা প্রকাশিত হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঐ প্রকার সংবাদপত্রের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। (শুনুন শুনুন ধ্বনি) তাহাদের প্রচার সংখ্যা অত্যন্তই মুষ্টিমেয় এবং জনসাধারণের উপর তাহাদের কোন প্রভাবই যে নাই, ইহা অবিচলিতভাবে বলা চলে। আমার বক্তব্য সম্বন্ধে কেহ যেন কোন ভুল ধারণা না করেন। আমি আদৌ, বাঙলাদেশে আত্মপ্রকাশিত বিপ্লববাদ আন্দোলনের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাইতেছি না। বাঙলাদেশের প্রত্যেক ধীসম্পন্ন ব্যক্তির সহিত আমরা এই বৈপ্লবিক আন্দোলনকে আন্তরিক ঘৃণা করি (তুমুল হর্ষধ্বনি)। আমরা এবং আমাদের সহযোগী সাংবাদিকগণ তীব্র ভাষায় আমাদের ভারতীয় সংবাদপত্রে ইহার সমালোচনা করিয়া আসিতেছি। এইস্থানে একটি কথা বলি, আশা করি কেহ অপরাধ লইবেন না। বিপ্লববাদের সৃষ্টি পাশ্চাত্যে,—প্রতীচ্যে নহে। পাশ্চাত্য দেশ হইতে উহা প্রতীচ্যে সংক্রামিত হইয়াছে। আমাদের পূর্ণ আশা আছে যে, লর্ড মর্লির সহানুভূতিপূর্ণ ও উন্নতি-বিধায়ক ব্যবহারের প্রভাবে অচিরাৎ ইহার উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। এই অপ্রিয় আন্দোলনের অন্যতম যে সকল কারণ আছে, তাহা প্রকাশ

করিবার বাসনা আমার খুবই হইয়াছে। কিন্তু এই সম্মেলনে যে রাজনৈতিক সম্পর্ক বিহীন তাহা আমি ভুলিয়া যাই নাই। অতএব প্রতীচ্যের স্বভাবসিদ্ধ আত্মসংযম অবলম্বন করিয়া, সেই প্রলোভনটুকু আজ আমি দমন করিলাম (তুমুল হর্ষধ্বনি)। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা যে পরম উপকারক ইহা আমরা স্বীকার করি; এবং ব্রিটিশ শাসনাধীনে উহা লাভ করিতে পারায় আমরা কৃতজ্ঞ। আমাদের প্রতি এই স্বাধীনতার অর্পণ যে কেবলমাত্র রাজনৈতিক কারণে তাহা নহে;— জ্ঞান বিস্তারের ও প্রয়োজনীয় বার্ত্তা পাইবার সহায়ক যন্ত্র বলিয়া। ভারতীয় সংবাদপত্রের যিনি স্বাধীনতা প্রদাতা ছিলেন, অন্ততঃ ইহাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য এবং ইহাই ছিল তাঁহার আশা। কোন এক সময় ভারতীয় সংবাদপত্র-সেবীগণের পক্ষ হইতে একটি প্রতিনিধিসঙ্ঘ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিষয়ক প্রশ্ন লইয়া লর্ড মেটকাফের সকাশে উপস্থিত হইলে, তিনি বলেন, "ভারতবর্ষে আমরা কেবলমাত্র শাসন করিতে, কিম্বা করাদায় করিতে অথবা নিজেদের মঙ্গল সাধন করিতে আসি নাই। উহাপেক্ষা এক বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা আসিয়াছি। পাশ্চাত্যের জ্ঞান, কৃষ্টি এবং সভ্যতা—প্রাচ্যে বিস্তার করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।" আমি আমার স্বদেশবাসীগণের পক্ষ হইতে এই আকাঙ্খাই করি, যেন সেই শুভ-ইচ্ছা শাসন পরিচালনার সাহায্যার্থে এবং প্রজাগণের সুখ সুবিধার জন্য ব্যবহৃত হয়। সেই সঙ্গে প্রার্থনা এই যে, ভারতের এবং ইংলণ্ডের পরস্পরের সহযোগীতার এই প্রীতিবন্ধন যেন চিরদিন অব্যহত রহে!"

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তৃতায় যেখানে বলেন যে,—'আমি রাজনীতিক বাকবিতণ্ডায় যোগ দিব না, আমি আমার প্রাচ্যের আত্মসংযম অবলম্বন করিব, তখন সমগ্র প্রেক্ষাগৃহ আনন্দে করতালি দিয়া উঠে। ক্যানেডেনিয়ান প্রেসের প্রবীণ সভ্য লর্ড হেলগ্রেহাম এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, 'আদর্শ বক্তৃতা হইয়াছে।' অপর একজন সংবাদপত্রের প্রতিনিধি মন্তব্য করেন যে,—মিঃ ব্যানার্জ্জী লর্ড ক্রোমারকে সম্মার্জ্জনীতে পরিণত করিয়া কক্ষতল পরিস্কৃত করিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন,—

আমার এই প্রত্যুত্তরটি যে যথোপযুক্ত হইয়াছিল, তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের সমাগত প্রতিনিধিগণের সম্মুখে,—ভারতীয় সংবাদপত্রের যে এইভাবে দোষস্খালনে সক্ষম হইয়াছিলাম,—তাহাতে আমার পরম আনন্দ হইয়াছিল।”

সম্মেলনের আতিথ্য সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথের অভিমত

সম্মেলনের অধিবেশন প্রায় প্রত্যহই হইত; এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভোজের আয়োজন থাকিত। কিছুদিন ধরিয়া নিমন্ত্রণের সহিত এই প্রকারের কার্য্যব্যবস্থা চলে।

সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

ইংরাজগণ যে অত্যন্ত আতিথ্য পরায়ণ তাহাতে কিছুমাত্র ভুল নাই। তাঁহারা অতিথিগণের প্রতি সর্ব্বপ্রকার সৌজন্য প্রকাশে সদাই তৎপর। অতিথিগণ যেন তাহাদের আতিথ্য সম্বন্ধে কোন প্রকার ভুল ধারণার অবকাশ না পান, সে বিষয়ে সদাসর্ব্বদাই ইংরাজগণ সতর্ক। যখন আমরা বিলাতের শোফিল্ড সহরে বিখ্যাত ছুরী কাঁচি আদি অস্ত্রের কারখানা পরিদর্শন করিতে গমন করিয়াছিলাম, তখন তথাকার কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের প্রত্যেককে (প্রতিনিধিগণকে) একখানি করিয়া ছুরী স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ উপহার দেন। সেফিল্ড সহর অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত বিষয়ে পৃথিবী-বিখ্যাত। ডেমষ্টার সহরের বিরাট মোটরের কারখানা পরিদর্শনান্তে আমাদের প্রত্যেককে কারখানার কর্ত্তৃপক্ষ স্মৃতি-স্বরূপ এক একখানি সুদৃশ্য নোট-বুক গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ করেন। ডিনার কিম্বা লঞ্চের টেবিলে আমরা সম্পূর্ণ বন্ধুভাবে পরস্পরের সহিত আলাপ আলোচনা করিতাম। উচ্চ-পদ-মর্য্যাদা, ব্যক্তিত্ব অথবা আভিজাত্যের সম্মান রক্ষার্থে কোন গণ্ডী কিম্বা সঙ্কীর্ণতা মোটেই তথায় দেখা যাইত না। সেখানে আমরা সকলেই হাস্যপরিহাসের সহিত সময় অতিবাহিত করিতাম। একদিন

অক্সফোর্ডে 'অল সোল্‌স কলেজে' আমাদের জন্য এক মাধ্যাহ্নিক ভোজের আয়োজন হয়। লর্ড কার্জ্জন সেই সভার সভাপতিত্ব করেন এবং তদুপলক্ষে এক বক্তৃতা দেন। আমার ঠিক পাশেই গ্রীক ভাষার অধ্যাপক প্রফেসার গিলবার্ট মারে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে লর্ড কার্জ্জন সম্পর্কে পরিহাস পূর্ব্বক বলেন, এখানে এমন একজন ব্যক্তি আছেন, যিনি অতি সাধারণ স্থানেও গুরু গম্ভীর আড়ম্বর পূর্ণ ভাষা ব্যবহারে বিশেষ পটু।"

ইংলণ্ডের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন—

প্রায় দ্বাদশ বৎসর পরে পুনরায় বিলাত গমন করিয়া দুইটি বিষয় আমার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উহা মদ্যপরিবর্জ্জনকারি ও নিরামিষভোজীদের সংখ্যার আধিক্য। এই দুইটি বিষয়ই যে সামাজিক আন্দোলনের সুফল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিলাতের ন্যায় স্থানে মদ্য এবং মাংসের পরিবর্জ্জন অনুভাবনীয়।

সম্মেলনের অবশিষ্ট অধিবেশন

সম্মেলনের চতুর্থ দিবসে লর্ড মর্লে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সেইদিনের আলোচ্য বিষয় ছিল, সম্পাদকতা ও সাহিত্য (Journalism and Literature)।

সুরেন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

আমি এই বিষটির উপর এক বক্তৃতা প্রদান করি। অতঃপর পার্লামেণ্টের মেম্বর মিঃ টি, পি, ওকোনর বক্তৃতা দেন। তিনি আমার বক্তৃতার বিলক্ষণ সুখ্যাতি করেন। লর্ড মর্লে বক্তৃতায় বলেন, সাহিত্য একটি কলা বিশেষ, এবং সম্পাদকতা হইল একটি শিল্প। উভয় বিষয়ই তিনি বক্তৃতায় বিশ্লেষিত করেন।

সৈন্য বাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন এবং বঙ্গভঙ্গ প্রসঙ্গে সমর সচিবের মন্তব্য

সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

আমরা 'এলডারগেট' নামক স্থানে আমন্ত্রিত হইয়া ১৪ হাজার সৈন্যের এক বাহিনীর কুচ কাওয়াজ পরিদর্শন করি। এইখানে আমায় বিলাতের সমর-সচিব লর্ড হেলডেনের সহিত পরিচিত করিয়া দেওয়া হয়। তিনি সংবাদপত্র-সেবী প্রতিনিধিগণকে অভ্যর্থিত করিবার জন্য লণ্ডন হইতে এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমার অতি অল্প সময়ের জন্যই কথাবার্ত্তা হয়; কিন্তু তাহার মধ্যেই আমি বঙ্গব্যবচ্ছেদ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিয়াছিলাম যে, এই ব্যবস্থাতে বাঙলার জনসাধারণ অত্যন্ত ব্যথিত। তিনি আমার সকল কথা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, 'মর্লে এটাকে তুলে দিলে ত পারে!'

আমি ইংলণ্ডে যে কোন ইংরাজ রাজনীতিকের সহিত এই প্রসঙ্গ লইয়া আলাপ করিয়া দেখিয়াছি, তাঁহাদের সকলেরই মনোভাব ঐ প্রকার।"

বঙ্গভঙ্গ রহিতের জন্য বিলাতে সুরেন্দ্রনাথের প্রচার কার্য্য

তিনি লিখিয়াছেন—

"বিলাত হইতে প্রত্যাগমন কালে আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, কোন দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিই এই অঙ্গচ্ছেদের সমর্থন করেন না। আমরা যদি বিশেষভাবে ইহার বিরুদ্ধে লড়াই করি তাহা হইলে ইহা রহিত হইতে বাধ্য। আমি বিলাতে লর্ড কর্টেনির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তিনি লর্ড মর্লের একজন বিশিষ্ট বন্ধু। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের ফলে বাঙলাদেশে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলে, তিনি আমাকে আশা দেন যে, লর্ড মর্লেকে এ

সম্বন্ধে অনুরোধ করিবেন। মিঃ ম্যাকারনেসের সহিত মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চিলের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলাম। তাঁহারা উভয়েই লর্ড মর্লেকে এ প্রসঙ্গে সাধ্যমত অনুরোধে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। বঙ্গব্যবচ্ছেদের ফলে যে বাঙলার অধিবাসীগণ—ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত, এ বিশ্বাস তাঁহাদের পূর্ণমাত্রায় হইয়াছিল, তাহা আমি দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি।

ম্যানচেষ্টারে যখন আমি গমন করি, তখন তথাকার শক্তিশালী স্ববিখ্যাত সংবাদপত্র 'ম্যানচেষ্টার গার্জ্জিয়ানের' সম্পাদক মিঃ সি, পি, স্কটের সহিত আমার আলাপ হয়। আমি তাঁহাকেও বঙ্গব্যবচ্ছেদের বিষয় অবগত করাইয়াছিলাম; তিনি বিশেষ সহনুভূতি প্রকাশ করিলেন। আমি তখন তাঁহাকে তাঁহার সংবাদপত্রে এ সম্বন্ধে তীব্রভাবে আলোচনা করিবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তিনি জানাইলেন যে, ইহার দ্বারা কোন ফল হইবে না; কারণ লর্ড মর্লে উদার পন্থী দলের নেতা, এবং সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা তিনি ল্যাঙ্কাশায়ারের অধিবাসী।"

ম্যানচেষ্টার গার্জ্জিয়ান টোরীদিগের অর্থাৎ রক্ষণশীল দলের কাগজ।

কংগ্রেস ও সুরেন্দ্রনাথ

সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতির একস্থানে লিখিয়াছেন,—

I had helped to build up the Congress. It was a part of my life work, my pride and my privilege, and it was not in me to do aught which, in my opinion, would weaken its influence or the great position which it occupied in the estimation of the country.

অর্থাৎ কংগ্রেসকে গঠিত করিতে আমি সাহায্য করিয়াছিলাম। ইহা আমার গর্ব্ব, ইহা আমার দাবী; আমার জীবনের সাধনার ইহা একটি অন্যতম অংশ। আমার ধারণায় যে কার্য্যের দ্বারায়, দেশের উপর বিস্তৃত ইহার দৃঢ় প্রভাবটি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, উহাকে সমর্থন করা আমি কোন দিন যুক্তিযুক্ত বোধ করি নাই।" তিনি শেষদিন পর্য্যন্ত এই ধারণানুযায়ী কার্য্য করিয়া গিয়াছেন।

কংগ্রেসের উপর তাঁহার অখণ্ড প্রভাব ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান

ছিল। তাহার পর উহার কর্ত্তৃত্বভার চরমপন্থী দলের হাতে চলিয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতাগণ যখন কংগ্রেসের অন্যতম পরিচালক ছিলেন, যখন তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ণ প্রভাব কংগ্রেসে প্রয়োগ করিতে পারিয়াছিলেন, সেই সময়ই কংগ্রেসের ক্রীড বা দাবী কি, তাহা লিখিতভাবে নির্দ্দেশিত হয়। ইহা ১৯০৮ সালের ঘটনা। সুরাট কংগ্রেস দক্ষযজ্ঞে পর্য্যবসিত হইলে, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নরমপন্থী নেতাগণ সেইস্থানে একটি সভা করিয়া যে প্রস্তাব গ্রহণ করেন উহাই কংগ্রেসের 'ক্রীড' বলিয়া পরিচিত হয় এবং ১৯১৯ সাল পর্য্যন্ত ইহার বাক্যাংশ অপরিবর্ত্তিতই থাকে। এই আহুত সভা 'ন্যাসান্যাল কনভেনন্স'রূপে অভিহিত হয়। এই সভায় প্রস্তাবিত খসড়াটি পরবর্ত্তী এপ্রিল মাসে, সার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে মাদ্রাজ কংগ্রেসে গৃহীত হয়।

সুরেন্দ্রনাথ চিরদিন গঠনমূলক পন্থার অনুসরণকারী ছিলেন। তাঁহার নীতি ছিল গঠনমূলক, ধ্বংসসূচক নীতিকে তিনি কোনদিন সমর্থন করেন নাই। কি সরকারের সহিত, কি দেশের কার্য্যে সুরেন্দ্রনাথ সর্ব্বদাই গঠনমূলক পন্থা অবলম্বন করিতেন। গবর্ণমেণ্টের সহিত বিবাদ লড়াই করিতেন, তাহাও গঠনমূলক পন্থা ধরিয়া। এমন ভাবে কোন কার্য্য করা তিনি উচিত মনে করিতেন না, যাহার ফলে একেবারে সরকারের সহিত জনসাধারণের সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই মতবাদ আবার সকল দলের পছন্দমত ছিল না। এইজন্য অনেক সময় প্রতিপক্ষ চরমপন্থী দলের সহিত তাঁহার মত বিরোধ ঘটিত। সুরেন্দ্রনাথের প্রতিপক্ষদলও স্বীকার করিতেন যে, তাঁহার আপোষ করিবার ক্ষমতা অদ্ভুত ছিল। সুরেন্দ্রনাথ যতদিন কংগ্রেসের সহিত সংযুক্ত ছিলেন, যতদিন তাঁহার প্রভাব কংগ্রেসের উপর অক্ষুণ্ণ ছিল,—ততদিন কংগ্রেসে এই নীতিই অবলম্বনীয় হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ১৯০২ সাল হইতে পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবগুলি ও সেই সঙ্গে কংগ্রেসের একটি সভায় সুরেন্দ্রনাথ সভাপতি হইয়া যে বক্তৃতা করেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল।—ইহার দ্বারায় উপরোক্ত কথাগুলির সমতা উপলব্ধি হইবে।

নিখিল ভারত কংগ্রেস মহাসভায় গৃহীত প্রস্তাব সকল

অষ্টাদশ অধিবেশন, আমেদাবাদ—১৯০২

১ম প্রস্তাবঃ— সম্রাটের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। ১৯০৩ সালের ১লা জানুয়ারী দিল্লীতে সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের যে করোনেশন দরবার হইবে তদুপলক্ষে এই কংগ্রেস সম্রাটের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছে। এই কংগ্রেস আশা করে যে, সম্রাটের রাজত্বে সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি, সমৃদ্ধি ও সন্তোষ বিরাজ করিবে এবং পরলোকগতা সম্রাজ্ঞী যে ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহা ক্রমশঃ সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হইবে। কংগ্রেস আরও আশা করে যে, সম্রাট ভারতবাসীর প্রতি যে বাণী প্রদান করিবেন তাহাতেও পরলোকগতা সম্রাজ্ঞীর ঘোষণার পুনঃ সমর্থন করা হইবে।

২য় প্রস্তাবঃ—শোক প্রকাশঃ—কংগ্রেসের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মিঃ আর, এম, সায়ানী, ও মিঃ পি রঙ্গিয়া নাইডুর মৃত্যুতে কংগ্রেস গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। মিঃ নাইডু নানাদিক দিয়া দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন।

৩য় প্রস্তাবঃ—দারিদ্র্য ও তাহার প্রতিকার।

এই কংগ্রেস ভারতীয়দের শোচনীয় দারিদ্র্যের প্রতি ভারত গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। কংগ্রেসের মতে দেশীয় শিল্প প্রভৃতির অবনতি, বহুবর্ষ ধরিয়া দেশের সম্পদ শোষণ, অতিরিক্ত ট্যাক্স এবং ভূমির অতিরিক্ত খাজনা এই দারিদ্র্যের কারণ। ইহাতে দেশ এত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে যে, সামান্য অভাব উপস্থিত হইলেই বহুলোককে সাহায্যের জন্য সরকারের দারস্থ হইতে হয়। কংগ্রেস এই অবস্থার প্রতীকারের জন্য নিম্নে কতকগুলি সুপারিশ করিতেছে,—

(১) সরকারী সাহায্য দিয়া দেশীয় শিল্প প্রভৃতির উন্নতি সাধন, পুনরুজ্জীবন ও নূতন শিল্প প্রবর্ত্তনে উৎসাহিত করা হউক।

(২) দেশের প্রধান প্রধান স্থলে গবর্ণমেণ্ট শিল্প-বিদ্যালয় ও শিল্প-কলেজ প্রতিষ্ঠা করুন।

(৩) ভারত সচিবের ১৮৬২ ও ১৮৬৭ সালের ডেসপ্যাচে যে সমস্ত সর্ত্তের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা যেখানে প্রতিপালিত হইয়াছে, সেখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলন করা হউক। যেখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তন করা গবর্ণমেণ্ট এখনও যুক্তিসঙ্গত মনে করেন না, সেখানে যাহাতে কর হ্রাস হয়, অথবা অতিরিক্ত কর ধার্য্য না হয়, তাহার ব্যবস্থা অবলম্বিত হউক।

(৪) উচ্চপদে দেশের অধিবাসীদের আরও অধিক সংখ্যায় নিযুক্ত করিয়া অন্ততঃ আংশিকভাবেও দেশের শোষণের কাজ বন্ধ করা হউক।

(৫) পল্লী অঞ্চলে ঋণদানের ব্যবস্থার জন্য এবং অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল অবস্থায় কৃষকেরা যাহাতে অল্প সুদে ও সুবিধাজনক সর্ত্তে ঋণ পাইতে পারে তাহার জন্য কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হউক।

৪র্থ প্রস্তাব :—আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত :—

ভারতের কতকগুলি গ্রামের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে ব্যাপক তদন্তের জন্য বিলাতের 'ফেমিন ইউনিয়ন' যে চেষ্টা করিতেছেন, তজ্জন্য এই কংগ্রেস সন্তোষ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। এই কংগ্রেসের মতে এই তদন্তের ফলে ভারতীয় রায়তের অবস্থা উপলব্ধি করার খুব সুবিধা হইবে। বর্ত্তমানে এই বিষয় যে সমস্ত ভুল ধারণা প্রচলিত থাকিয়া উহার সত্যকার প্রতীকারে বাধা জন্মাইতেছে সেই সমস্ত ভ্রান্ত ধারণাও দূর হইবে। সম্প্রতি যে দুইটি ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হইয়া গিয়াছে, তাহার পর এই তদন্তের বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া কংগ্রেস মনে করে, কারণ তাহাতে গবর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থার তুলনার জন্য অনেক তথ্য পাইবেন। কংগ্রেস মনে করে যে, ভারত সচিব এই বিষয় সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা পূর্ণ বিবেচনা করিবেন।

কংগ্রেস বিনীতভাবে এই দাবী জানাইতেছেন যে, এই সম্পর্কে পূর্ব্বে যে সরকারী তদন্ত হইয়াছে বিশেষ করিয়া লর্ড ডাফরিনের আমলে যে তদন্ত হইয়াছে, ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহার বিবরণ প্রকাশ করুন।

৫ম প্রস্তাব ঃ—এই কংগ্রেস দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়গণের গুরুতর অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি ·পুনরায় আকর্ষণ করিতেছে। বৃটীশ উপনিবেশ সমূহের সাম্রাজ্যতন্ত্রী মনোভাবের দরুণ ভারতীয় বিরোধী আইন কমিতেছে না, অধিকন্তু সম্রাটের রাজভক্ত ভারতীয় প্রজাগণের উপর অধিকতর অসুবিধা ও বাধার চেষ্টা চালান হইবে বলিয়া ভয় প্রদর্শিত হইতেছে। এই প্রবাসী ভারতীয়গণের রাজভক্তির কথা বিবেচনা করিয়া, গতযুদ্ধে তাহারা যে সহায়তা করিয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া এবং অত্যন্ত সঙ্কটকালে ভারত বৃটীশ সাম্রাজ্যের যে সাহায্য করিয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া কংগ্রেস এই প্রার্থনা জানাইতেছে যে, দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়গণের প্রতি যাহাতে ন্যায়সঙ্গত, পক্ষপাতশূন্য ও উদার ব্যবহার করা হয় তজ্জন্য গবর্ণমেণ্ট যথা প্রয়োজন ব্যবস্থা অবলম্বন করুন।

সম্প্রতি এই ব্যাপার সম্পর্কে ভারত সচিবের সহিত যে প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি এই নিশ্চয়তা দিয়াছেন যে বুয়ার গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যে সমস্ত স্থান কিছুদিন পূর্ব্বে জয় করা হইয়াছে, সেই সব স্থানে ভারতীয়দের উপর বর্ত্তমানে যে বাধা নিষেধ আছে তাহার কড়াকড়ি কমাইয়া দেওয়ার জন্য সত্বর ব্যবস্থা করার কথা তিনি বিবেচনা করিতেছেন।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব ঃ—১৮৯৩ সালে মুদ্রা সম্বন্ধীয় আইনে টাকার মূল্য কৃত্রিমভাবে শতকরা ৩০ ভাগ বেশী করা হইয়াছে। তাহাতে সকল রকমের ট্যাক্সই পরোক্ষভাবে ঐ পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের তহবিলে প্রতি বৎসর বাড়তি থাকিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু দেশের কৃষক ও অন্যান্য উৎপাদকদের স্বার্থের সমূহ ক্ষতি হইতেছে। অতএব কংগ্রেস ঐ আইনের বিরুদ্ধে পুনরায় তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছে।

৭ম প্রস্তাব ঃ—এই বৎসর বৃটিশ সৈন্যগণের বেতন বার্ষিক ৭৮৬,০০০ পাউণ্ড বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। ইহাতে ভারতীয় রাজস্বের

উপর নূতন এক স্থায়ী বোঝা চাপিয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে এই কংগ্রেস প্রতিবাদ জানাইতেছে। ভারত সচিব সম্প্রতি এক ঘোষণায় অনতি-ভবিষ্যতে ভারতে বৃটিশ সৈন্যসংখ্যা বাড়ানোর সম্ভবনা আছে বলিয়া যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাতে কংগ্রেস বিশেষ আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছে। গত তিন বৎসরে বহু বৃটিশ সৈন্য চীনে ও দক্ষিণ আফ্রিকায় লইয়া যাওয়া হয়। তাহাতেও দেশে সম্পূর্ণ শান্তি ছিল। ক্রমেই এরূপ অবস্থায় বৃটিশ সৈন্যের সংখ্যা বাড়াইলে ভারতীয় ট্যাক্স দাতাদের উপর অত্যন্ত অবিচার করা হইবে। কংগ্রেস আশা করে যে, ঐ প্রস্তাব পরিহার করা হইবে অথবা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট উহাদের খরচ বহন করিবে। কারণ ন্যায়ের দিক দিয়া দেখিলে কেবল যে সমস্ত অতিরিক্ত বৃটিশ সৈন্য নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে তাহাদের নহে, বর্ত্তমান যে সকল বৃটিশ সৈন্যদল আছে তাহাদের ব্যয়েরও একটা অংশ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বহন করা উচিত।

৮ম প্রস্তাব ঃ—বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্টে দ্বিতীয় গ্রেড কলেজ ও আইন ক্লাস ভাঙ্গিয়া দিবার যে প্রস্তাব আছে তৎসম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট—স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহের নিকট সম্প্রতি এক সারকুলার প্রেরণ করিয়াছেন। কংগ্রেস ঐ সারকুলারের জন্য গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছে। কারণ জনসাধারণ মনে করিয়াছিল যে, কমিশনের সুপারিশ কার্য্যে পরিণত করিতে গভর্ণমেণ্ট জনমতের প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দিবেন না। এই সারকুলারে ঐ আশঙ্কা অনেকটা দূর হইয়াছে। কমিশন যে সব সুপারিশ করিয়াছেন তাহার অনেকগুলি সম্বন্ধেই কংগ্রেস বিশেষ আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছে। কারণ এই সুপারিশ গ্রহণ করিলে উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট গত অর্দ্ধ শতাব্দী কাল যে নীতি অবলম্বন করিয়া কাজ করিতেছেন, তাহার উলট পালট হইয়া যাইবে; কারণ ঐ সুপারিশে উচ্চশিক্ষার প্রচার ও তাহার কার্য্যক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিবে এবং বর্ত্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে যে সামান্য স্বাধীনতা আছে তাহাও প্রকৃতপক্ষে নষ্ট করা হইবে।

এই কংগ্রেস কমিশনের নিম্নলিখিত সুপারিশগুলিতে তীব্র আপত্তি প্রকাশ করিতেছে :—

(ক) বর্ত্তমানে যে সব দ্বিতীয় গ্রেড কলেজ আছে তন্মধ্যে যেগুলি প্রথম গ্রেডের কলেজে পরিণত করা সম্ভবপর নহে সেগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া এবং নূতন দ্বিতীয় গ্রেডের কলেজের অনুমোদন না দেওয়া।

(খ) বিভিন্ন কলেজের ছাত্রদের বেতনের হার সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হওয়া।

(গ) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এপর্য্যন্ত যে সকল কার্য্য-পন্থা অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া সমস্ত দেশের জন্য একরূপ বাঁধাধরা পঠনীয় বিষয় প্রবর্ত্তন করা।

(ঘ) প্রত্যেক প্রদেশে বা প্রেসিডেন্সীতে একটি মাত্র কেন্দ্রীয় আইন কলেজ স্থাপন করিয়া কেবলমাত্র সেইখানেই আইন পড়ার ব্যবস্থা করা।

(ঙ) বে-সরকারী স্কুলগুলিকে অনুমোদনের জন্য ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইনষ্ট্রাকশনের উপর নির্ভর করার ব্যবস্থা করিয়া সর্ব্বপ্রকার সেকেণ্ডারী শিক্ষাকে কার্য্যতঃ অনুমতি সাপেক্ষ করিয়া রাখা।

(চ) সিনেট ও সিণ্ডিকেটকে সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রকৃতপক্ষে গবর্ণমেণ্টের একটি বিভাগে পরিণত করা।

৯ম প্রস্তাব :—এই কংগ্রেস মনে করে যে, মিঃ টাটার ব্যক্তিগত দানে ইনষ্টিটিউট অব রিসার্চ্চ প্রতিষ্ঠার যে প্রস্তাব হইয়াছে তাহাতে গবর্ণমেণ্টের প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করা উচিত। কংগ্রেসের মতে দেশের নানাস্থানে অনুরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা উচিত।

১০ম প্রস্তাব :—পুলিশ কমিশনে পুলিশের কার্য্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ভারতীয় প্রতিনিধির সংখ্যা খুব কম থাকাতে এই কংগ্রেস দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবে এবং প্রেসিডেণ্টের প্রারম্ভিক বক্তৃতায় কমিশনের আলোচ্য বিষয় অত্যন্ত সীমবদ্ধ হইবে

বলিয়া যে ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেও এই কংগ্রেস অসন্তুষ্টি জ্ঞাপন করিতেছে।

কংগ্রেস দৃঢ়ভাবে এই অভিমত জ্ঞাপন করিতেছে যে, অন্যান্য সংস্কারের মধ্যে নিম্নলিখিত সংস্কারগুলিও সাধিত না হইলে পুলিশের যোগ্যতা বাড়িবে না ঃ—

(১) পুলিশ সার্ভিসের উচ্চপদে যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তির নিয়োগ।

(২) পুলিশ সার্ভিসের উচ্চপদগুলিতে বহু সংখ্যক শিক্ষিত ভারত-বাসীর নিয়োগ।

(৩) তদন্তকারী ও পরিদর্শনকারি কর্ম্মচারীদের পদমর্য্যাদা ও ভবিষ্যত উন্নতির ব্যবস্থা করিয়া শিক্ষিত লোকেরা যাহাতে পুলিশের চাকরির দিকে আকৃষ্ট হয়, তদনুযায়ী উপায় অবলম্বন করা।

(৪) যে জেলা কর্ম্মচারী, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশের ভার প্রাপ্ত প্রধান কর্ম্মচারী, তাঁহাকে বিচার ক্ষমতা ও ম্যাজিষ্ট্রেটের দায়িত্ব হইতে মুক্তি দেওয়া।

১১শ প্রস্তাব ঃ—এই কংগ্রেস পূর্ব্ববর্ত্তী কংগ্রেস সমূহের সহিত একমত হইয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট ও ভারত সচিবের নিকট এই আবেদন জানাইতেছে যে, ফৌজদারী কার্য্য সম্পর্কে তাঁহারা বিচার ও শাসন কার্য্যকে সত্বর পৃথক করিবার জন্য ব্যবস্থা করুন। বিচার ও শাসন বিভাগ যে পৃথক হওয়া বাঞ্ছনীয় তাহা গবর্ণমেণ্টও স্বীকার করিয়াছেন। এই সম্পর্কে কংগ্রেস ইহা লক্ষ্য করিয়া দুঃখিত হইয়াছে যে, সম্প্রতি আইনের ঝোঁক শাসন বিভাগের উপর বিচার বিভাগের যে কর্ত্তৃত্ব থাকা কল্যাণকর সেই কর্ত্তৃত্ব হইতে বিচার বিভাগকে কেবল বঞ্চিত করাই নহে, অধিকন্তু শাসন বিভাগের হাতে অধিকতর ও নির্ব্বোধ অধিকার প্রদান করা।

১২শ প্রস্তাব ঃ—সিভিলিয়ন জজ।

বর্ত্তমান ব্যবস্থা অনুসারে জেলা জজ, জয়েণ্ট জজ ও সহকারী জজের পদের অনেকগুলি সিভিলিয়ানদের দ্বারা পূরণ করা হইতেছে। ইহার

জন্য তাঁহাদিগকে আইন সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে না। দায়িত্বপূর্ণ বিচার কার্য্যের ভার বহন করিবার মত আইন জ্ঞান তাঁহাদের আছে কি না তৎসম্বন্ধে প্রমাণ না লইয়াই তাঁহাদিগকে ঐ পদগুলিতে নিয়োগ করা হইতেছে। কংগ্রেসের মতে ইহা দ্বারা মফঃস্বলের বিচার কার্য্যের অত্যন্ত ক্ষতি হইবে। উক্ত পদসমূহে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যবহারজীবিদিগকে নিযুক্ত করিয়া বিচার কার্য্যের আদর্শ উন্নীত করা উচিত।

১৩শ প্রস্তাব :—বর্ত্তমানে লবণের উপর যে উচ্চ শুল্ক ধার্য্য আছে তাহার বিরুদ্ধে এই কংগ্রেস তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছে, ভারতীয়েরা প্রয়োজনাপেক্ষা কম লবণ খাইতেছে বলিয়া কতকগুলি রোগ বিস্তার করিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। তদ্ব্যতীত ভারত গবর্ণমেণ্টের তহবিলে প্রতি বৎসরই বহু পরিমাণে বাড়তি থাকিয়া যাইতেছে। কাজেই কংগ্রেস দাবী করিতেছে যে, গবর্ণমেণ্ট ১৮৮৮ সালে যে পরিমাণ শুল্ক বৃদ্ধি করিয়াছেন অন্ততঃ তাহাই কমাইয়া দিউন।

১৪শ প্রস্তাব :—পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের পরিশ্রম এই দেশের জনগণের পক্ষে কোন কাজে আসে নাই। সেজন্য এই কংগ্রেস দুঃখ প্রকাশ করিতেছে, যে কমন্স সভার ১৮৯৬ সালের ২রা জুনের প্রস্তাবে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের জন্য ইংলণ্ডে ভারতে যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার অনুকূলে মত প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা কার্য্যে পরিণত না করিলে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে না।

১৫শ প্রস্তাব :—বর্ত্তমানে রেলওয়ের উচ্চপদ সমূহে ভারতবাসী-দিগকে নিয়োগ না করিয়া ইয়োরোপীয়দিগকে নিযুক্ত করা হইতেছে। ইহাতে ব্যয় অত্যন্ত বেশী হইতেছে। কংগ্রেস আশা করে যে, গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ের উচ্চপদ সমূহে যোগ্যতাসম্পন্ন ভারতবাসীদিগকে নিয়োগ করিয়া রেলওয়ে বিভাগের খরচ কমাইবার ও ভারতীয়দের অভিযোগ দূর করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

১৬শ প্রস্তাব ঃ—কলে প্রস্তুত কাপড়ের বর্ত্তমানে যে শতকরা ৩৷৷৹ টাকা শুল্ক ধার্য্য আছে তাহা উঠাইয়া দিবার জন্য কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছে।

১৭শ প্রস্তাব ঃ—কংগ্রেসের মতে একটি মিলিটারী মেডিক্যাল সার্ভিসের ব্যবস্থা থাকিবে। তাহার একটি শাখা থাকিবে ইউরোপীয় সৈন্যদের জন্য, অপর শাখা দেশীয় সৈন্যগণের জন্য। দেশীয় সৈন্যদের শাখায় ভারতীয় কলেজের গ্রাজুয়েট নিযুক্ত করিলে কম খরচায় যোগ্যতা সম্পন্ন লোক পওয়া যাইবে।

একটি স্বতন্ত্র সিভিল মেডিক্যাল সার্ভিস পুনর্গঠন সম্বন্ধেও এই কংগ্রেস মত প্রকাশ করিতেছে। সিভিল মেডিক্যাল সর্ভিসের সহিত বর্ত্তমানে যে সামরিক সংশ্রব আছে, তাহা হইতে উহাকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য এই কংগ্রেস দাবী জানাইতেছে।

১৮শ প্রস্তাব ঃ—পূর্ব্ব পূর্ব্ব কংগ্রেসে প্রিভি কাউন্সিলের জুডিশিয়ল কমিটি, ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গী কর্ম্মচারীদের বিনিময় হারের ক্ষতিপূরণমূলক বৃত্তি প্রদান, অস্ত্র আইন, ভলাণ্টিয়ারীর প্রথা, পাঞ্জাবে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা, এডুকেশন সার্ভিসের পরিকল্পনা, কুপারস্ হিল কলেজ সম্বন্ধে ভারত সচিবের কার্য্য, জুরীর বিচার, ফৌজদারী কার্য্যবিধি সংশোধন ও বন বিভাগের নিয়ম কানুন প্রভৃতি সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে, এই কংগ্রেস তাহাদিগের সহিত একমত হইয়া তাহার সমর্থন করিতেছে।

১৯শ প্রস্তাব ঃ—কংগ্রেস এই অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে, কংগ্রেসের কাজের সাহায্যের জন্য লণ্ডনেও একটি কমিটি থাকা আবশ্যক। ঐ কমিটি কংগ্রেসের সহিত একযোগে কাজ করিবে এবং মত প্রচারের জন্য একটি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিবে। কংগ্রেস প্রস্তাব করিতেছে যে, বর্ত্তমানে যেভাবে গঠিত বৃটিশ কমিটী আছে এবং 'ইণ্ডিয়া' নামক যে সংবাদপত্র আছে তাহা চালান হউক। এজন্য নিম্ন পরিকল্পনা অনুসারে অর্থসংগ্রহ করিতে হইবে।

ইণ্ডিয়ার বার্ষিক মূল্য ৮৲ টাকা হইবে। বঙ্গদেশে ১৫০০, মান্দ্রাজ ৭০০, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ২০০, অযোধ্যা ৫০, পাঞ্জাব ১০০, বেরার ও মধ্যপ্রদেশ ৪৫০, ও বোম্বাইতে ১০০০, মোট ৪০,০০০, সংখ্যা উক্ত সংবাদ পত্র চালাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিম্নোক্ত সার্কেলগুলির সেক্রেটারি নিযুক্ত হইবেন। তাঁহাদের সার্কেলে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক উক্ত সংবাদপত্রের মূল্যের তাঁহারা দায়ী। দুই অর্দ্ধ বার্ষিক কিস্তিতে চাঁদার টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। সেক্রেটারীগণের নাম ঃ—

বঙ্গদেশে—শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুত বৈকুণ্ঠ নাথ সেন।

বোম্বাই ঃ—মিঃ পি, এম, মেহেতা, মিঃ ডি, ই, ওয়াচা, মিঃ জি, কে, গোখেল।

মান্দ্রাজ—শ্রীযুত শ্রীনিবাস রাও, শ্রীযুত বিজয় রাঘব আচারিয়া, মিঃ ভি রিরুনাম্বিয়ার, শ্রীযুত জি সুব্রহ্মণ্য আয়ার।

বেরার ও মধ্যদেশ—মিঃ এন, আর, মুধলকার।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা—মিঃ এম, এম, মালব্য, মিঃ গঙ্গা প্রসাদ বর্ম্মা, মিঃ এস সিংহ, মিঃ এ নন্দী।

কানপুর—মিঃ পৃথ্বীনাথ পণ্ডিত।

পাঞ্জাব—লালা হরকিষণ লাল।

২০শ প্রস্তাব ঃ—"ইণ্ডিয়া" ও বৃটিশ কমিটির বাদবাকী খরচ নির্ব্বাহের জন্য প্রতিনিধিগণের নিকট হইতে ১৯০২ সাল হইতে ১০৲ টাকা করিয়া বিশেষ ফী লওয়া হইবে। বর্ত্তমানে তাঁহারা যে ফী দেন তাহাও তাঁহাদিগকে দিতে হইবে।

২১শ প্রস্তাব ঃ—বর্ত্তমান বৎসরে বৃটিশ কংগ্রেস কমিটির স্যার ডব্লিউ ওয়েডারবার্ণ ও অন্যান্য সভ্যগণ ভারতবর্ষের যে সেবা করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে এই কংগ্রেস ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

২২শ প্রস্তাব :—আগামী বর্ষের জন্য এই কংগ্রেস মিঃ এ. ও. হিউম, সি, বি কে জেনারেল সেক্রেটারী ও মিঃ ডি, ই, ওয়াচাকে জয়েণ্ট সেক্রেটারীর পদে পুনর্নিয়োগ করিলেন।

২৩শ প্রস্তাব :—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ঊনবিংশতিতম অধিবেশন ১৯০৩ সালে বড়দিনের পর মান্দ্রাজে হইবে।

সভাপতিরূপে সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অষ্টাদশ অধিবেশনের মূল সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ হইয়াছিলেন। ইহার বিবরণ ১ম খণ্ডে দেওয়া হইয়াছে। এই সভায় তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহার সারাংশ এই স্থলে উদ্ধৃত করা হইল।

সুরেন্দ্রনাথ বলেন,—

"সাম্রাজ্যবাদে বিশ্বাস আমাদের পথের বিঘ্ন সরূপ; কিন্তু বর্ত্তমানে সাম্রাজ্যবাদই সকলের মূলতন্ত্র হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের অর্থ—স্বৈরাচার, একচ্ছত্র সম্রাট বা বিজয়ী সেনাপতির স্বেচ্ছাতন্ত্র শাসন। পুরাতন রোম নগরীতে এবং বর্ত্তমানে ফ্রান্সে সাম্রাজ্যবাদের অর্থ গণ-তন্ত্রের কণ্ঠরোধ করিয়া স্বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। তবে বৃটীশের সাম্রাজ্যবাদের অর্থ গ্রেট বৃটেন ও উপনিবেশ সমূহের জন্য গণতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশের জন্য স্বৈরতন্ত্র। এই সাম্রাজ্যবাদের ভবিষ্যৎ পরিণতি কোথায় কেহই বলিতে পারে না। কালক্রমে গণতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধিত হইবে কিনা তাহাও বলা কঠিন। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে, যেখানেই সাম্রাজ্য প্রসারিত করা হইয়াছে, সেখানেই গণতন্ত্রের বিনাশ হইয়াছে। বৃটীশ সাম্রাজ্যের অর্থ বৃটিশ সম্রাটের ভাষাভাষী প্রজাগণের সঙ্ঘ। এই সঙ্ঘে আমাদের স্থান নাই। এই পবিত্র হইতে পবিত্রতর মন্দির দ্বারে দাঁড়াইবার অধিকারও আমাদের নাই। আমাদের একমাত্র কাজ তাহাদের সেবা করা এবং দূরে দাঁড়াইয়া দেখা। সাম্রাজ্যের অংশীদাররূপে আমরা দক্ষিণ আফ্রিকায় সৈন্য পাঠাইয়া নেটাল রক্ষা করিলাম। সাম্রাজ্যের অংশীদাররূপে আমরা চীনে সৈন্য পাঠাইয়া পিকিনের প্রাচীর

শীর্ষে বৃটীশের বিজয় কেতন স্থাপন করিলাম; কিন্তু তাহাতে কি হয়? আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের কেহ নহি। বৃটিশ সাম্রাজ্যের কোন সুখ-সুবিধার উপর আমাদের কোন অধিকার নাই। আমরা নিজবাসভূমে পরবাসী, বৃটিশ উপনিবেশে দাস অপেক্ষাও অধম। নেটালের প্রবাসী ভারতীয়গণ বিগত যুদ্ধের সময় অকৃত্রিম প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। এখন তাহাদের প্রতি এমন দুর্ব্ব্যবহার করা হইতেছে যে, তাহা অতিশয় অপমানজনক। যাহারা এইরূপ আচরণ করিতেছে, তাহাদের পক্ষেও ইহা নিন্দাজনক।”

ঊনবিংশ অধিবেশন—মান্দ্রাজ ১৯০৩

১ম প্রস্তাব ঃ—কংগ্রেস তথা ভারতবাসীর হিতকামী লর্ড ষ্ট্যানলী, মিঃ ডবলিউ এস, কেইন এবং রামনাদের রাজার লোকান্তরে শোক প্রকাশ।

২য় প্রস্তাব ঃ—(ক) পূর্ব্ববর্ত্তী কংগ্রেস সমূহের সহিত একমত হইয়া, এই অভিমত প্রকাশ করিতেছেন যে, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সকল পরিশ্রম পণ্ড হইয়াছে। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত দেশবাসীর মঙ্গলজনক নহে। কেননা, তাঁহারা দেশবাসীর দাবীর পূর্ণ বিচার করেন নাই। লবণ বিভাগ, আফিং বিভাগ, চিকিৎসা বিভাগ ও পুলিস বিভাগ, সার্ভে বিভাগ, টেলিগ্রাফ বিভাগ, সরকারী টাঁকশাল, ডাকবিভাগ এবং পররাষ্ট্র বিভাগ প্রভৃতিতে যে সকল উচ্চ পদের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে ভারতবাসী নিয়োগের নীতি সম্প্রসারিত হয় নাই।

(খ) পাব্লিক ও রেলওয়ে সার্ভিসে ভারতীয় নিয়োগের যে নীতি বিভাগীয় ও রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা গবর্ণমেণ্টের চুক্তির ও নির্দ্দেশের বিরোধী।

(গ) গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান কর্ম্মচারী নিয়োগ ব্যবস্থায় দেশের যে অর্থ শোষিত হইতেছে তাহার প্রতিকারকল্পে এবং শাসনকার্য্যের অপব্যয় নিবারণকল্পে মিতব্যয়িতা সংরক্ষণের জন্ম পাবলিক সার্ভিসে ভারতীয়-

দিগকে শিক্ষা দিয়া, তাহাদিগকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠার দাবী এই কংগ্রেস দৃঢ়ভাবে করিতেছেন।

৩য় প্রস্তাব ঃ—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

ভূমিরাজস্ব বিধির পুনঃ পুনঃ সংশোধনে রাজস্ব পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধির এই নীতির ফলে দেশের কৃষি প্রজার দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইতেছে; ফলে তাহাদের অজন্মা এবং তাহাদের দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের শক্তি কমিয়া আসিতেছে। সুতরাং কংগ্রেস অনুরোধ করেন যে, ১৮৬২ ও ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের প্রেরিত ষ্টেট সেক্রেটারীর 'ডেসপ্যাচ' মূলে যে সকল প্রদেশ বা পল্লী চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধিকার পাইবার উপযুক্ত সে সকল স্থানে ঐ বিধি সম্প্রসারিত হউক। কংগ্রেসের মতে আরও বেশী দিনের জন্য সে ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত হউক, অযথা কর বৃদ্ধি না হয়, তজ্জন্য আইন প্রবর্ত্তিত হউক এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট যে সকল স্থানে ঐ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদান করা আবশ্যক মনে করেন, সে সকল স্থানে সে ব্যবস্থা হউক।

৪র্থ প্রস্তাব ঃ—দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য বৃটিশ উপনিবেশে ভারতবাসীর বিবিধ বিষয়ে অনধিকার ও নিগ্রহের বিষয় অবগত হইয়া কংগ্রেস বিশেষ বিচলিত হইয়াছেন। তাহাদের বিবিধ অনধিকারের ফলে ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণের মর্য্যাদা ও অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়ায় কংগ্রেস ঔপনিবেশিক শাসন পরিষদের নীতির নিন্দাবাদ করিতেছেন। উপনিবেশসমূহের অগ্রগমনে উন্নতিতে ভারতবাসীর কৃতিত্বের বিষয় স্মরণ করিয়া এবং উপনিবেশে ভারতবাসীর উপস্থিতিতে উপনিবেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক এবং অন্যান্য বিবিধ বিষয়ক উন্নতির জন্য এই কংগ্রেস প্রার্থনা জানাইতেছেন যে, বৃটিশ রাজের অন্যান্য প্রজার সহিত ঔপনিবেশিকগণকে সমরূপ পৌরজনাধিকার প্রদান করা হউক এবং সেজন্য যেরূপ বিধান প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন, তাহা প্রবর্ত্তিত করা হউক। ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণের পূর্ণ অধিকার আইন বলে বা অন্য প্রকারে সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে, কংগ্রেস স্পষ্টই জানাইয়া দিতেছেন যে,

ভবিষ্যতে উপনিবেশসমূহে স্থায়ী ভারতীয় ঔপনিবেশিক পাওয়া সুকঠিন হইবে।

৫ম প্রস্তাব ঃ—শিক্ষা সংস্কারমূলক গবর্ণমেণ্টের সুচিন্তিত নীতির প্রশংসা করিয়া এই কংগ্রেস এই অভিমত প্রকাশ করিতেছেন যে, ইউনিভারসিটি কমিশনের সুপারিশ ও পরামর্শক্রমে ইউনিভারসিটি বিল আইনে পরিণত হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ এবং শিক্ষার গণ্ডী সীমাবদ্ধ হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ও গবর্ণমেণ্টের একটি স্বতন্ত্র বিভাগে পরিণত হইবে। কংগ্রেসের মতে উক্ত বিলের বিধানসমূহের দ্বারা উচ্চশিক্ষার বর্ত্তমান নীতির ন্যূনতা দূর হইবে না। উচ্চশিক্ষার প্রসার বৃদ্ধির জন্য অর্থ সরবরাহের এবং বিশেষজ্ঞ বহুদর্শী শিক্ষকের দ্বারা শিক্ষা ধারার ও আদর্শের উৎকর্ষ সাধন প্রয়োজন।

কংগ্রেস তাই নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তনের ও রূপান্তরের দাবী করিতেছেন,—

(ক) প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় স্বতন্ত্র আইনে নিয়ন্ত্রিত হইবে। (খ) পূর্ব্বেকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ফেলোর সংখ্যা ২০০ শতের কম হইবে না এবং তাহাদের অন্ততঃ ৮০ জন রেজিষ্টার্ড গ্রাজুয়েট কর্ত্তৃক এবং ২০ জন ফ্যাকাল্টি মেম্বর কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন। এলাহাবাদ ও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধেও ঐরূপ নিয়ম থাকিবে।

(গ) সাধারণ (অর্ডিনারী) ফেলোর কার্য্যকাল আজীবন পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট কাল অনুপস্থিত থাকার জন্য পদচ্যুত হইবেন।

(ঘ) সিণ্ডিকেটে কলেজের অধ্যাপকগণের যে শাসনতান্ত্রিক অনুপাতের ব্যবস্থা আছে তাহা পরিত্যক্ত হইবে।

(ঙ) যে সকল গ্রাজুয়েট দশ বৎসরকাল উপাধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ভোটাধিকার পাইবেন।

(চ) ছাত্র ও শিক্ষকের বাধ্যতামূলক উপযুক্ত বাসগৃহ প্রভৃতি সম্বন্ধে কলেজের বাধ্যবাধকতামূলক যে বিধান উক্ত বিলে নিবদ্ধ আছে তাহা পরিত্যক্ত হইবে।

(ছ) বর্ত্তমানে কোনও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা স্বীকার বা অস্বীকার করিবার অধিকার পূর্ব্বোক্ত বিলে গবর্ণমেণ্টকে দেওয়া হইয়াছে। কংগ্রেসের মতে সে অধিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের থাকিবে। গবর্ণমেণ্ট তাহা নিয়ন্ত্রণ করিবেন।

(জ) কলেজ পরিদর্শন সম্পর্কে কংগ্রেসের মত এই যে, সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক বিশেষভাবে নিযুক্ত ব্যক্তি—যিনি গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের বা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্ত কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন, তিনিই কলেজ সমূহ পরিদর্শন করিবেন।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব :—সুপ্রীম লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে (ভারতীয় আইন সভায়) যে 'অফিসিয়্যাল সিক্রেটস্' বিল পেশ হইয়াছে কংগ্রেস কোন-ক্রমেই সে বিল অনুমোদন করেন না। কেননা, উক্ত বিল অযাচিত, সাধারণের স্বার্থের বিরোধী, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পক্ষে বিপজ্জনক, সুনীতির হীনতা সাধনকারী। কংগ্রেসের তাই প্রার্থনা কেবলমাত্র নৌ-বিভাগে এবং সমর বিভাগের গণ্ডীর মধ্যেই যেন ঐ আইন আবদ্ধ থাকে।

৭ম প্রস্তাব :—(ক) এই কংগ্রেস পূর্ব্বোক্ত অভিমতের পুনরাবৃত্তি করিয়া কহিতেছেন যে, ভারতের নিরাপত্তার জন্য সৈন্যদল, রণসজ্জা, সাজসরঞ্জাম বৃদ্ধির যে উপায় গভর্ণমেণ্ট সময় সময় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা ভারতে বৃটিশ আধিপত্য দৃঢ়তামূলক এবং তজ্জন্য ভারতের বহুলক্ষ অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের এই নীতি তাই শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধক বলিয়া কংগ্রেস মনে করেন না। পরন্তু এই ব্যয় ভারতের আর্থিক সামর্থ্যের অতীত। ভারতের সৈনিক বিভাগ কেবল মাত্র দেশীয় সৈন্যে সংগঠিত নহে; বৃটিশ সৈন্যের সংখ্যাই তাহাতে অধিক। সমগ্র বৃটিশ সৈন্যের এক তৃতীয়াংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত। উপনিবেশসমূহ সমভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীন। কিন্তু তাহাদিগকে রাজকীয় সৈনিক বিভাগের ব্যয়ের কিছুই দিতে হয় না। এমতাবস্থায় ঐ সকল সৈনিকের ব্যয় ভারতের সম্বন্ধে চাপাইয়া দেওয়া অবৈধ ও অসঙ্গত।

(খ) বৃটিশ সৈন্যের অধিকাংশ সম্পূর্ণ নিরাপদ অবস্থায় দেশের শান্তিকে বিপজ্জনক না করিয়া ভারতের বাহিরে প্রেরিত হইয়াছে। কংগ্রেসের তাই অভিমত—ভারতীয় করদাতাদিগকে বৃটিশের ধনাগার হইতে বৃটিশ সৈন্য সংরক্ষণের ব্যয় বিষয়ে কিছু সাহায্য প্রদান করা হউক।

(গ) বৃটিশ সৈন্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ভারতের কোষাগার হইতে প্রতি বৎসর যে ৭৮৬৩০০ পাউণ্ড লইবার ব্যবস্থা হইয়াছে কংগ্রেস তাহার ঘোর প্রতিবাদ করিতেছেন। ভারতের স্বার্থের এবং দেশের আবশ্যকীয় সংস্কার সাধনের অন্তরায় সাধক বলিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং কাউন্সিল প্রতিবাদ করিলেও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহা শুনেন নাই। কংগ্রেস ভারতের অহিতকর এই নীতির প্রতিবাদ করিতেছেন।

(ঘ) কংগ্রেসের ধারণা উভয় সৈন্যের সমষ্টি করণে এবং সংমিশ্রনের চেষ্টায় ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের বিধান মতে, ভারতের স্কন্ধে পুনঃ পুনঃ অবৈধ ও অত্যধিক ভার চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে। কংগ্রেসের মতে এখন এই নীতির বিলোপ সাধন একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

৮ম প্রস্তাব ঃ—লবণ-শুল্ক-হ্রাস করিয়া এবং আয়কর বৃদ্ধি করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট দরিদ্র গৃহস্থের যে উপকার সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য কংগ্রেস ভারত গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন, কংগ্রেসের প্রার্থনা—লবণ শুল্ক যেন গবর্ণমেণ্ট আরও হ্রাস করেন।

৯ম প্রস্তাব ঃ—বহুকাল হইতে রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক শাসন-নৈতিক বিষয়ে ঘনিষ্টরূপে সম্বন্ধযুক্ত জনপদসমূহকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে নীতির অনুসরণ করিয়াছেন, কংগ্রেস তাহাতে বিচলিত হইয়াছেন। ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ছোটনাগপুরের কিয়দংশ বঙ্গদেশ হইতে এবং গঞ্জাম জেলা ও গঞ্জাম ও ভিজাগাপট্টমের সরকারী এজেণ্ট শাসিত ভূভাগ মাদ্রাজ হইতে বিচ্যুতিকরণের প্রতিবাদ করিতেছেন।

১০ম প্রস্তাব :—কংগ্রেসের মতে মাদ্রাজ মিউনিসিপ্যাল বিল, (যাহা মাদ্রাজের ব্যবস্থাপক সভায় আলোচিত হইতেছে) লর্ড রিপণের অনুমোদিত স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠামূলক নীতির অনুকূল নহে। কংগ্রেসের মতে ২৪ জন সভ্যের অনধিক সংখ্যক প্রতিনিধি হইলে, নগরের করদাতা-দিগের স্বার্থ সম্পূর্ণ সংরক্ষিত হইবে না। আরও, যদি স্থানীয় সভাসমিতি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে নির্ব্বাচনের যোগ্যতা প্রদান করিতে হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে মিউনিসিপাল শাসন-সংরক্ষণ ব্যাপারে সেই সকল প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষভাবে কোন স্বার্থ আছে কিনা। সেই সকল প্রতি-ষ্ঠানের নির্ব্বাচন-যোগ্যতা সীমাবদ্ধ করিতে হইবে। মাদ্রাজ পোর্টট্রাষ্ট এবং মাদ্রাজ রেলওয়ের সেরূপ কোনও যোগ্যতা থাকিবে না। তবে মাদ্রাজের "চেম্বার অফ কমার্স" বণিক সভা, ট্রেডার্স এসোসিয়েশন এবং বিশ্ববিদ্যালয়, মাত্র একজন হিসাবে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার প্রাপ্ত হইবেন।

১১শ প্রস্তাব :—দাদাভাই নৌরজী উত্তর লাম্বেথ হইতে, মিঃ ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জ্জী ওয়ালামষ্টো হইতে, সার হেনরী কটন নটিংহাম হইতে এবং সার জন জার্ডিন রকসবার্গসায়ার হইতে পার্লামেণ্ট মহাসভার নির্ব্বাচন প্রার্থী হইয়াছিলেন। কংগ্রেস তাহা সমর্থন করিতেছেন এবং ঐ সকল স্থানের নির্ব্বাচক মণ্ডলীর ভোটদাতাদিগকে অনুরোধ জানাইতেছেন যে, তাহারা যেন ভারতের স্বার্থের দিক তাকাইয়া নির্ব্বাচন প্রার্থীদিগকে পার্লামেণ্টের সভ্য মনোনীত করেন। ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হইলেও, বৃটিশ পার্লামেণ্টে প্রত্যক্ষতঃ তাহাদের কোন প্রতিনিধি নাই। নির্ব্বাচনকামীদিগের নিয়োগে ভারতবাসীর স্বার্থ, কংগ্রেসের মতে, কিঞ্চিৎ সংরক্ষণ সম্ভবপর হইবে।

১২শ প্রস্তাব :—বড়লাটের আইন সভায় কো-অপারেটিভ ক্রেডিট বিল শেষ হওয়ায় কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দেন। কংগ্রেস আশা করেন, সত্বরই বিলটী আইনে পরিণত হইবে।

১৩শ প্রস্তাব :—এই কংগ্রেস পূর্ব্ববর্ত্তী কংগ্রেস সমূহের সহিত এক-

মত হইয়া ১৯০২ সালের "ক" হইতে "ঞ" পর্য্যন্ত বিধানসমূহ সমর্থন করিতেছেন।

(ট) শাসন ও বিচার বিভাগের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য সাধন কংগ্রেস অতি আবশ্যক মনে করেন। একই কর্ম্মচারীর ঐ দ্বৈত অধিকার থাকা কোন ক্রমেই উচিত নহে।

(ঠ) ভারতের সরকারী চাকুরীর অসামরিক বিভাগের পরীক্ষা এক-যোগে এবং একই সময়ে ভারত ও ইংলণ্ডে হইবে।

(ড) ইংলণ্ডের 'ফেমিন ইউনিয়নের' সভ্যগণ ষ্টেট সেক্রেটারীর নিকট ভারতীয় রায়তদিগের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুসন্ধান করিবার জন্য যে অনুরোধ করিয়াছেন, তদনুসারে শীঘ্র সে অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন।

১৪শ প্রস্তাব:—ভারতের রাজনৈতিক অগ্রগতি সম্প্রসারিত করিবার জন্য সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ এবং বৃটিশ কমিটির অন্যান্য সভ্যগণ যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট কংগ্রেস কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

বৃটিশ কমিটির ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ১০৫০০৲ টাকা বরাদ্দ করা হইল। কংগ্রেসের বিভিন্ন কেন্দ্র আপন আপন অংশ অনুসারে সেই টাকা প্রদান করিবেন।

বিভিন্ন কেন্দ্রে যাঁহারা সম্পাদক নিযুক্ত হইয়া অর্থ সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিলেন, সেই সকল কেন্দ্রের ও তাহার সম্পাদকগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল। দেয় টাকা দুইটী কিস্তীতে অগ্রিম দিতে হইবে।

বঙ্গদেশ

(১) বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় (২) বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন, (৩) অনারেবল মিঃ ভুপেন্দ্রনাথ বসু।

বোম্বাই

(১) অনারেবল মিঃ পি এম মেটা, (২) মিঃ ডি ই ওয়াচা (৩) অনারেবল মিঃ জি কে গোখেল।

মান্দ্রাজ

(১) অনারেবল মিঃ জি শ্রীনিবাস রাও, (২) অনারেবল মিঃ বাসুদেব আয়েঙ্গার, (৩) মিঃ ভি রায়রু নাম্বিয়ার, (৪) মিঃ জি রাঘব রাও।

বেরার ও মধ্য প্রদেশ ঃ—মিঃ আর এন মুধলকর। অযোধ্যা ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ।—(১) অনারেবল পণ্ডিত এম এম মালব্য, (২) মিঃ গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্মা (৩) মিঃ এস, সিংহ।

কানপুর। মিঃ পৃথ্বীনাথ পণ্ডিত।

পাঞ্জাব। লালা হরকিষণ লাল।

১৫শ প্রস্তাব ঃ—মিঃ এ ও হিউম, সি, বি জেনারেল সেক্রেটারী এবং মিঃ ডি ই ওয়াচা, জয়েণ্ট জেনারেল সেক্রেটারী এবং মিঃ জি কে গোখেল, এ্যাডিশেনাল জয়েণ্ট সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন।

১৬শ প্রস্তাব ঃ—আগামী অধিবেশন বড়দিনের সময় বোম্বাই সহরে হইবে।

বিংশ অধিবেশন বোম্বাই ১৯০৪

১ম প্রস্তাব ঃ—(ক) এই কংগ্রেস মত প্রকাশ করিতেছে যে, পাব্লিক সার্ভিসের উচ্চতর পদসমূহে ভারতীয় নিয়োগ সম্পর্কে ১৯০৪ সালের ২৫শে মে ভারত সরকার যে মূল নীতি ও কার্য্যবিধি অনুসরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহার সহিত ১৮৩৩ সালের পার্লামেণ্টের আইন ও ১৮৫৮ সালের পরলোকগতা মহারাণীর ঘোষণার সামঞ্জস্য নাই। সাম্রাজ্ঞী ও পার্লামেণ্ট এদেশের অধিবাসীদিগকে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন তাহা উড়াইয়া দিবার জন্য যে চেষ্টা হইতেছে এবং পাব্লিক কমিশন সমগ্র প্রশ্নটি সতর্কভাবে বিচার করিবার পর গবর্ণমেণ্ট যে সুচিন্তিত ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন তাহার পরিবর্ত্তে ভিন্ন পথে যাইবার যে চেষ্টা হইতেছে তাহার বিরুদ্ধে কংগ্রেস দৃঢ়তার সহিত প্রতিবাদ করিতেছে।

(খ) এই কংগ্রেসের অভিমত এই যে, বর্ত্তমান অর্থনীতিক ও শাসনগত যে সকল গলদ রহিয়াছে তাহার সত্যকার প্রতিকার হইতেছে

উচ্চতর পদসমূহে অধিকতর ভারতীয় নিয়োগ। এই কংগ্রেস পূর্ব্ববর্ত্তী কংগ্রেসের ন্যায়, ১৮৯৩ সালের ২রা জুন কমন্স সভায় প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষাসমূহ একই কালে ইংলণ্ডে ও ভারতে গ্রহণের যে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় তাহার সহিত একমত। এই কংগ্রেস তাহাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করিতেছে যে, এই প্রশ্নের একমাত্র সন্তোষজনক সমাধান হইতেছে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসকে পুনর্গঠন করা। ইহাকে কেন্দ্র হইতে বিচ্যুত করিয়া পুনর্গঠিত করা প্রয়োজন এবং ইহার বিচার বিভাগীয় কার্য্য সুশিক্ষিত ব্যবহারজীবিদের উপর আংশিকভাবে অর্পণ করা উচিত।

(গ) প্রাদেশিক সার্ভিসে নিয়োগার্থ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে রহিত হওয়ায় এই কংগ্রেস দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে, এই দেশের বিশেষ অবস্থার দরুণ, সরকার কর্ত্তৃক মনোনয়নের প্রথা সরকারী অনুগ্রহে পরিণত হয় এবং অযোগ্য লোক সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করিবার দরুণ শাসনকার্য্যে অব্যবস্থা ঘটিয়া থাকে, উপরন্তু উচ্চতরপদে ভারতীয়দের নিয়োগের যোগ্যতা নাই এইরূপ অযৌক্তিক অসম্মানের কারণ হয়। যে সকল প্রদেশে প্রাদেশিক চাকুরীতে প্রবেশের প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষা রহিত করা হইয়াছে তাহা পুনঃ প্রবর্ত্তনের জন্য এই সভা ভারত সরকারকে অনুরোধ জানাইতেছে।

২য় প্রস্তাব ঃ—ভারত সরকার বিগত মার্চ্চ মাসে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অধিকতর অর্থ ব্যয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় এবং বিদেশে শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষার্থে দশটি বৃত্তি ঘোষণা করায় এই সভা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছে। কিন্তু গত বারের ন্যায় কংগ্রেস এইবারও সরকার উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে যে প্রগতিবিরোধী নীতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ জানাইতেছে। এই নীতির দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক-মণ্ডলীতে সরকারী প্রাধান্য ঘটিবে এবং সাধারণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সীমাবদ্ধ হইবে। কংগ্রেস এই দৃঢ় অভিমত জ্ঞাপন করিতেছে যে, বৎসরের পর বৎসর সরকারের হাতে যেরূপ উদবৃত্ত অর্থ থাকে

তাহাতে তাঁহাদের শিক্ষা ব্যাপারে অধিকতর অর্থ বরাদ্দ করা উচিত। এই অর্থ নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইবে ঃ—

(ক) জনসাধারণের মধ্যে অধিকতর ব্যাপকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার এবং অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদানের গোড়াপত্তন।

(গ) শারীরিক শ্রমমূলক শিক্ষা ও বিজ্ঞানসম্মত কৃষিকার্য্য শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা।

(গ) সরকারী কলেজ ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলিকে যোগ্য লোক ও উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম দ্বারা আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।

(ঘ) অন্ততঃ একটি কেন্দ্রীয় ও সর্ব্বপ্রকার সাজ-সরঞ্জামযুক্ত পলিটেক্‌নিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

৩য় প্রস্তাব ঃ—এই কংগ্রেসের অভিমত এই যে, দেশের অধিবাসীদের শোচনীয় দুরবস্থার কারণ হইতেছে,—বৎসরের পর বৎসর এদেশ হইতে ধনরত্ন বিদেশে চলিয়া যাওয়া, স্বদেশীয় শিল্প বাণিজ্যের ধ্বংস, ভূমির উপর অতিরিক্ত কর এবং শাসন ব্যবস্থার ব্যয়বাহুল্য। ইহার প্রতিকারকল্পে অন্যান্য উপায়ের মধ্যে এই কয়টি প্রস্তাব গ্রহণের জন্য কংগ্রেস সুপারিশ করিতেছে ঃ—

(ক) পূর্ব্ববর্ত্তী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকার শিক্ষা বিস্তারে অধিকতর উৎসাহ প্রদান করুন।

(খ) ১৮৬২ ও ১৮৬৭ সালে ভারত সচিব সে অবস্থাধীনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হইতে পারে বলিয়া তাঁহার ডেসপ্যাচে উল্লেখ করিয়াছেন, দেশের যে সকল স্থানে সেই অবস্থা দৃষ্ট হয়, তথায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্ত্তন করুন। যে সকল স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সরকার যুক্তিযুক্ত মনে না করেন সেখানে অতিরিক্ত কর ধার্য্যের বিরুদ্ধে সরকার বিচার বিভাগের মধ্য দিয়া ব্যবস্থা অবলম্বন করুন।

(গ) পাব্লিক সার্ভিসের উচ্চতর পদসমূহে সরকার অধিকতর সংখ্যায় ভারতীয় নিয়োগ করুন।

৪র্থ প্রস্তাব :—কৃষকদের আতঙ্কজনক ঋণভার এবং তাহারা দুর্ভিক্ষের প্রথমেই সরকারের সাহায্য প্রয়াসী হয় এই কথা বিবেচনা করিরা কংগ্রেস এই সিদ্ধান্ত করিতেছে যে, লণ্ডনের ফ্যামিন ইউনিয়নের প্রস্তাব অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে কয়েকটি গ্রাম লইয়া তাহাদের আর্থিক অবস্থা নির্দ্ধারণের জন্য সতর্কতার সহিত তদন্ত করা হউক।

৫ম প্রস্তাব :—(ক) অষ্ট্রেলিয়ায় ভারত হইতে যে সকল দর্শনার্থী গমন করে তাহাদের উপর যে সকল বিধি নিষেধ আরোপিত হইত, তদ্দেশীয় সরকার তাহা শিথিল করিয়াছেন দেখিয়া কংগ্রেস সন্তুষ্ট হইয়াছেন। যে সকল ভারতীয় সম্রাটের অধীনস্থ উপনিবেশে বসবাস করিতেছেন তাঁহাদের উপর কঠোর বিধি-নিষেধ প্রয়োগ করা হয় এবং তাঁহাদিগকে বৃটীশ প্রজার সাধারণ নাগরিকের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়। কংগ্রেস এইরূপ ব্যাপারে গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছে।

(খ) প্রাক্তন বুয়র সরকার ট্রান্সভালে যে ভারতীয় বিরোধী আইন রচনা করিয়াছিলেন, বৃটিশ সরকার তাহার চেয়েও কঠোরতর আইন জারী করিতে যাইতেছেন জানিয়া কংগ্রেস দৃঢ়ভাবে ইহাতে প্রতিবাদ করিতেছে। বিগত বুয়র যুদ্ধের সময় ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, সম্রাটের ভারতীয় প্রজাগণের প্রতি বুয়র সরকারের দুর্ব্যবহার যুদ্ধের কারণ। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়গণ রাজভক্ত এবং যুদ্ধের সময় প্রচুর সাহায্য দানও করিয়াছে। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া কংগ্রেস বৃটিশ পার্লামেণ্টের নিকট তাহাদের আন্তরিক অনুরোধ জানাইতেছে যে, যাহাতে এই ক্রাউন কলোনিতে ভারতীয় বাসিন্দারা ন্যায্য ও সমান ব্যবহার প্রাপ্ত হয়, বৃটিশ পার্লামেণ্ট যেন তাহার জন্য চেষ্টিত হন।

(গ) এই সম্পর্কে ভারত সরকার ও ভারত সচিব যেরূপ দৃঢ়তার সহিত উপনিবেশস্থ ভারতীয় বাসিন্দাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার জন্য কংগ্রেস তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছে এবং অনুরোধ করিতেছে যে এই সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা যেন তাঁহাদের প্রচেষ্টা শিথিল না করেন।

৬ষ্ঠ প্রস্তাব ঃ—এই কংগ্রেস মিঃ জে, এন, টাটার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে। ভারতীয় শিল্পোন্নতিতে তাঁহার দান, তাঁহার স্বদেশপ্রীতি ও বদান্যতা দেশবাসী কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবে। মিঃ উইলিয়াম ডিগবীর মৃত্যুতেও কংগ্রেস গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে। ভারতীয়গণ তাঁহার মৃত্যুতে ভারতীয়দের দাবীর সমর্থক এক মহাপ্রাণকে হারাইয়াছে।

৭ম প্রস্তাব ঃ—উপনিবেশসমূহে লণ্ডনের উপনিবেশিক দপ্তরের ব্যয়ভার বহন করেন না, অথচ ইণ্ডিয়া আফিসের ব্যয়ভার ভারতকে বহন করিতে হয়। কংগ্রেস ইহার প্রতিবাদ করিতেছে এবং এই অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে, ভারত সচিবের বেতন বৃটিশ সরকারের প্রদান করা উচিত।

৮ম প্রস্তাব ঃ—(ক) বিগত ছয় বৎসর ধরিয়া ভারত সরকারের প্রত্যেক বৎসর প্রচুর উদ্‌বৃত্ত অর্থ থাকিয়া যাইতেছে। ইহার মোট পরিমাণ প্রায় দুই কোটি পাউণ্ড। কংগ্রেসের অভিমত এই যে, ইহাতে ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি সূচিত হয় নাই। ইহাতে বোঝা যায় যে, ভারতবর্ষে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কর ধার্য্য হইয়াছে। ভারত সরকারের নিকট হইতে ইংলণ্ডে যে অর্থ প্রেরিত হয়, টাকার মূল্য বাড়াইয়া দিয়া সেই টাকা পর্য্যন্ত বাঁচান হইতেছে।

(খ) যে সকল শ্রেণী-গবর্ণমেণ্টের মুদ্রানীতির দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহাদিগকে সাহায্য করিবার এবং যাহাতে উদ্‌বৃত্ত অর্থ থাকার দরুণ গবর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত ব্যয় করিতে প্রলুব্ধ না হন—এই উদ্দেশ্যে কংগ্রেস নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বলিতেছে।

(১) লবণ-কর আরও হ্রাস, (২) যে সকল প্রদেশে অজন্মায় কৃষকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, সেই প্রদেশের কর্ত্তৃপক্ষ দাবী করিলে ভূমি রাজস্ব হ্রাস ; (৩) তুলাজাত পণ্যের শুল্ক হ্রাস।

(গ) যতদিন না এই প্রকার হ্রাস করা হয় ততদিন পর্য্যন্ত যাহাতে দেশবাসীরা সাক্ষাৎভাবে উপকৃত হয় এই উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক এবং কৃষি ও শিল্প বিষয়ক শিক্ষা প্রচলন, সুচিকিৎসার সুযোগ ইত্যাদিতে

অর্থ ব্যয়িত হউক। দুর্ভিক্ষ এবং প্লেগের পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভাবে লোক্যাল বোর্ড ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের আয় হ্রাস হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত কাজের পর যে টাকা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা বোর্ডগুলির হাতে প্রদান করা হউক, যাহাতে বোর্ডগুলি স্বাস্থ্য বিষয়ক সংস্কার সাধন ও পল্লী অঞ্চলে চলাচলের সুব্যবস্থা করিতে পারেন।

৯ম প্রস্তাব :—এই কংগ্রেসের অভিমত এই যে, দেশের শাসন ব্যাপারে দেশবাসীকে অধিকতর অধিকার দিবার সময় আসিয়াছে। নিম্নলিখিত উপায়ে তাহা সাধিত হইয়াছে :—

(ক) প্রত্যেক প্রদেশ হইতে কমন্স সভায় দুইজন প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার জন্য ভোটের ব্যবস্থা।

(খ) সুপ্রীম ও লেজিসলেটিভ কাউন্সিল এই উভয় পরিষদই বে-সরকারী সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি এবং আর্থিক প্রস্তাবাদি সম্পর্কে ভোট-দানের অধিকার শাসনকর্ত্তার এই সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিবার অধিকার থাকিবে।

(গ) লণ্ডনের ইণ্ডিয়া কাউন্সিল, ভারত সরকারের শাসন পরিষদ এবং বোম্বাই ও মান্দ্রাজের শাসন পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচন। ইহাঁরা ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধিগণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন।

১০ম প্রস্তাব :—১৮৬৮ সালের আইনে এই কথা রহিয়াছে যে, ভারতের রাজস্ব পার্লামেণ্টের অনুমতি ব্যতীত বহিরাক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে ভারত সীমান্তের বাহিরে ব্যয়িত হইবে না। তিব্বতীয় অভিযানে ইহার অন্যথা হইয়াছে। সরকার এই অভিযানকে 'পলিটিক্যাল মিশন' বলিয়া অভিহিত করিতে থাকেন এবং পরে পার্লামেণ্টের এই ব্যয় মঞ্জুর করা ভিন্ন উপায়ন্তর ছিল না। সুতরাং আইনে রাজস্ব রক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল অন্যায়ভাবে ভারতকে তাহা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। কংগ্রেস এই ব্যাপারে গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। সাম্রাজ্যিক স্বার্থের জন্য এবং সাম্রাজ্যিক নীতির দিক হইতে এই অভিযান করা হইয়াছে তাহা সত্ত্বেও কমন্স সভা

এই ব্যয়ভারের একাংশও বহন না করায় কংগ্রেস গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। তিব্বতের অভিযান ও আফগানিস্থান ও পার্শিয়ায় প্রেরিত মিশন ভারতকে বৈদেশিক ব্যাপারে জড়াইয়া ফেলিয়াছে। ইহার ফলে ভারতীয় রাজস্বের উপর চাপ না পড়িয়া পারে না এবং পরিণামে ইহা দেশের স্বার্থের পক্ষে বিষময় হইবে। কংগ্রেস দৃঢ়ভাবে এই ব্যাপারে প্রতিবাদ করিতেছে।

১১শ প্রস্তাব ঃ—দুই বৎসর হইল পুলিশ কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের রিপোর্ট অদ্যাপি জনসাধারণের নিকট প্রকাশিত হয় নাই। 'অফিসিয়াল সিক্রেটস্ এ্যাক্ট' থাকা সত্ত্বেও রিপোর্টটির কতকাংশ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

যেহেতু এদেশে পুলিশবাহিনী সংস্কার বিশেষ জরুরী ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে; যেহেতু এই প্রশ্নের সন্তোষজনক সমাধানের সঙ্গে জনসাধারণের বহু স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে; যেহেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংস্কারের স্কীম গঠিত হইবার পূর্ব্বে জনসাধারণকে তাহাদের মতামত ব্যক্ত করিবার জন্য যথেষ্ট সুযোগ দান করা প্রয়োজন; যেহেতু ভারত সরকার ও ভারত সচিব কর্ত্তৃক ব্যাপারটি বিবেচিত হইবার পর জনসাধারণের সমালোচনার প্রকৃত প্রস্তাবে কোন মূল্য থাকিবে না—এইজন্য কংগ্রেস আর বিলম্ব না করিয়া রিপোর্ট প্রকাশের জন্য অনুরোধ জানাইতেছে।

১২শ প্রস্তাব ঃ—(ক) এই কংগ্রেস শঙ্কার সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে, এই দেশের সামরিক ব্যয়ভার ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। এই কংগ্রেসের অভিমত এই যে, বর্ত্তমান সামরিক ব্যয়ভার বহন করা ভারতের ক্ষমতার অতীত।

(খ) সেনাদলের ব্যয়ভার সম্পর্কে যে নূতন বোঝা চাপাইবার প্রস্তাব হইতেছে তাহা কংগ্রেসের পক্ষে আশঙ্কার কারণ হইয়াছে। লর্ড কিচেনারের সেনাদল পুনর্গঠন স্কীমের ব্যয়ভার ভারতীয় রাজস্বের উপর চাপানোর বিরুদ্ধে এই কংগ্রেস প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছে।

(গ) ভারতে যে সেনাদল রক্ষিত হয় এবং যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্ত মাঝে মাঝে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় তাহা ভারতের সামরিক প্রয়োজনের দিক হইতে করা হয় না, কিন্তু প্রাচ্যে বৃটিশ প্রভুত্ব রক্ষার্থ করা হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া কয়েক বৎসরের মধ্যে বহু বৃটিশ সৈনিক ভারতের বাহিরে কাজ করিবার জন্য সাময়িকভবে ভারত হইতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে কিন্তু তাহাতে ভারতের নিরাপত্তা বা শান্তি বিপন্ন হয় নাই। এই সব কথা বিবেচনা করিয়া কংগ্রেসের মত এই যে বৃটিশ পার্লামেণ্টের ভারতের সামরিক ব্যয়ভারের একাংশ বহন করার গ্যয্যতা স্বীকার করা উচিত।

১৩শ প্রস্তাব:—ভারতের বিচার ও শাসন বিভাগ পৃথক করা সঙ্গত তাহা গবর্ণমেণ্টও স্বীকার করিয়াছেন এবং তাহা সম্পাদন করিতে বিশেষ ব্যয়ও পড়িবে না তাহা পুনঃ পুনঃ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই কংগ্রেস, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের কংগ্রেসের গ্যায় এই আবেদন জানাইতেছেন যে, ভারত সরকার ও ভারত সচিব যেন এই দুই বিভাগ পৃথক করিতে আর বিলম্ব না করেন।

১৪শ প্রস্তাব:—এই কংগ্রেস ভারত সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত **বঙ্গভঙ্গের** দৃঢ় প্রতিবাদ করিতেছে। বাঙ্গালী জাতিকে বিভক্ত করা হইলে তাহাদিগের সামাজিক উন্নতি, মানষিক উৎকর্ষ, ও অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধির বাধা ঘটিবে; শাসনতন্ত্রগত ও অন্যান্য যে সকল অধিকার ও সুবিধা তাহারা ভোগ করিয়াছে তাহার হানি ঘটিবে এবং ব্যয়ের মাত্রা বহুগুণে বাড়িবে—যাহা ভারতীয় করদাতারা বহন করিতে অক্ষম। উপরোক্ত কারণে বঙ্গভঙ্গ দেশবাসীর আতঙ্কের কারণ হইয়াছে।

এই কংগ্রেসের অভিমত এই যে, বঙ্গভঙ্গের যে প্রয়োজন আছে তাহার কোন উপযুক্ত কারণ প্রদর্শিত হয় নাই। যদি বাঙ্গালার গঠনতন্ত্র প্রয়োজনানুরূপ না হইয়া থাকে তাহা হইলে জেলাগুলির নূতন বিলি ব্যবস্থা করিয়া তাহার কোন প্রতিকার হইবে না। শাসন ব্যবস্থারই পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। লেপ্টন্যাণ্ট গবর্ণরের স্থলে একজন

গবর্ণর নিযুক্ত করিয়া এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজের মত একটি শাসন পরিষদ গঠন করিলেই সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে।

১৫শ প্রস্তাব ঃ—ইংলণ্ডে সাধারণ নির্ব্বাচন আসন্ন দেখিয়া কংগ্রেস এই সিদ্ধান্ত করিতেছে যে, এই সময়ে ভারতের দাবী নির্ব্বাচকদের সম্মুখে, নির্ব্বাচন প্রার্থীদের সম্মুখে এবং রাজনৈতিক নেতাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার জন্য কংগ্রেসের পক্ষ হইতে বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ প্রতিনিধি প্রেরণ করা উচিত। প্রতিনিধিগণ বিভিন্ন প্রদেশ কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন। প্রতিনিধিগণ নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে এবং নির্ব্বাচন কালে ইংলণ্ডে উপস্থিত থাকিবেন। এই প্রতিনিধিদলের প্রয়োজনীয় ব্যয় সঙ্কুলানের নিমিত্ত ৩০হাজার টাকার একটি ফাণ্ড গঠিত হইবে।

১৬শ প্রস্তাব ঃ—এই কংগ্রেস উত্তর ল্যাম্বেথ হইতে মিঃ দাদাভাই নৌরজীর, নাটীংহাম হইতে সার জন জার্ডিনের প্রতিনিধিত্ব দাবী আন্তরিকভাবে সমর্থন করিতেছে। কংগ্রেস নির্ব্বাচক মণ্ডলীর নিকট এই আবেদন জানাইতেছে যে, তাঁহারা যেন ভারতের স্বার্থের দিক চাহিয়া ইহাঁদিগকে পার্লামেণ্টে প্রেরণ করেন। তাহা হইলে তাঁহারা যে কেবল নির্ব্বাচক মণ্ডলীর সেবা করিতে পাইবেন তাহা নহে, তাঁহারা কিঞ্চিৎ পরিমাণে এই দেশেরও প্রতিনিধিত্ব কবিবেন—যে দেশ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশ হইলেও প্রতক্ষ্যভাবে বৃটিশ পার্লামেণ্টে কোনও প্রতিনিধি নাই।

১৭শ প্রস্তাব ঃ—ভারতের রাজনৈতিক উন্নতিলাভে স্যার উলিয়াম ওয়েডারবার্ণ প্রমুখ বৃটিশ কমিটির যে সকল সদস্য নিঃস্বার্থভাবে চেষ্টা করিয়াছেন কংগ্রেস তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছে।

১৮শ প্রস্তাব ঃ—কংগ্রেস আগামীবর্ষের জন্য মিঃ এ ও হিউম সি, বি, কে সাধারণ সম্পাদক, এবং অনারেবল জি কে গোখেলকে ও মিঃ ডি ই ওয়াচাকে যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে পুনর্নিয়োগ করিতেছেন।

১৯শ প্রস্তাব ঃ—কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি কমিটি নিযুক্ত হইল।

বোম্বাই ঃ—স্যার পি, এম, মেটা ; মিঃ ডি, ই, ওয়াচা ; অনারেবল মিঃ জি, কে, গোখেল, অনারেল মিঃ ইব্রাহিম রহিমতুল্লা।

মাদ্রাজ ঃ—মিঃ সি শঙ্করণ নায়ার, মিঃ কৃষ্ণস্বামী আয়ার, মিঃ এম, বিজয় রাঘবাচারী, নবাব সৈয়দ মহম্মদ।

বাঙ্গালা ঃ—বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, অনারেবল মিঃ অম্বিকাচরণ মজুমদার, বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন, মিঃ আবুল কাসেম।

পাঞ্জাব ঃ—লালা লাজপত রায়, মিঃ ধরমদাস, লালা হরকিষণ লাল।

যুক্ত প্রদেশ ঃ—বাবু গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্মা, অনারেবল পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মিঃ এস, সিংহ।

বেরার ও মধ্যপ্রদেশ ঃ—মিঃ আর, এম, মুধলকর, মিঃ ভি, এম, যোশী, মিঃ এম, কে, পাঠ্য।

২০শ প্রস্তাব ঃ—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একবিংশ অধিবেশন বারাণসীতে ১৯০৫ সালের খৃষ্টমাস দিবসের পরে বসিবে। দিন পরে ধার্য্য হইবে।

২১শ প্রস্তাব ঃ—অভ্যর্থনা সমিতি এবং যাঁহারা তাঁহাদিগকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইতেছে।

২২শ প্রস্তাব ঃ—সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা যাইতেছে।